তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা

(মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ স্মারক-বক্তৃতা)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক : স্বামী অশেষানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ, ১৩৫৯

মুদ্রক : দাস অফসেট
২৫, গুলুওস্তাগার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬।

॥ উৎসর্গ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের অন্তরঙ্গপার্ষদ
মদীয় আচার্যদেব
শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের
পুণ্য-পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে
'তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা'
উৎসর্গ করলাম।

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

॥ ভূমিকা ॥

॥ এক ॥

সর্বপ্রথমে বলি, তন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনায় মনে রাখতে হবে যে, তন্ত্র Black Magic, ভোজবাজী বা যাদুবিদ্যা নয়, তন্ত্র অধ্যাত্মজীবনের পথচারী, মুক্তি ও পরমশান্তিপথের দিশারী এবং জীবনে দেয় তন্ত্রসাধনা অনির্বাণ-আলোকের মতো শাশ্বত-আনন্দ।

অঘটন আজও ঘটে সংসারে ও মনুষ্য-জীবনে, কিন্তু তারজন্য তন্ত্র ও তন্ত্রের প্রভাব দায়ী নয়। আমরা জানি, আভিচারিক প্রয়োজনে তন্ত্রের অনুষ্ঠান করেন অনেকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, কিন্তু তন্ত্রসাধনার জগতে তা' চিরদিনই নিন্দনীয়। আভ্যুদায়িক-প্রয়োজনেই কল্যাণকামী সাধকেরা তন্ত্রের সাধনা করেন এবং তন্ত্রের আভ্যুদায়িক-প্রয়োজনই আদরনীয় সমাজে।

তাছাড়া এ'প্রসঙ্গে বলি, তন্ত্রসাধনা যদিও অনুষ্ঠান ও তত্ত্বমূলক, তবুও ব্যবহারিক বা practical সাধনা নিষ্ঠা শ্রদ্ধা ও অনুভূতি ছাড়া নিষ্ফল ও নিরর্থক। তাছাড়া গতানুগতিক আহ্নিককরণ, বিচিত্র উপাচার, মন্ত্রের উচ্চারণ ও বিভিন্ন হস্তমুদ্রার প্রদর্শনই তন্ত্রানুষ্ঠান নয়, অভিজ্ঞ আচার্যের নির্দেশে মুক্তি তথা শিবশক্তি-সামরস্যানুভূতির একান্ত আকুলতা ও আগ্রহকে নিয়ে তন্ত্রসাধনা করা বিধেয়। তাছাড়া তন্ত্রে, তত্ত্বের যথাযথ অর্থের ও ভাবের অবগতির তথা জ্ঞানের মহিমা ও আনন্দকে নিয়ে তন্ত্রসাধনার যথার্থলক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে তন্ত্রসাধনা করা উচিত।

॥ দুই ॥

তন্ত্রের প্রচার ও সমাদর তিনটি ক্ষেত্রে তথা ক্রান্তায় বিশেষভাবে হয়েছিল,—বিষ্ণুক্রান্তায়, অশ্বক্রান্তায় ও রথক্রান্তায়। (১) বিষ্ণুক্রান্তার প্রসারতা ঘটে বিন্ধ্যপর্বতমালার পাদদেশ থেকে চট্টল বা চট্টগ্রাম-পর্যন্ত; (২) অশ্বক্রান্তার বিস্তৃতি বা সীমানা নির্ধারিত হয় বিন্ধ্যপর্বত থেকে মহাচীন-পর্যন্ত এবং এই সীমানার মধ্যে নেপাল প্রভৃতি পার্বত্যদেশও পড়ে; (৩) রথক্রান্তার সীমানা বা বিস্তৃতি নির্ধারিত ছিল বিন্ধ্যগিরি বা বিন্ধ্যপর্বতের অঞ্চলগুলি থেকে সাগরপারের কম্বোজ বা

কাম্বোজ, জাভা প্রভৃতি দেশ পর্যন্ত। শ্রদ্ধেয় আর্থার এ্যাভালোন তাঁর *Principles of Tantra*, Vol. II. Introduction-এ এ'কথার উল্লেখ করেছেন।

ঠিক এ'ভাবে সম্মোহতন্ত্রে আর-একটি তান্ত্রিক-অঞ্চল বা zone-এর কথা বলা হয়েছে, যেমন কাদি, হাদি ও কহাদি (বিশেষ ক'রে কাদি ও হাদি অঞ্চল-দুটি) কাদি-অঞ্চলগুলি (zone) হোল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কেরল, কাশ্মীর, কামরূপ (কামাখ্যা), মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, মদ্র প্রভৃতি দেশ। তেমনি হাদি-সীমানার দেশগুলি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, নেপাল, সৌরাষ্ট্র, মগধ, মহারাষ্ট্র জলন্ধর প্রভৃতি দেশ বা অঞ্চল।

লোকৈষণা, বিত্তৈষণা, ভোগৈষণা, পৃথিবী-অন্তরীক্ষ-স্বর্গৈষণা, এই সকল এষণা বা বাসনা-কামনা পরিত্যাগ ক'রে যাঁরা বিরজাহোম ক'রে সন্ন্যাসী তাঁদের ভুক্তি মুক্তি (ভোগ ও ত্যাগ)-প্রদায়িনী তান্ত্রিকসাধনার কোন প্রয়োজন নাই।

॥ তিন ॥

তন্ত্র, তান্ত্রিক সাধনা ও শক্তিদেবীদের পূজার প্রচলনকাল-সম্পর্কে এ'গ্রন্থে আলোচনা করেছি। শ্রদ্ধেয় ডক্টর জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (Dr. J. N. Banerjee) তাঁর *Paurāṇic and Tāntric Religion* (1916)-গ্রন্থে এ' সম্বন্ধে বলেছেন—

"That Tāntrism in its general sense of systematised ritualism of a particular character, much different from the vedic one, was applicable to the other major cults like Vaishnavism and Śaivism has already been mentioned. But in its application to Śakti worship it had some special significance. There is no doubt, in the early phase of the cult in its Tāntric form, the element of fear played the most prominent part. In fact the word *tantra* is first met within a somewhat fragmentary inscription dated in the Mālava year 480 (423-24 A. D.) found at Gangādhar in Malwa. The inscription records among other things that one Mayurākshaka, a minister of Viśvavarmaṇ, the father of Kumāragupta I's feudatory Bandhuvarman, 'caused to be built for the sake of his religious merit this very terrible abode......filled full of female ghouls, of the Divine Mothers, who utter loud and tremendous shouts in joy, (and) who stir up the (very) oceans with the mighty wind rising from the magic

rites of their religion'. The extract is Fleet's translation of the passage which deserves special notice, for in the English rendering a few important points are missed. The original is—*Mātrīnāñcha pramuditagha-nātyartha-nihraudininān tāntrobhūtaprabha-pavanodvarttitāmbhonidhinām*...(portion broken) *gatamidam dākinīsamprakīrnām vesmatyagram nripatisachivo karayat punvahetcñ.* The words *tantra* and *dākini* have been rendered into English as 'magic rites of religion' and 'female ghouts'; but they should have been left understand. The word *veśmatyugra* also deserves comment in this context, for the temple of the Mātrikās could not be terrific by itself. It was the terrible nature of the rites, indulged in by the votaries of the Divine Mothers in and near it in course of their peculiar form of worship, that gave the name to it, an early example of attributing the quality of the things to the container itself. We do not know the details about the grim rites which were of Tāntric character (the very word *tantra* being used in this context), in which the Dākinis had some notable part to play".

তন্ত্রে ডাকিনী, যোগিনী, মাতৃকা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার আছে এবং এই শব্দগুলি তন্ত্রে বিশেষ-অর্থবোধক। অবশ্য এই সম্বন্ধেও এই গ্রন্থে আলোচনা করেছি। মাতৃকা, ডাকিনী, যোগিনী মহাশক্তিরূপিনী প্রধানা দেবীদের অনুচর ও সঙ্গিনীবিশেষ। প্রধানা দেবীদের মতো মাতৃকা, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতি সহচরীরাও পূজ্যা ও স্মরণীয়া। ডক্টর জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মাতৃকা, ডাকিনী ও যোগিনীদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন—

"Who are the Dākinis? In much later Tañtric texts the names of Dākinis, Lākinis and Śākinis are mentioned. In this list, the first and the last are comparatively ancient. We shall presently say something about the Yoginis. The later lexicons explain the name Dākini 'as a special kind of the attendants of Kāli (*Dākini Kāliganaviśeshāh*). But Kāli made her debut as a fierce goddess in Tāntric Śakti worship at a comparatively late age (?). This word, however, occurs in an inscription of the first quarter of the fifth century A. D. P. C. Bāgchi suggested that these subordinate deities might have been imported from Western Tibet and incorporated in Tāntric

ritualism. This view was partly endorsed by S. B. Das-Gupta who traced its root in the word *dāka* used in Tibet in the sense of 'a wise man', the particular term being its feminine form. But the suggestions are unacceptable on account of this early epigraphic evidence. The inscription particularly emphasises the shouting propensity of the Mothers and their attendants, and the words *dāka* and *dākinī* may be of purely Indian origin. The suggestion may be supported by the interesting word 'ghoshini' (*ghosha* and *dāka* mean the same thing) occurring in the *Atharva-Veda* to denote the female attendants of the terrific god Rudra. The word Yogini, so far as I know, does not occur in any early Gupta inscriptions; but the negative evidence does not militate against their fairly early existence as objects of worship in the Tāntric Śākta ritualism from the early medieval period onwards. Their number is stated, in the late Purānas like the Agni and others and some Śakta texts, as 64 (*Chatuhshashti-Yoginī*). The *Agni Purāṇa* in its 146th Chapter (1st part) fixes the number of Divine Mothers as eight, each of whose name is preceded by the name of the terrific goddess. Chāmuṇdā-Chāmuṇḍa-Brahmāṇi, Chāmuṇdā-Māheśvari, etc. the last two being Chāmuṇdā-Chaṇdi and Chāmuṇdā-Iśāni; the second part of the chapter gives the names of the *Ashtashtakā* goddesses (8×8=64) who belong to the line of Chāmuṇdā and are worshipped in *maṇdalas* (V. 20—*Chāmuṇdā-Kulasambhutā maṇdale pujitā jāye*). That these *Ashtashtaka* goddesses were worshipped in *maṇdalas* is fully proved not only by the evidence of this comparatively late *Purāṇa*, but by a few extant group shrines (usually circular, rearely rectangular) belonging to the medieval period. Mention may be made here of the Bherāghāt (near Jabalpur), Khajurāho, Hirāpur near Bhubaneśwar, (Orissa) and Rānipur Jharial (near Sambalpur, Orissa) temple complexes of the 64 Yoginis. They mostly belong to the early medieval period, and, with the exception of the Khajurāho complex, are round in form. This particular arrangement of the shrines helps us to understand the significance of the expression *Maṇdalakramavidaḥ* used by Varāhamihira to denote the devotees of the Divine Mothers.

It will be impossible for me to go into further details about these structures in the short time at my disposal, for they require a separate study."

তন্ত্রনির্দেশিত সাধনার বা তান্ত্রিক-সাধনার প্রচলন আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি বৃহদ্‌বঙ্গে বা বৃহত্তর-বাঙলায়, – যার পরিধি ও বিস্তৃতি ছিল বাঙলাদেশ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যাকে নিয়ে। আসামে কামরূপ-কামাখ্যায় দেবী কামাক্ষী বিশেষভাবে পঞ্চতন্ত্রেই পূজিতা। পঞ্চতন্ত্রের আচার এবং পূজাই 'বামাচার' নামে পরিচিত। এই পঞ্চতাত্ত্বিক[১]-আচার সমগ্র বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় বিস্তৃতি লাভ করে। ডক্টর জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর *Paurānic and Tāntric Religion* (1966)-গ্রন্থে উড়িষ্যায় বা কলিঙ্গদেশে তন্ত্রাচার ও তান্ত্রিক-মহাদেবীদের সম্বন্ধে লিখেছেন—

"Orissa is full of medieval Tāntric remains emphasising the great prevalence of this form of Śakti worship in the country. D. M. Bhattacharya's striking discovery of the fact that the *Paippalāda-Śākha* of the *AtharvaVeda* is still being ceremonially studied by a fairly large number of Oriyā Brāhmaṇas who aver that it was being studied in their country from time immemorial explains why Tāntrism was so much prevalent there. It is a fact that the Tāntric Śāktas set a great store on the fourth Veda, and a good part of their ritualism might have been based on it. Group or separate representations of the 7 (rarely 8) Divine Mothers have been found in different parts of Orissa, of which *Vārāhī* and *Chāmuṇḍā* stand for the terrific, wired and uncanny aspect of the goddess. The area surrounding Jaipur is known as *Virajā-kshetra,* and the town itself contains a Devi shrine, and separate Mātrikā images are found there in the temple precincts. There are images of the Sapta-Mātrikā flanked by Virabhadra and Gaṇeśa on either side on the bank of the Mārkandeya tank at Puri; they are still being worshipped. A particular variety of temple architecture described by the Oriyā śilpis as Khakhāra was adopted by them to build shrines

১। পঞ্চতাত্ত্বিক-দ্রব্য বলতে মদ্য, মাংস, মৎস্য প্রভৃতি পাঁচটি দ্রব্য শোধিত ক'রে শক্তি পূজায় ব্যবহৃত হয়।

of the different aspects or the goddess. The Vaital Deul and the Gauri temples of Bhubaneśwar, the Vārāhi temple of Chauraśī (a village near Kakatpur in the Puri District), and the Gaṅgeśvari temple at Beyalisbati near Gop (Puri District) belong to this type. The first and the third require special notice in this context. Inside the main sanctum on the back and the two side walls of the first are as many as 15 images including those of the two guards of the Mothers, and the highly emaciated and terrific figure of Chāmuṇḍā séated on a corpse (*pretāsana*) appearing as the central deity, a weird and skinny figure of a two-armed Bhairava (a sādhaka?) with Urdhva-liṅga feature and wearing a skull garland having a severed head in front and a jackal devouring a dead body, and a few other figures. These features of the Vaital Deul characterise in a way the grim nature of the shrine and naturally remind us of the vesmatyagra of the Gaṅgādhar stone inscription."

॥ চার ॥

ডক্টর এম. এন. দাসের সম্পাদনায় ***Sidelights on History and Culture of Orissa*** (1916)-গ্রন্থে ডক্টর হরিশচন্দ্র দাস-কর্তৃক সুলিখিত Sakti-Cult in Orissa'-নিবন্ধ থেকে এখানে কিছুটা উল্লেখ করি, হিন্দু ও বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্লাবনে কীভাবে বৃহদ্‌বঙ্গের অন্তর্গত কলিঙ্গদেশে বা উড়িষ্যায় বাঙলাদেশের মতো তান্ত্রিক-ধর্ম ও আচারে সমাচ্ছন্ন হয়েছিল। ডক্টর হরিশচন্দ্র দাস বলেছেন—

"In Orissa Śakti is worshipped in the forms of Mahiṣamardini Dūrgā, Pārvati, Chaṇdi, Saptamātṛkās, Chāmuṇḍā, Maṅgalā, Kāli, Vimalā, Chaṇdikā, Bhagavatī, etc. In addition, the female principle is invoked under various local names which cannot be enumerated in this short paper. Śakti cult is so popular in Orissa that every village even individual household worships her either as presiding deity or as the protectress of the particular house or the village whatsoever may be. The wide distribution of Śakti cult in some form or other indicates its pre-eminence in Orissa. Of all the emanations of Śakti, Mahiṣamardini-Dūrgā is very common and is found in large numbers in different parts of Orissa. The two-handed Mahiṣa-

mardinis-Dūrgā which represents the earliest phase of chronological evolution is found at Lomeśvara near kakatpur of the Prāchi Valley. She is contemporary to Viraja of Jājpur and assumes the similar iconographic features Four-armed Mahisamardini began to be worshipped in the Prāchi Valley. A beautiful image of this variety in the village Motia of the same valley, deserves mention Her upper hands hold Śaṅkha and Chakra, while the lower hands pierce the trident to the breast of the demon Similar such image is seen in the temple of Madhava at Niāli and in the western wall of the temple Charchikā at Banki. Mahisamardini with six hands is not very common in Orissa. Only one image of this variety seen at Aṣtarang is peculiar in the sense it presses the mouth of the demon with one of her right hands while the other five holding sword, arow, bow, shield and trident. Another image of this group known as Dvārāvasini is worshipped on the eastern edge of Vindu-sarovara at Bhubaneśwar

Here it may be mentioned that the worship of Aṣta-bhujā (eight-handed) Mahiṣamardini became very popular during the reign of Bhaumakārs (c 736-c 948 A. D.) who patronized Tantrik Buddhism, Tantrik Śaktism and caused erection of many Sākta and Saiva temples in the Prāchi valley, at Bhubaneśwar, at Rānipur Jhārial in the district of Bolangir and the famous Buddhist monasteries at Ratnagiri, Lalitagiri and Udayagiri in the district of Cuttack The temples of Vaital for Chāmuṇḍā, Śiśireśvara, and Mohini at Bhubaneśwar, Yogini temples at Hirāpur and Rānipur Jhariāl, Vārāhī temple at Chaurāśi, temples at Talmul in Angul, Bāṇesvara-Nasi near Narsinghpur, Baudh in Puri district, Kupari and Ayodhyā in Bālāsore district deserve mention. This has been attested by the accounts of Hieun Tsang which indicate that there were large number of Deva temples in Orissa in the 7th century A. D. Some of these centres grew up as centres of Saktism and acclaimed wide popularity. Certain elements of other cults were introduced in Śaivism. It was during this period that Tantrism crept into the fold of Śaivism. Tāntrik Buddhism known as Vajroyāna was the dominant religion and several images of this religion

appeared in the Hindu temples. "It is during this period that Śaktism first made its appearance in Bhubaneśwar. The Vaital temple, the first Śākta shrine, shows in its sculptures a strange amalgamation of Śaktism, Śaivism and Buddhism. While the presiding deity of the temple is a Chāmuṇḍā, it bears such Śaiva images as Hara-Pārvatī, Ardhanārīśvara Harihara, Lakulisa, Virabhadra, Bhairava and Gajantakarimūrti and such Tāntrik Mahāyāna images as Amoghasiddhi, the female deity holding a lily......Four Sākta shrines also sprang up on four sides of the Vindusarovara tank. While the temples of Mohinī and Uttareśvari situated in the south and north of the tank enshrine Chāmundās, the shrines on its east and west banks contain the images of Mahiṣāmardini."

বৌদ্ধধর্মে প্রথমে হীনযান ও মহাযান হ'টি শাখা বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। হীনযানীদের মধ্যেই সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধদের মধ্যে সম্ভবত খ্রীষ্টীয়যুগের প্রথমপাদে গৌতম-বুদ্ধের প্রথম মূর্তিকল্পনা হয়। পরে মহাযান-বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ধীরে ধীরে আঠারোটি ধর্মসম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। মহাযান-সম্প্রদায়ের মধ্যেই তন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ে তান্ত্রিক-ধর্মের ও আচারের উদ্ভব হয়। ডক্টর দাস এ'সম্বন্ধে লিখেছেন —

"During this period the concept of female principle dominated the Mahāyāna Buddhism. Tārā the primordial deity of Buddhist pantheon absorbed within herself a number of divinities representing different aspects of female principle. From the 7th century onwards the influence of Tārā in her various manifestations began to be felt in the religious system of Orissa. Khadirāvānī-Tārā at Bānpur, Prajñāpāramitā of Vāṇeśvaranāsi, Tārā and Hāritī of Ratnagiri, Tārā images of Khiching museum various such images in the Orissa State Museum, the exquisitely carved bronze images of varieties of Tārā in Lalitāsana, four-handed Chaṇdi, Vajra-Tārā, Ugra-Tārā, Hāriti now preserved in the Orissa State Museum are the few examples which indicate the influence of Tāntrik Śaktism in Mahāyāna.

Daśabhujā Mahiṣamardini was even more common and more popular in orissa. Availability of this variety of image in

different parts of Orissa either as presiding deities or as side deities indicates its wide distribution. She in this form is depicted as the war-goddess with full energy produced from the flames of the gods and bearing the *āudhas* of the gods such as Śiva's trident, Viṣṇu's disc, Varuṇa's conch, Agni's dart, Yama's iron-rod, Vāyu's bow, Sūrya's arrows, Indra's thunderbolt, Kubera's mace, Brahmā's rosary and pot, Viśvakanmā's sword, Himavān's lion and various weapons of other gods. Of the numerous Daśabhujā Mahiṣamardini mention may be made of the beautiful images found at Daiavāda Pitapura, Lataharana, Nivarana, Niali, Jogeśwar and Vakatpur of Prāchi Valley, Bhattārikā near Barambā, Kanaka-Dūrgā near Remuna, at Khiching, Padhuan near Bāsudevpur, at Bhubaneśwar and at many other places. All the images of this variety are seen fighting vigorously with the demon who emerges out of the decapitated trunk of the buffalo. Standing in pratyāliḍha pose she is planting her right leg on the back of the mount iron and pressing the buffalo with her left leg. She has in her hands the trident, khetaka, tanka, śara, khaḍga (in right hands) and dhanus, paraśu, aṅkuśa, nāga-pāsa and sūci-mudrā.

Sapta-Mātṛkās (seven mothers) representing the Śaktis of important deities, are found in different parts of Orissa. They are Brahmānī, Maheśvari, Kaumārī, Vaisṇavī, Vārāhī and Chāmundā. The antiquity of the Mātṛkā is shrouded in mystery. A group of eight Mātṛkā's has been mentioned in Devī-Bhāgavata and Liṅga-Purāṇa. In the subsequent literature the names of as many as 16 Mātṛkās have been given beginning with Gauri. But on the basis of iconographic data the above-mentioned seven Mātṛkās have been accepted as the 7 Mother goddesses or Divine Mothers. Mārkaṇdeya-Purāṇa indicates that the Mātṛkās helped Ambikā to kill the powerful demon Raktavīja who was endowed with the quality of multiplying into demons of his stature and strength from the drops of his blood oozing from the wounds. It was with the assistance of these Mātṛkās that Devi could cause death to the demon. The Agni-Purāṇa and Matsya-Purāṇa deal in detail the iconographic

features of these Mothers. According to the Mārkaṇḍeya-Purāṇa the śaktis of the individual gods are characterised by the respective forms, ornaments and mounts of those gods. In fact they are the female counterparts who are armed with the same weapons, wear the same ornaments and ride the same Vāhanas and carry the same banners as the corresponding male gods do.

The Mātṛkā figures are shown standing or seated with their usual characteristic features. They may be two-armed or four-armed. Sometimes they are found associated with children to indicate the Mother aspect. The earliest group of Sapta-Mātṛkā belonging to 7th century A. D., is depicted along with Gaṇeṣa and Vīrabhadra in the northern wall of Jagamohana of Paraśurāmeśwar temple (Bhubaneśwar). They are Chāmuṇḍā, Vārāhī, Indrānī, Vaiṣṇavī, Kaumārī Maheśvarī, Brahmānī flanked by Vīrabhadra and Gaṇeśa. These Mātṛkā figures are four-handed. Chāmuṇḍā has a lily bud and a vīja-puraka in her right hands and a long trident and vase in the left hands. Her Vāhana owl is seen on the pedestal. Chāmuṇḍā is terrific in form with the drooping breasts, sunken belly and bulging eyes. Vārāhi has a lotus and a fish in her right hands and a Kevara and a vase in the left. Vaiṣṇavī holds a śaṅkha and chakra and a vase in her hands" (pp. 352-355).

তাছাড়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর *Archaeological Survey of Mayurabhañja* (Vol. I)-গ্রন্থে (1911) 'The Hindu-Śākta-Influence' এবং 'Mahāyāna or Buddhist-Tāntric-Influence—আলোচনায় উড়িষ্যায় ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তান্ত্রিক আচার ও সাধনা যে বিস্তার লাভ করেছিল তার বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

Thomas E. Donaldson তাঁর সুবিখ্যাত '*Hindu Art of Orissa* (Vols I—III)-গ্রন্থে বাঙলাদেশ ও আসামের মতো উড়িষ্যায় ও উড়িষ্যার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তান্ত্রিক ধর্ম ও সাধনার মধ্যে পঞ্চতত্ত্বসাধনা বা বামাচার কিভাবে বিস্তার লাভ করেছিল তার ঐতিহাসিক-পরিচয় দিয়েছেন।

গ্রন্থমধ্যে এই সকল আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকলেও পৃথকভাবে পুনরায় ভূমিকায় এই সকলের আলোচনার সার্থকতা কি—এই প্রশ্নের উত্তরে বলি যে, তন্ত্রধর্ম,

তন্ত্রাচার ও তন্ত্রসাধনা ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বহির্ভূত বিভিন্ন দেশে প্রসার লাভ করলেও বৃহদ্বঙ্গে তথা বাঙলা-বিহার-আসাম-উড়িষ্যায়ই তার প্রচার, সাধনা ও বিস্তৃতি অধিকভাবে লাভ করেছিল বলা যায়। তাছাড়া একমাত্র বাঙলায়ই (বর্তমানে পশ্চিম-বাঙলায়ই) তারাপীঠ, যুল্লরা প্রভৃতি পাঁচটি শক্তিপীঠের প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। কামরূপ-কামাখ্যায় এবং বাঙলাদেশে ও উড়িষ্যায় বিশেষভাবে পঞ্চতত্ত্বের সাধনা বা বামাচারের বিস্তৃতি দেখা যায়, যে বামাচারকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গপার্ষদগণ বিশেষ সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু এ'প্রসঙ্গে এ'কথাও মনে রাখতে হবে যে, বামাচারই তন্ত্রসাধনার একমাত্র আচার নয়, কিংবা মদ্য-মাংসাদি পঞ্চতত্ত্বসাধনাই তন্ত্রসাধনার একমাত্র আচার ও সাধনা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধনসিদ্ধা ব্রাহ্মণী-যোগেশ্বরীর সহায়তায় তন্ত্রসাধনা করেছিলেন তন্ত্রের সুপ্রাচীন-পরিশুদ্ধ-আচার 'সময়াচার' অবলম্বন ক'রে। তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ সকল রকম ধর্মেরই সাধনা ক'রে পরিশেষে পুরীনামা দশনামী সন্ন্যাসী তোতাপুরীর সহায়তায় অদ্বৈতবেদান্তমতে সাধনা করেছিলেন। উনবিংশ-বিংশ শতকের যুগসাধনার মন্ত্র তাই "যত মত তত পথ, লক্ষ্য এক",—এই সবধর্মসমন্বয়ের সাধনা সকল সংকীর্ণ-সাম্প্রদায়িক-দৃষ্টির উর্ধে উদারতার ও সর্বসহনশীলতার ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠা করেছে!

"বিষয়টি পাঁচটি ভাগে ভাগ করে নেন বক্তা যথা,—১। ভারতবর্ষই তন্ত্রের জন্মস্থান,—২। তন্ত্রে সম্প্রদায়ভেদ ও বিভিন্ন তন্ত্রসাহিত্য,—৩। তন্ত্রসাধনায় বিভিন্ন আচার ও তন্ত্রবিশ্লেষণ,—৪। মাতৃকাতত্ত্ব ও মন্ত্রসাধনা এবং ৫। কুণ্ডলিনী যোগসাধনা ও সামরস্যমুক্তি।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে মমঃ গোপীনাথ কবিরাজ-স্মারক-বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীবৃন্দ। প্রথম দিনে আরও উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রীদিলীপ সিংহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (অর্থ), ডেপুটি-রেজিস্ট্রার ডক্টর শ্রীসন্তোষকুমার মুখার্জী ও শ্রীগোপাল চন্দ্র ব্যানার্জী, কণ্ট্রোলার। পাঁচদিনের পর পর বক্তৃতাসভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে মাননীয় ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ, ডক্টর জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, শ্রীজগদীশচন্দ্র পাল, ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী। বক্তৃতা-মালার প্রথম দিনে উদ্বোধনী-ভাষণ দান করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় শ্রীদিলীপকুমার সিংহ এবং শেষদিনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মাননীয় শ্রীগোপালচন্দ্র ব্যানার্জী।"

এক্ষণেঐ স্মারক-বক্তৃতাটি শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত-মঠের পুস্তক-প্রচার-বিভাগ থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হোল। এই পুস্তকের সমগ্র প্রুফ যত্নসহকারে দেখে সাহায্য করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত-মঠের সাধারণ-সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ। তাঁকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। এই গ্রন্থ-প্রচারে বিশেষভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই স্বামী কেশবানন্দ, স্বামী সত্যকামানন্দ, স্বামী অশেষানন্দ ও স্বামী সুদর্শনানন্দ মহারাজগণকে।

তাছাড়া কিছু তন্ত্রগ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করার ও বিশেষভাবে উৎসাহ দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই 'নবভারত'-পুস্তকালয়ের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রণজিৎকুমার সাহা এবং শ্রীমতী বিভা সাহাকে।

গ্রন্থটিকে যত্নসহকারে ও সুপরিচ্ছন্নভাবে মুদ্রিত করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই পরিশেষে 'দি প্যারট'-প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীঅসীমকুমার সাহাকে।

তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা

প্রথম অধ্যায়

॥ তন্ত্রের জন্মস্থান ভারতবর্ষ ॥

প্রথমে অন্তরের নিবিড়শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণতি জানাই বিশ্ববিশ্রুত ও পুণ্যশ্লোক মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের উদ্দেশ্যে,—যাঁর নামে লিখিত ও প্রদত্ত এই বক্তৃতা 'তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা'। বর্তমান যুগে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ ছিলেন মহাপ্রতিভাধর একজন প্রবাদপুরুষ। ভারতীয় সর্বশাস্ত্রে তাঁর অধিকার ছিল অনন্য ও অসাধারণ। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বের সমাজে তাঁর অসামান্য চিন্তা, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও অধ্যাত্মসাধনার অবদান চিরস্মরণীয় ও বরণীয়। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুনরায় শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণতি জানিয়ে আরম্ভ করি আমার এই কথিকা: 'তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা'। প্রথম দিনের আলোচনা 'ভারতবর্ষই তন্ত্রের জন্মস্থান'।

॥ এক ॥

॥ 'তন্ত্র'-শব্দের অর্থ ॥

'তন্ত্র'-শব্দের অর্থ শাস্ত্র, ক্রিয়ানুষ্ঠান, মন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি। তবে আগমশাস্ত্রে তার অর্থ শিবশক্তিতত্ত্ববিজ্ঞান। আচার্য রামানুজ-রচিত 'তন্ত্ররহস্য'-নামে একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়,—যাতে প্রভাকরমতের মীমাংসাদর্শন বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। আর আছে একটি গ্রন্থ লোকায়ত-নাস্তিক-দর্শন-সম্বন্ধে,—'লোকায়তং নাম নাস্তিকানাং তন্ত্রং শাস্ত্রম্'। বর্তমানে প্রসঙ্গত প্রধান আলোচ্য-বিষয় আগম-শাস্ত্রোক্ত শিবশক্তিতত্ত্বরহস্য ও তত্ত্বসাধনা।

॥ তন্ত্র বলতে সাধারণভাবে কি বুঝায় ॥

'তন্ত্র' সাধনশাস্ত্র ও শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভের পথে দিশারী। 'তন্ত্র' সাহায্য করে আগমোক্ত তত্ত্বগুলিকে উপলব্ধি করার জন্য। তন্ত্র শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের রহস্যদ্বার

উদ্‌ঘাটন করে এবং যন্ত্র, মন্ত্র, মন্ত্রোক্ত দেবতা, মুদ্রা, ন্যাস, উপাসনা, যোগ, পঞ্চতত্ত্ব-সমীক্ষা, ষট্‌চক্রসাধনা প্রভৃতির পরিচয় দান করে। মাতৃতত্ত্ব বা কুলকুণ্ডলিনীতত্ত্বের উপায় মন্ত্র ও মন্ত্রাধিপতি দেবতার চিন্তা বা ধ্যান, মন্ত্রজপ ও তার রহস্য, মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীশক্তি ও সহস্রারে পরশিবের ঐক্যসাধনরূপ সামরস্যোপলব্ধি প্রভৃতি তন্ত্র-সাধনার অন্তর্ভুক্ত।

'তন্ত্র'-শব্দের সাধারণ অর্থ তাই জ্ঞানের বিস্তারসাধন করা – 'তনোতি বিস্তারং করোতি', অথবা 'তন্যতে বিস্তার্যতে জ্ঞানং অনেন ইতি তন্ত্রম্' অথবা 'তনোতি বিপুল' অর্থং তত্ত্ব-তন্ত্র-সমন্বিতম্. এনঞ্চ কুরুতে যস্মাৎ তন্ত্র' ইত্যভিধীযতে'। তন্ত্রশাস্ত্রে থাকে যেমন তার অর্থ, তত্ত্ব ও মন্ত্রের বিষয়নির্ধারণের সার্থকতা, তেম্‌নি তন্ত্রে "মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ",—মন্ত্রাধিপতি দেবতার সঙ্গে মনের ঐক্যসাধন ক'রে জপ করলে মন্ত্র সাধকের অজ্ঞানপাশ মুক্ত করে। বঙ্গদেশীয় সাধক পূর্ণানন্দনাথ তাঁর 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি'-গ্রন্থে দ্বিতীয় প্রকাশে (অধ্যায়ে) ১৫৬-১৫৭ শ্লোকদুটিতে মন্ত্রের অর্থ ও সার্থকতা সম্বন্ধে বলেছেন—

'মননাৎ-ত্রাণাচ্চৈবমদ্রূযস্য৷বরোধনাৎ।
মন্ত্র ইত্যুচ্যতে সম্যক-শিবাধিষ্ঠাতোঽপি চ।
গুপ্তোপদেশতো মন্ত্রো মননাৎত্রাণনাদপি।
তেন মন্ত্র ইতি প্রোক্তো দেশিকৈস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥'

"মন্ত্রস্য দশ-সংস্কারাঃ কথ্যতে তন্ত্রবর্ত্মনা' জননং জীবনং পশ্চাৎ জ্ঞানং বোধনং তথা॥" তারপর আছে অভিষেক প্রভৃতি। কুলার্ণবতন্ত্রেও এ'সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তাছাড়া শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে ষট্‌চক্রের শ্রীবিদ্যাসাধনার অতিসুন্দরভাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে (ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রঃ)।

তন্ত্রের যা প্রধান উদ্দেশ্য সেই তত্ত্বের ও মন্ত্রের বিষয়নির্ধারণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তন্ত্রে। মোটকথা শব্দের সঙ্গে অর্থের কি সম্বন্ধ 'তত্ত্ব' বলতে কি বোঝায় এবং মন্ত্রের দেবতা ও মন্ত্রের সার্থকতা কি—তন্ত্র সেই সকলের পরিচয় প্রদান করে সাধকের জীবনকে উন্নত করার জন্য। 'তত্ত্ব' অর্থে শিব-শক্তি-তত্ত্ব এবং প্রকৃতি-তত্ত্বের পারে পুরুষতত্ত্ব। পুরুষের পাঁচটি কঞ্চুক বা উপাধি (আবরণ), -কলা, রাগ, বিদ্যা, কাল ও নিয়তি। এই উপাধিগুলির সৃষ্টি হয় কার্যমায়া থেকে। কার্যমায়া থেকে সৃষ্টি হয় ভ্রম। এমই শক্তিকে শিব থেকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করে। কার্যমায়ার পারে কারণমায়া শুদ্ধবিদ্যা। শুদ্ধবিদ্যাই জ্ঞান। এই শুদ্ধবিদ্যারূপ জ্ঞান থেকে 'অহং' ও 'ইদং',—বিষয় ও বিষয়ী-সম্বন্ধে অভিজ্ঞান জন্মায়। অহং ও

ইদং, অথবা অহন্তা ও ইদন্তা জ্ঞানের বিশ্লেষণই উপলব্ধি আনে শিবের বা ঈশ্বরজ্ঞানের। ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান এককথা। ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াময়ী বিমর্শশক্তি মহাপ্রকৃতি এবং প্রকাশময় শিব যে এক ও অভিন্ন এই সামরস্যোপলব্ধির দ্বার উন্মুক্ত করে। এই সামরস্যের উপলব্ধির নামই তন্ত্রে মুক্তি, কৈবল্য বা নির্বাণ।

॥ দুই ॥

॥ তন্ত্রের জন্মস্থান ভারতবর্ষ ॥

তন্ত্রশাস্ত্রের ও তন্ত্রসাধনার আদিক্ষেত্র বা জন্মস্থান ভারতবর্ষ। উনবিংশ-বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত 'বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক-সাধনায় জীবনের আদর্শ'-শীর্ষক প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বলেছেন: "বেদ ও তন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষেরই নিজস্ব। ইহাও মূলতঃ বিদেশ হইতে প্রকাশিত হয় নাই। ' * * যাঁহারা মনে করেন তন্ত্রশাস্ত্র ভারতবর্ষের বাহির হইতে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে কিংবা তৎপূর্বে দ্বিতীয় শতাব্দীতে (ভারতে) সমাগত হইয়াছে তাহাদের মত অমূলক"। তিনি পুনরায় বলেছেন: "ভারতবর্ষে তান্ত্রিক-সাধনা কত প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত তাহা বলা কঠিন। তবে অতি-পুরাতন সময় হইতেই বৈদিক ও তান্ত্রিক-সাধনা এই দেশে (ভারতবর্ষে) পাশাপাশি যে চলিয়া আসিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তান্ত্রিক-সাধনপদ্ধতি অত্যন্ত গুহ্য ও রহস্যময়,—এক সময়ে ইহা ভারতবর্ষের ন্যায় ক্রীট, এশিয়া-মাইনর, ইজিপ্ট, চীন প্রভৃতি দেশে ব্যাপ্ত ছিল। বৈদিক-সাধনা দেশবিশেষে ও বর্ণবিশেষে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু তান্ত্রিক-সাধনায় সে'রূপ কোন প্রকার বন্ধন প্রাচীনকালে ছিল বলিয়া মনে হয় না। যোগ্যতা ও অধিকারের বন্ধন খুব কঠোর ছিল বটে, কিন্তু অন্য প্রকার সামাজিক বন্ধন বোধহয় ততবেশী ছিল না। * নিরুক্তের (যাস্কের) আলোচনা হইতে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় যে, অতিপ্রাচীনকালেই বেদের একটি রহস্যমার্গ প্রচলিত ছিল,—যাহাতে আচার্যের বিশিষ্ট অনুগ্রহ ভিন্ন প্রবেশ-অধিকার জন্মিত না"। বেদের ঐ রহস্যমার্গকেই তন্ত্রসাধনমার্গ বলা যেতে পারে।

॥ তন্ত্রের উৎপত্তিস্থান-সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত বা মতভেদ ॥

তন্ত্রশাস্ত্রের ও তন্ত্রসাধনার উৎপত্তিস্থান ও উৎপত্তি (origin) নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবাদ বা মতভেদের অন্ত নাই। অধ্যাপক উইন্টারনিজ্ ও স্যার জন. উডরফ্

এবং আরও দুই-একজন ভারতীয় মনীষী-ছাড়া অধিকাংশ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মনীষীদের অভিমত যে, তন্ত্রের উৎপত্তিস্থান ভারতের বাইরে—অর্থাৎ ভারতের বহির্দেশ থেকেই তন্ত্রসাহিত্য ও তন্ত্রসাধনা ভারতে প্রবেশ করেছিল। পণ্ডিত গ্রীয়ারসন ও তাঁর মতানুবর্তীদের অভিমত যে, আর্যগণ যখন ভারতের বহির্দেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে তখন তারা দু'টি দলে বিভক্ত ছিল। একটি দল বা বিভাগ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ভারতের প্রান্তদেশে স্থান গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় বিভাগ বা দলটি অবাধে ভারত ভূমিতে প্রবেশ ক'রে বিশেষভাবে ভারতের উত্তরাঞ্চলে তাদের সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিস্তার সাধন করে। কিন্তু মাননীয় গ্রীয়ারসনের ঐ মতবাদ বিশ্বের পণ্ডিতসমাজে গৃহীত ও স্বীকৃত হয় নি, কেননা পরবর্তীকালে ভারতের বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করেছেন যে, আর্যজাতির ধর্ম, সাধনা ও সাহিত্য প্রভৃতি ভারতবর্ষেরই নিজস্ব সম্পদ। বেদের প্রায় সমসাময়িক কালেই তন্ত্রসাহিত্য, তন্ত্রধর্ম ও তন্ত্রসাধনা ভারতের সম্পদরূপে আদৃত ছিল, বৈদেশিক কোন জাতি ভারতে উপনিবেশ স্থাপন ক'রে তন্ত্রাচার ও তন্ত্রসাধনা ভারতে নূতন ক'রে প্রবর্তন করেনি।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের অভিমতও তাই। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁর *The Tantras: Studies on their Religion and Literature* -গ্রন্থে ঐ একই অভিমত প্রকাশ ক'রে বলেছেন: **"Elements cf the various Tāntrika rites are distinctly traceable to the Vedic rites......They are to be found even in the earliest Vedic works[১] e.g. the Rigveda, as also in other parts of the Vedic literature"**। শ্রদ্ধেয় চিন্তাহরণ চক্রবর্তী রুদ্রযামলের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে মহাদেবী অথর্ববেদসাক্ষিণী বা বুদ্ধেশ্বরীর উপাসনার কথা উল্লেখ করেছেন। অথর্ববেদসাক্ষিণীকে ব্রাহ্মণ্যশক্তি ও বুদ্ধেশ্বরীকে বৌদ্ধ-দেবীশক্তি ব'লে মনে করা যায়, কেননা ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক। মোটকথা তন্ত্র বেদ থেকে সৃষ্টি এবং বেদই তন্ত্রের জন্মকারণ ব'লে ধরে নিতে পারি। 'ললিতসহস্রনাম'-গ্রন্থের ভাষ্যকার পণ্ডিত ভাস্কররায়ের অভিমতে তন্ত্রের সৃষ্টি ও বিকাশ হয়েছিল উপনিষদেরই অংশরূপে,—যেমন শ্রৌতসূত্র ও ধর্মসাহিত্য-গুলিকে বৈদিক-সাহিত্যের অংশ ব'লে গণ্য করা হয়। তাছাড়া তান্ত্রিক-কৌলাচারে ব্যবহৃত যন্ত্র, মন্ত্র চক্র, মণ্ডল, ধারণী প্রভৃতির উল্লেখ অথর্ববেদে, তৈত্তিরীয়-আরণ্যক প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। আচার্য শঙ্কর-রচিত 'সৌন্দর্যলহরী'-

১। মহামুনি শৌনক-রচিত 'ঋগ্‌বিধানব্রাহ্মণ'-ও দ্রষ্টব্য।

স্তোত্রের ভাষ্যে পণ্ডিত লক্ষ্মীধর তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয়-আরণ্যক থেকে শ্রীবিদ্যাদেবীর উল্লেখ করেছেন। শ্রীবিদ্যাই ত্রিপুরসুন্দরীদেবী, তন্ত্রের শ্রীকুলের উপাস্যা দেবী।

অনেকে অথর্ববেদে ও তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে তান্ত্রিক মন্ত্র (কীলক) 'ফট্, খট্, বষট্, নমঃ' প্রভৃতিকে আভিচারিক বা ম্যাজিক্যাল মন্ত্র বলেন,—যা সম্পূর্ণ অমূলক ও গ্রহণযোগ্য নয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-প্রমুখ পণ্ডিতরা হিন্দুতন্ত্রকে বৌদ্ধতন্ত্র থেকে ধার করা ও বৌদ্ধতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত বলেছেন।[২] যেমন 'সাধনমালা'-গ্রন্থের Introduction-এ ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন : "The development on Tantra made by the Buddhists and the extraordinary plastic art they developed, did not fail again to create an impression on the mind of the Hindus, and they readily incorporated many ideas, doctrines and gods, originally conceived by the Buddhists in their religion and litarature. Hindu goddesses like Mahāchinatārā, Chinnāmastā, Kāli, etc were originally Buddhist।"[৩] ডক্টর বিনয়তোষবাবুর এই মন্তব্য কোন দিক দিয়েই গ্রহণযোগ্য নয়। স্যার্ জন. উডরফ্ এই মন্তব্য খণ্ডন করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মনীষী স্বীকার করেন যে, বৈদিক সংস্কৃতির আমলেই তান্ত্রিক-আচার ও সাধনা এবং বিশেষ ক'রে মহাশক্তিময়ী মাতৃপূজার প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, কেননা প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা ও অন্যান্য আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার ভিতর বৈদিক-সংস্কৃতির ও আচারের পাশাপাশি তান্ত্রিক সংস্কৃতি ও আচারের বহু উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। তাছাড়া তান্ত্রিক-মাতৃ-উপাসনার পাশাপাশি যোগসাধনার বহু নিদর্শনও ঐ সকল প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা থেকে পাওয়া যায়। স্যার জন মার্শাল, আর্নেষ্ট ম্যাকে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম সাহানী, ভাট্স, ননীগোপাল মজুমদার, রায়-বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ-প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা নিঃসংশয়ে স্বীকার করেছেন যে, মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক বা প্রাগ্বৈদিক সভ্যতায় শিব-শক্তি-উপাসনার প্রচলন ছিল। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মিহিরচাঁদ খান্না,

---

২। হরপ্রসাদ সংবর্ধনামালায় প্রকাশিত ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিত 'ছদ্মবেশে দেবদেবী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩। Vide *Sādhanamālā* (Barodā ed., 1925), p. *XIX*.

ডক্টর ডি. সি. সরকার প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকরা এই প্রসঙ্গে স্যার. জন. মার্শালের বক্তব্য উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন : "The objects unearthed at the prehistoric (circa 2750 B. C.) sites of the Indus Valley prove the prevalence of the cults of the Father-god and Mother-goddess among the pre-Aryan peoples of India. The Mohenjo-daro people worshipped a male god who may be regarded as the proto-type of Śiva. He represented as seated in the *Yoga*-posture, surrounded by animals, and has three visible faces with two horns on two sides of tall head-dress··· This apparently explains the later conception of Śiva as a *Yogin*, styled *Pashupati* in *Linga*, being specially important, and his special attribute being the three eyes and the trident probably associated respectively with the three faces, and the two horns together with the head-dress."

ডক্টর ডি. সি সরকার বলেছেন : "The objects found at Mohenjo-daro include many figurines of the Mother-goddess, and point to the wide prevalence of her cult. Such figurines, discovered from the prehistoric as well as later sites in different parts of India, are usually nude, but wear a peculiar head-dress, a wide girdle and quantity of jewellery. A prehistoric terracotta seal from Harappā contains a representation of the same goddess who is shown upside down with her legs wide apart and a plant issuing from her womb and with a pair of tigers (cf. the association of the lion with the Indian Mother-goddess) towards the left, standing facing each other."

॥ ভারতে দেবী-ধারণার বিকাশ ও বিস্তৃতি ॥

ভারতের সুপ্রাচীন সাহিত্য ঋগ্বেদে যেমন ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি পুরুষ-দেবতাদের পরিচয় পাই, তেমনি পাই বৈদিক দেবী অদিতি, ঊষা, সরস্বতী

প্রভৃতির বর্ণনা ও ধারণা। বেদে বর্ণিত অদিতি, ঊষা, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীই সমগ্র বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশে বিশ্বমাতৃত্বের তথাMother Goddess-এর ধারণার কেন্দ্র ও কারণ। অধ্যাপক বলরাম শ্রীবাস্তব তাঁর *Iconography of Sakti* । উল্লেখ করেছেন: "The archaeological discoveries of Mother Goddess figurines throughout the areas of prehistoric world, essentially the Eastern Europe, Western Asia, Persia and India indicate that the Cradleland of the Mother goddess cult was in the Southern Russian Stepples and Western Asia". ডক্টর বাসুদেব আগরওয়ালার অভিমতও তাই। পাশ্চাত্য-মনীষী E. O. James তাঁর *The Cult of the Mother Goddess*-গ্রন্থে ভিন্নভাবে এ'কথা স্বীকার করেছেন।

॥ ভারতে বিশ্বমাতৃত্বের ধারণা ও উপাসনা ॥

ভারতে মহাশক্তিরূপ বিশ্বমাতার (The Great Goddess) ধারণা ও উপাসনা সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। "ভারতে শক্তিপূজা'-গ্রন্থে পরমশ্রদ্ধাস্পদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ উল্লেখ করেছেন: "জগৎকারণ ঈশ্বরকে জগৎজননী, জগদম্বা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া নারীভাবে উপাসনা করা ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি। পাশ্চাত্য প্রভৃতি ভারতেতর দেশে ঈশ্বরের পিতৃভাবে উপাসনারই প্রচলন দেখা যায়"।

বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দের অভিমতও তাই। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকেই বিশ্বসভ্যতা ও বিশ্বসংস্কৃতির আদিভূমি ও পীঠস্থানরূপে বর্ণনা করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দের অভিমতও তাই। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর *Divine Heritage of Man*-গ্রন্থে 'Father and Motherhood of God'-প্রসঙ্গে বলেছেন: "The Vedāntic idea that God is the Mother as well as the Father of all harmonises with the modern scientific conception of God. Modern science traces the whole phenomenal universe back to the state of eternal Energy. The doctrine of evolution, correlation of forces, persistence of energy,—all these clearly prove that the phenomena of the whole universe and the various

forces of the external and internal world are but the expressions of one eternal Energy. * * * Science teaches that the universe existed in a potential state in that Energy, and gradually through the process of evolution the whole potentuality has become kinetic or actual. * * * That Energy is intelligent. We may call the self-existing inteligent eternal cosmic Energy the Mother of the universe. She is the source of infinite forces and infinite phenomena. This eternal Energy is called in Sanskrit *Prakriti* (Latin *procreatrix),* the creative power of the universe.

"The Hindus of India have understood the Eternal Energy as the Mother of the universe, and worshipped Her from the prehistoric time.. ...There is no country in the world except India where God, the Supreme Being, has been worshipped from the time immemorial as the Divine Mother of the universe. India is the only country where the earthly mother is also looked upon as the living Deity."

পাশ্চাত্য মনীষী স্যার মনিয়র-মনিয়র উইলিয়ামস্‌ও (Sir Monier-Monier Williams) তাঁর *Hinduism and Brāhmanism*-গ্রন্থে (পৃঃ ২২২) ঈশ্বরের মাতৃত্ব স্বীকার ক'রে ভারতের নারীজাতিকে পরমপূজিত বিশ্বমাতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত ব'লে স্বীকার করেছেন। ভারতের বেদ, ব্রাহ্মণসাহিত্য, আরণ্যক, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ এবং তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ ঈশ্বরকে বিশ্বপিতার মহিমময় আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ভারতের মহিমময়ী ধারণাকে চিরস্মরণীয় ও মহিময় করেছে।

প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে বাণভট্টের 'চণ্ডীশতক' ও গুপ্তযুগে সংকলিত 'সপ্তশতীচণ্ডী'-তে দেবতা অপেক্ষা মহাশক্তিময়ী দেবীর প্রকাশ ও প্রভাব ভারতীয় সমাজে অধিক দেখা যায়। ডক্টর জে. এন. তেওয়ারী তাঁর *Goddess Cults in Ancient India*-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: "Since the poem is entitled *'Chandiśataka'*, Chandi or Chandikā could be imagined as the principal name of the Goddess, but in the stanzas themselves, the name Pārvati appears most frequently.

Other frequently appearing names are Umā, Devi and Ambikā. Several names of the Goddess are specially from those of Śiva, such as Śivā, Bhavāni, Rudrāni, and Sarvāni. The Goddess is sometimes referred as Kāli or Kālikā, Bhadrakāli, Durgā, Kātyāyani, Āryā, Gauri, etc., and some names refer to her as the daughter of Himavat mountain." তাছাড়া সপ্তশতীচণ্ডীতে বিশ্বমাতা মহিষাসুরমর্দ্দিণী-দুর্গার উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহাদেবী কৌষিকী ও কালিকার রূপভেদের কথাও বর্ণিত আছে। এরা সকলেই ভারতীয় মহাশক্তি।

পূর্বে ভারতীয় মহাশক্তিরূপে হিমালয়দুহিতা পার্বতীর নামোল্লেখ করেছি। ডক্টর বাসুদেব আগরওয়ালা বামনপুরাণের আলোচনায় তাঁর *Vāmana Purāṇa—A Study*-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে হিমালয়-দুহিতা পার্বতীই তন্ত্রে 'কুণ্ডলিনী'-শক্তিরূপে পরিচিতা। কুণ্ডলিনীশক্তি বা 'কুল-কুণ্ডলিনীই মহাশক্তি কালী বা কালিকা,—যিনি তন্ত্রসাধনার প্রধানা নায়িকা ও দেবী। ডঃ আগরওয়ালা বলেছেন: "His daughter (Himavata's daughter) Pārvati is identical with what in the Tantra in known as *Kundalini*. Pārvati has a composite form of Śiva, that is, the *Ardha-nariśwara* form in which the male-half is the symbol of Agni and the female-half is that of Soma." বেদের অগ্নি-সোমই তন্ত্রের শিব-শক্তি।

তাছাড়া কবি বিদ্যাপতি-রচিত শ্রীশ্রীদুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর ভূমিকায় ঈশানচন্দ্র শর্ম্মা-বিদ্যাবিনোদ লিখেছেন: "(শ্রীশ্রীচণ্ডীর রাত্রিসূক্ত ও দেবীসূক্ত) দুইটী মন্ত্রে স্পষ্টই দুর্গার উল্লেখ আছে। রাত্রিসূক্ত ও দেবীসূক্ত ঋগ্বেদের শাকলসংহিতার অন্তর্গত। মহামতি ভাস্কর রায় লিখিয়াছেন: 'রাত্রিসূক্তে-দেবীসূক্তে ঋগ্বেদশাকল-সংহিতায়াং প্রসিদ্ধে'। অগ্নিধানব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থে রাত্রিসূক্তপাঠের নিয়ম আছে। 'বৃহদ্দেবতা' ঋগ্বেদের দেবতাগ্রন্থ, তাহাতেও দুর্গার উল্লেখ আছে। মরীচিকল্পে দুর্গাসপ্তশতীর পুরশ্চারণ প্রয়োগে দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তদ্বারা হোমের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

'এবং দেবি ময়া প্রোক্তঃ পৌরশ্চারনিকঃ ক্রমঃ
তদন্তে হবনং কুর্যাৎ প্রতিশ্লোকেন পায়সং ॥
রাত্রিসূক্তং প্রতিঋচং তথাদেব্যাশ্চ-সূক্তকং
হুত্বান্তে প্রজপেৎ স্তোত্রমাদৌ পূজাদিকং মুনে ॥

দেবীসূক্ত এবং রাত্রীসূক্ত মূল ঋক্ এবং দুর্গা প্রতিপাদক বলিয়াই মরীচিকল্পে এইরূপ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে।"

তাছাড়া এ'কথাও প্রমাণিত যে সপ্তশতীচণ্ডীর অধিপতি দেবী শ্রীচণ্ডিকা একাধারে কালী বা কালিকা, কৌষিকী, উমা, ভবানী এবং প্রধানা ত্রিশক্তি মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষ্মী। আসলে দেবী দুর্গারই তিনরূপ বা প্রকাশ মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষ্মী।

বামণপুরাণে ও মৎস্যপুরাণে তন্ত্রদৃষ্টিতে অগ্নিষোমের সোমই দেবী কৌষিকী এবং অগ্নি দেবী কালিকা। ঋগ্বেদে এই অগ্নিষোমের উল্লেখ আছে। পুরাণে দেবী কৌষিকী প্রসন্নমূর্তি ও দেবী কালিকা উগ্রমূর্তি। তবে দেবী কালিকা সৃষ্টিকারিণী, আবার প্রলয়ঙ্করী। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী চামুণ্ডার উল্লেখ আছে। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার অষ্টমী ও নবমীর সান্ধিক্ষণে দেবী চামুণ্ডার আবির্ভাব। 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি'-তে পরমহংস পূর্ণানন্দ বারাহীদেবীর পর দেবী চামুণ্ডার ও পরে মহালক্ষ্মীর ধ্যান বর্ণনা করেছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উল্লিখিত বাক্‌সূক্ত, রাত্রীসূক্ত ও শ্রীসূক্ত থেকে মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষ্মীর বিকাশের কথা আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর টীকাকার নাগোজী-ভট্ট ও ভাস্কর-রায় এবং 'সৌন্দর্যলহরী'-র টীকাকার শ্রীমল্লক্ষ্মীধর ঐ দেবীত্রয়কে ব্রহ্মাদি দেবতা, সত্ত্বাদি গুণ, মহারাত্রী প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করেছেন—

(১) মহাকালী—মহাসরস্বতী—মহালক্ষ্মী,
(২) মধ্যমা—পশ্যন্তী—বৈখরী,
(৩) বিষ্ণু—ব্রহ্মা—রুদ্র,
(৪) সত্ত্ব—রজঃ—তমঃ,
(৫) কালরাত্রী—মহারাত্রী—মোহরাত্রী।

মহালক্ষ্মী ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যের প্রতীক, সেজন্য বৈখরী বাক্ বা শব্দ বিশ্বের বাহ্যবিকাশ।

॥ সপ্তমাতৃকা ॥

বেদে সপ্তমাতৃকার উল্লেখ আছে। ঐ সপ্তমাতৃকার নাম ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, ইন্দ্রাণী বা কৌমারী, বারাহী, নারসিংহী ও চামুণ্ডা[৪] আগমশাস্ত্রে বা তন্ত্রে ঐ সপ্ত-মাতৃকাই শ্রীশ্রীচণ্ডী দুর্গা ও কালীরই রূপান্তর ও নামান্তর। ঐ সকল তান্ত্রিকী-দেবী

৪। অনেকে দেবী চামুণ্ডাকে সপ্তমাতৃকাশ্রেণীতে গ্রহণ না ক'রে ইন্দ্রাণী ও কৌমারীকে গ্রহণ করেন। এ'টি মতভেদ বা মতান্তরমাত্র।

অগ্নিরূপী শিবের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তাছাড়া ঐ মাতৃকাগণ দেবী কাত্যায়নী,—যিনি শ্রীশ্রীদুর্গার আদি ও প্রতিরূপ,—তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত। মোটকথা ঐ রূপ ও প্রতিরূপের আলোকে এ'কথাই প্রমাণ হয় যে, বৈদিক দেবী অদিতি, উষা, সরস্বতী প্রভৃতির পরবর্তীকালে তান্ত্রিকী-প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। গুপ্তযুগের সূচনা থেকে ঐ সকল দেবী ও মাতৃকা নূতন রূপে ও পরিবেশে তান্ত্রিকী-দেবী ও মাতৃকা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন ব'লে মনে হয়। তাছাড়া ঋগ্বেদে বর্ণিত অদিতি ও পৃথ্বী বা পৃথিবী পৌরাণিক যুগে এবং বিশেষ ক'রে গুপ্তযুগে তান্ত্রিকী-পরিবেশে নূতন নামে ও রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

॥ অদিতি ও পৃথিবী ॥

ঋগ্বেদের প্রধানা দেবী অদিতি এবং অথর্ববেদের প্রধানা দেবী পৃথিবী বা পৃথ্বীদেবী। এই দুই দেবীই পরবর্তী পৌরাণিক যুগে তথা গুপ্তযুগে সর্বংসহা-ভবানী ও দুর্গাদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণী ও পদার্থসকলকে ধারণ ও পালন করার জন্য। পৃথিবী বা পৃথ্বীদেবীর আর-এক নাম ধরিত্রী বা ধারয়িত্রী (ধরণী) সকল প্রাণী ও পদার্থকে ধারণ করার জন্য। অথর্ববেদে (১২।১।১২' আছে : "মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহম্—পৃথিব্যাঃ"। ডক্টর বাসুদেব আগরওয়ালা তাঁর *Mother Earth*-প্রবন্ধে ('নেহেরু-অভিনন্দন-গ্রন্থ [১৯৪৯]) বলেছেন যে, অথর্ববেদের ১২।১।৮ মন্ত্রে বলা হয়েছে : "যস্যাঃ হৃদয়ং সত্যেনাবৃতং অমৃতং পৃথিব্যাঃ",—অর্থাৎ সত্য-স্বরূপ অমৃতের দ্বারা পৃথিবীর হৃদয় আবৃত ও পূর্ণ। পৃথিবীর মতো দেবী অদিতিও ঋগ্বেদের ১০।৭২।৩-৪ মন্ত্রদু'টিতে বর্ণিত হয়েছেন,—"অদিতিউর্ত্তানপদঃ"। পৃথিবী সর্বংসহাদেবীরূপে পূজিতা, —"**She is constantly identified with her in the later Vedic literature**". বেদে সর্বধারয়িত্রী দেবীরূপে যেমন পৃথিবী বর্ণিতা, তেমনি পুরাণে ঐ পৃথিবী দেবীই অম্বিকা, উমা, ভবানী, কালিকা প্রভৃতি নামে পূজিতা। অবশ্য এ. কে কুমার-স্বামী পৃথিবীকে এখানে পদ্মশ্রী লক্ষ্মী বলেছেন।

তা'ছাড়া লক্ষ্য করার বিষয় যে, ঋগ্বেদের বাক্, রাত্রী ও শ্রী এই তিনটি সূক্ত-মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষ্মীরূপে রূপান্তরিত হ'য়ে ভারতীয়-সমাজে শ্রদ্ধার ও পূজার আসন লাভ করেছিলেন। বেদ থেকে তন্ত্রে ও পুরাণে রূপান্তরিত এই তিনটি দেবী ভারতের মহাশক্তি ও বিশ্বজননী।

॥ দেবতা-ধারণায় ক্রমোন্নতির স্তর ॥

দর্শনচিন্তার সমুন্নত ধারণাও ক্রমোচ্চগতির মতো জড় থেকে চৈতন্যের — অনাত্মা থেকে আত্মা বা পরমাত্মার দিকে প্রবাহিত। ছান্দোগ্য-উপনিষদেও তার প্রত্যক্ষপ্রমাণ পাওয়া যায়,—যখন জড়সূর্যের মধ্যে জ্যোতিস্মান্ নারায়ণের তথা চৈতন্যের প্রকাশ আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাছাড়া মার্কণ্ডেয়পুরাণ গুপ্তযুগের তথা গুপ্তরাজাদের শাসনের প্রথমের দিকেই রচিত হয়েছিল সে কথা বলেছি। অবশ্য কুষাণযুগে বৌদ্ধদেবদেবী-ছাড়া ভগবান বুদ্ধের মূর্তিকল্পনাও সার্থকরূপ ধারণ করেছিল ° বৌদ্ধযুগের মতো গুপ্তযুগ স্বর্ণযুগরূপে পরিগণিত। গুপ্তযুগে বৌদ্ধধর্মের কিছুটা প্রভাব থাকলেও তার সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের বৈষ্ণবাচার ও হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যধর্মের তন্ত্রাচারেরও প্রভাব ছিল. সুতরাং ঐ সময়ে শ্রীশ্রীচণ্ডীর দেবীমাহাত্ম্যে বাক্‌সূত্র ও রাত্রিসূক্ত তথা রাত্রিদেবীর সূক্তে তন্ত্রাচারের প্রভাব থাকা-কিছু বিচিত্র নয়। মার্কেণ্ডয়পুরাণে শ্রীশ্রীচণ্ডীর পূজা মহাশক্তিরই পূজা ও আরাধনা। ঐ পূজায় ঋগ্বেদীর-বাক্ ও রাত্রিসূক্তের প্রচলন থাকায় বৈদিক-আচারের সঙ্গে তন্ত্রাচারের সম্পৃক্তি থাকা স্বাভাবিক।

তাছাড়া দেখা যায়, দেবী বাক্‌দেবী রাত্রি ও শ্রীদেবীর ধারণা ধীরে-ধীরে তান্ত্রিকী-শক্তি পরমাপ্রকৃতিরূপা মহালক্ষ্মী, মহাকালী ও মহাসরস্বতী-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল সে কথা বলেছি। এই সম্পর্কে ডক্টর পুষ্পেন্দ্র কুমার তাঁর *Sakti Cult in Ancient India* গ্রন্থে বলেছেন যে' যদিও ঋগ্বেদে অম্বিকা উমা, দুর্গা ও কালী নামে কোন দেবী বা স্ত্রীদেবতার স্পষ্ট উল্লেখ নাই. কিন্তু এ'কথা সত্য যে, ঋগ্বেদের শ্রীসূক্ত নামে একটি পরিশিষ্ট ছিল। ঐ শ্রীসূক্তটি শ্রীদেবীর প্রশংসায় ১৫টি কবিতাংশে (*verses*) লিখিত। সুতরাং ঋগ্বেদের দেবী, রাত্রি ও শ্রী এই তিনটি সূক্ত পরে দুর্গাসপ্তশতী শ্রীশ্রীচণ্ডীর দেবীমাহাত্ম্যের অঙ্গীভূত করা হয়েছিল। ঋগ্বেদেরই বাক্-সরস্বতী রাত্রি ও শ্রীদেবী এই তিনটি দেবীর ধারণা নিয়ে পরে মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষ্মী এই তান্ত্রিকী-দেবীতে রূপায়িত হয়েছিল : "The three deities viz *Vāc Sarasvati*. *Rātri* and *Sri* of the hyms, *Vāk-Sukta*, *Rātri-Sukta* and *Śri-Sukta*[৬] give us a vivid

° হীনযানি সর্বাস্তিবাদীদের কল্পনায়।

৬। (a) ঋগ্বেদের বাক্‌সূক্ত,—"ওঁ অহং রুদ্রেভিঃ···(ঋগ্বেদ, ১০।১০।১২৫)।

(b) রাত্রিসূক্ত,—'ওঁ রাত্রী ব্যখ্যাদায়তী···(ঋগ্বেদ ১০।১০।১২৭)

(c) শ্রীসূক্ত,—দ্রষ্টব্য।

picture of the three manifestations of Śakti as *Mahākālī*, *Mahālaksmi* and *Mahāsarasvati*" (p. 16).

॥ শ্রীশ্রীচণ্ডীর গুপ্তবতীটীকার প্রমাণ ॥

খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতকে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রবক্তা পণ্ডিত ভাস্কর-রায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপর 'গুপ্তবতী'-টীকা[৭] রচনা করেন। তিনি শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদের সমর্থক। সপ্তশতী-চণ্ডীর উপোদ্‌ঘাতে তিনি জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াময়ী অনন্যা-ত্রিশক্তি 'মহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতী'-র কথাই বলেছেন বাক্, রাত্রি ও শ্রীসূক্তের সঙ্গে-সঙ্গে দেবী বাক্, দেবী রাত্রি ও দেবী শ্রীর প্রসঙ্গে "শুদ্ধব্রহ্মাভিন্নানাং জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াণাং তিসৃণাং ব্যষ্টীনাং মহাসরস্বতী-মহাকালী-মহালক্ষ্মীরিতি প্রবৃত্তিনিমিত্তবৈলক্ষণ্যেন নাম-রূপান্তরাণি"। এ'প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয়পুরাণের তিনটি অংশ—মধুকৈটভবধ, মহিষাসুরবধ ও শুম্ভনিশুম্ভবধের কথা উল্লেখ করি। ডক্টর হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর 'হিন্দুদের দেবদেবী' (উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ)-গ্রন্থের তৃতীয় পর্বে বলেছেন: "লক্ষ্মী ও দুর্গা-চণ্ডীর উৎস বৈদিক দিব্য-সরস্বতী। পার্বতী বা দুর্গা-চণ্ডী যে (ঋগ্বেদোক্ত) সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্না তা মার্কণ্ডেয়পুরাণের তিনটি অংশ,—মধুকৈটভবধ, মহিসাসুরবধ ও শুম্ভ-নিশুম্ভবধ থেকে প্রমাণিত হয়। প্রথম অংশের দেবতা মহাকালী, দ্বিতীয় অংশের দেবতা মহালক্ষ্মী এবং তৃতীয় অংশের দেবতা মহাসরস্বতী। চণ্ডীপাঠের পূর্বে পাঠ্যবিনিয়োগমন্ত্র: 'প্রথম-চরিতস্য ব্রহ্মঋষিমহাকালীদেবতা··· অগ্নিস্তত্ত্বং মহাকালীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। মধ্যম-চরিতস্য বিষ্ণুঋষি-মহালক্ষ্মীদেবতা·· বায়ুস্তত্ত্বং মহালক্ষ্মী প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। উত্তরচরিতস্য রুদ্রঋষিঃ সরস্বতীদেবতা···সূর্যস্তত্ত্বং মহাসরস্বতীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

'বৈদিকোত্তর একই দেবতার তিনটি রূপ মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। এ' থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনটি দেবীই অভিন্না। এই তিনটি দেবীচরিত্রের তত্ত্ব অগ্নি, বায়ু ও সূর্য,— তিনই এক ও অভিন্ন, অর্থাৎ সূর্যাগ্নিরূপিণী। শ্রীশ্রীচণ্ডীর টীকাকার গোপাল চক্রবর্তী বলেন: 'সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুরনিসূদিনী ইতি যামলে' ;—অর্থাৎ (রুদ্র-) যামলতন্ত্রে সরস্বতীকেই শুম্ভাসুরহন্ত্রী বলা হয়েছে। আবার ডামরতন্ত্রে শুম্ভাসুরবিনাশিনী অষ্টভুজা মহাসরস্বতীর বর্ণনা আছে।" (পৃঃ ১৯৪-১৯৫)।

৭। 'গুপ্তবতী'—শ্রীশ্রীচণ্ডীর গোপন-রহস্যময়ী টীকা।

॥ বেদোত্তর-সাহিত্যে বিশ্বমাতৃত্বের ধারণা ॥

বৈদিকসাহিত্যরূপে বাজসনেয়ী-সংহিতায় ৩।৫৩ মন্ত্রে রুদ্রদেবতার ভগ্নিরূপে অম্বিকাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সেখানে অম্বিকাদেবীকে রুদ্রের সঙ্গে একসঙ্গে যজ্ঞে আবির্ভূত হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। এই যজ্ঞের নাম ত্র্যম্বকহোম। এই হোমে ঘৃতসিক্ত পলাশপত্র আহুতি দেওয়ার বিধি ছিল। শতপথব্রাহ্মণের ২।৩/৪ মন্ত্রে একথার উল্লেখ আছে।

তৈত্তিরীয়সংহিতা ১।৮।৬।৪ মন্ত্রেও অম্বিকাদেবীর উল্লেখ আছে। এই দেবী তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের ১।৬।১০ মন্ত্রে ও শতপথব্রাহ্মণের ১১।৬।২।৯ মন্ত্রে 'শারদী' বা শরৎকালীন-দেবীরূপে (দুর্গা) বর্ণিতা। অবশ্য তৈত্তিরীয়-আরণ্যকেও (১০।১৮) রুদ্রের কথা আছে, কিন্তু তিনি অম্বিকাপতি। ডক্টর পুষ্পেন্দ্রকুমার বলেছেনঃ "Now we can say that *Ambikā* is an autumn goddess, related to *Rudra*"। ডক্টর এ. বি. কিথ (A. B. Keith) মন্তব্য করেছেন যে, ঐ রুদ্রই ঋগ্বেদে (ঋক্ ৭।৫১।১২) রুদ্রদেবতা।[৮] কিন্তু এ'সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

এ'ভাবেই তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে (১০।১৮) উমার কথা পাওয়া যায়। রুদ্রকে এখানে উমাপতিরূপে আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু বেদের রুদ্রই যে উমাপতি-শিব বা মহেশ্বররূপে পরবর্তীকালে পুরাণসাহিত্যে রূপান্তরিত হয়েছিল এর ঠিক প্রত্যক্ষপ্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কেনোপনিষদে (৩।২৫) উমা-হৈমবতীর ধারণা সুস্পষ্ট। দেবী উমা সেখানে হিমালয়পর্বতদুহিতা পার্বতী। হিমবৎ-পর্বতের দুহিতা ব'লে হৈমবতী, আবার পর্বতবাসিনী ব'লে পার্বতী। বৈদিকসাহিত্যে শিবকে বহুস্থানে গিরীশ, গিরিশন্ত, গিরিত্র প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দেবী উমাকে 'গিরিজা' বলা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (১।৩) শক্তিধারণাসম্পৃক্ত শিবের উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য শ্রৌতসূত্রে ও গৃহসূত্রে (শাঙ্খ্যায়নশ্রৌতসূত্র ৫।২০ এবং বৌধায়নধর্মসূত্র ২।৫।৬) দেবীধারণার উল্লেখে ভদ্রকালী, জ্যেষ্ঠা ও দুর্গা প্রভৃতি দেবীশব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুণ্ডকোপনিষদে কালী, করালী মনোজবা প্রভৃতি অগ্নিশিখাগুলির নাম তাৎপর্যপূর্ণ। অগ্নিশিখা-গুলিকে অগ্নির জিহ্বা কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু পুরাণে অগ্নিজিহ্বাগুলি দেবী সরস্বতী নামেও পরিচিত। তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে (১০।১।৭) কাত্যায়নী,

৮। Vide Dr. A. B. Keith. *Religion and Philosophy of the Vedas* Vol, 3, p. 144

বিরোচনী, কর্ন্যা, কুমারী বা কন্যাকুমারী প্রভৃতি নামগুলিও অর্থপূর্ণ। পৌরাণিক যুগে কন্যা ও কুমারীর সংমিশ্রণে দেবী দুর্গার নাম কন্যাকুমারী হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে দেবী কন্যাকুমারী অবিবাহিতা-কুমারী, কিন্তু দুর্গা, উমা ও পার্বতী শিবসোহাগিনী ও শঙ্করগৃহিণী। সে'জন্য দেবীধারণায় রূপান্তরনীতি ইতিহাস-সেবিত,—না কল্পনাপ্রসূত? অবশ্য ধারণার রূপান্তরণনীতি সকল সময়েই এক রকমের হয় না,—যেমন যজ্ঞাগ্নিলিহা জিহ্বারূপে কল্পিতা, আবাব দেবীরূপেও কল্পিতা। পুনরায় বৈদিকী ও পৌরাণিকীধারণায় বিদ্যাদেবী সরস্বতী বিভিন্ন রূপে ও নামে প্রকাশিত,—যেমন কখনও ইলা ও ভারতীর সঙ্গে অভিন্না হ'য়ে সরস্বতী, সূর্যাকিরণময়ী সবস্বতী, নদী-সরস্বতী ও দেবী-সরস্বতী, অন্নদাত্রী-সরস্বতী, বাক্‌দেবী-সরস্বতী, শারদা-সবস্বতী, বৌদ্ধ-তারারূপিণী-সরস্বতী, মহানীল-সরস্বতী, জৈন-সরস্বতী, বজ্র-সরস্বতী, গায়ত্রী-সবস্বতী, সিংহবাহনী-সরস্বতী, আবার কখনও কখনও মরুদ্‌গণ ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়সঙ্গিনী-সরস্বতী। ধারণা ও চিন্তাভেদে দেবী ও দেবতাদের ভিন্ন-ভিন্ন রূপের বিকাশ হওয়া অসম্ভব নয়, বরং স্বাভাবিকই।

॥ দেবীধারণা ও দেবীপূজা তন্ত্রের অপরিহার্য-অঙ্গ ॥

বৈদিককাল থেকে পৌরাণিক ও তার পরবর্তী যুগে ভারতে মহাশক্তির ধারণার ও উপাসনার সৃষ্টি হয়েছে এবং ঐ প্রধানা দেবীদের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ ও সহ-চারিণীরূপে মাতৃকা, ডাকিনী ও যোগিনীদের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রদ্ধেয় এন. পি. যোশী তাঁর '*Mātrikā-Mothers in Kuśāṇa Art*' (1986) এ' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: "With the rise of the guptas a new Change Crept in. This was association of the *mātrikās* with Śiva. That with Śiva has been reflected in the Purāṇas like *Brahma*, the *Matsya*, the *Mārkaṇḍeya*, the *Kurma* the *Padma* etc.........Association of *mātrikās* with Viṣṇu in Narasiṁha as a *mātrikā*, but she too had a very limited scope. In the sculptures, on the other hand, right from the Gupta period Vārāhi, the female energy of Varāha, the third in incarnation of Viṣṇu, comes up as an important *mātrikā*."

প্রকৃতপক্ষে গুপ্তযুগে দেবীধারণা ও দেবী উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে শৈব ও বৈষ্ণব-ধর্মের পাশাপাশি শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে তন্ত্রসাধনার ধারাও বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং

ঠিক ঐ সময়েই বল্‌তে গেলে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে অনুষ্ঠিত তন্ত্রসাধনার মতো বৌদ্ধধর্মেও তন্ত্রসাধনার বিকাশ সাধিত হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় এন জি. যোশী তাই বলেছেন: "In the Gupta period, almost simultaneously with Vaiṣṇava and Śaiva Cults the Śakti Cult also was getting deep rooted, and Śakti, the Supreme Goddess, was being conceived of as emanating energies of Brāhmi; Vaiṣṇavi and Māhesvari, the female energies of the three principal gods responsible for creation, maintenance and destruction" ঋগ্বেদে সপ্তমাতৃকা বা মাতার মতো তন্ত্রে ও পুরাণেও সপ্তমাতৃকার সমাদর ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তন্ত্রে ও পুরাণে সপ্তমাতৃকাদের মধ্যে দেবী কালিকার অভিন্নরূপ চামুণ্ডার নাম সুপরিচিত,— যিনি শ্রদ্ধায় ও সমাদরে মহিষাসুরমর্দ্দিনী-দুর্গার সঙ্গে পূজিতা হ'য়ে থাকেন অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে। তবে এই দেবী চামুণ্ডা কিন্তু ঘোরা ও প্রচণ্ডা, আর প্রধানা দেবী দুর্গা প্রসন্না, বরদা ও কল্যাণদায়িনী। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে এ'জন্য দেবী চামুণ্ডাকে শান্ত করার জন্য বিনায়ক তথা গণপতি বা গণেশ-পূজার বিধিরও ব্যবস্থা আছে। অবশ্য পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে কুষাণযুগের মাতৃকা ও যোগিনীদের সঙ্গে শিবপূজারও বিধি-ব্যবস্থা ছিল। স্কন্দপুরাণের অবন্তিকাণ্ডে তান্ত্রিক-অনুষ্ঠানে মাতৃকাচক্রের বা যোগিনীচক্রের পরিবর্তে সপ্তমাতৃকার প্রচারের বিধি-ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

মাননীয় শর্মা ভেড়াঘাটে চৌষট্টী-যোগিনীদের মন্দিরে উপাসনার কথা উল্লেখ করেছেন প্রধানা দেবী ও মাতৃকাদের উপাসনার সঙ্গে। বিশেষত নিউ দিল্লী ন্যাসনাল-লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত বিদ্যা দেহেজিয়া-লিখিত *Yogini Cult and Temples—A Tantric Tradition* (1916)-গ্রন্থে তথ্য-পরিবেশনে বর্ণনা ভারতে শক্তিপূজার ও তন্ত্রসাধনার অঙ্গরূপে মাতৃকা ও যোগিনীদের পূজা-উপাসনার বহু রহস্য-কথার সঙ্গে আমাদের পরিচিত করেছে। মাননীয়া দেহেজিয়া লিখেছেন: "It is, however from *tantras* belonging in Kaul (or Kaula), school that really significant information on the Yogini and the cult associated with them may be culled. * * Cults associated with tantra are esoteric by nature…". কুলার্ণবতন্ত্রে যোগিনী ও যোগিনীহৃদয়-তন্ত্রে যোগিনীদের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকৃতির ও রূপের মাতৃকাদের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তা থেকে ভারতে যে এক সময়ে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন-সাধনার জগতে তন্ত্রাচার প্রভৃতির বহুল প্রচার ছিল এ'কথা জানা যায়।

বিশেষভাবে হিন্দুতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব ও সাধনা অব্যাহত ছিল। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, প্রধানা দেবী বা মহাশক্তির গণ, সঙ্গিনী বা পার্শ্বচরীরূপে বহু যোগিনী ও মাতৃকাদের প্রকাশ ছিল প্রাচীন ভারতে। দেবী কালিকা, চণ্ডীকা. মহিষমর্দ্দিনী-দুর্গা প্রভৃতি মহিমময়ী দেবীদের পার্শ্বচারিণী ছিল সপ্ত বা অষ্ট মাতৃকা-ছাড়া কোটি-কোটি যোগিনী। আমরা মাননীয়া বিদ্যা দেহেজিয়া-লিখিত *Yogini : Cult and Temples,—A Tāntric Tradition* (New Delhi, 1916)-গ্রন্থ থেকে এ'সম্বন্ধে উদ্ধৃত ক'রে বলি—

"The prime example of the Yoginis being connected with the eight Mātrkās in the *Agni-Purāṇa* text which we have considered briefly in the first chapter. It derives the Yoginis in groups from Brahmāni, Māhesvari, Kaumāri, Vaisnavi, Vārāhi, Aindri, Cāmundā and Mahālaksmi, and states that they either belong to the same family (*kula*) as the Mātrkā, or that they were born (*sambhava*) from her (Devi). However, the *Agni-Purāṇa* list of the 64 Yoginis does not actually include the names of the Mātrkās among its sixty-four names, while the lists considered here regard the Mothers as Yoginis. A second series of Mātrkās, visualised as sixteen (?) in number, is a less prevalent though known concept. The names of these Mothers are entirely different from those of the better known Mātrkās of the Brahmi series : they comprise Gauri, Padmā, Saci, Medhā, Sāvitri, Vijayā, Jayā, Devasenā, Svadhā, Svāhā, Lokamātā, Sānti, Puṣti, Dhrtiti,Tuṣti and Kuladevatā. We find that Yoginislisted that include the familiar Mātrkās occasionally incorporate also seven or eight from this lesser-known series of sixteen. .

We shall see that the Mātrkā-inclusive tradition assigns to the Yoginis an elevated status, considering them either as varying aspects of the Divine Female or as highly placed acolytes of the Goddess. The names of the Yoginis are

often those given to the Great Goddess herself, and important aspects of the Goddess such as the Navadurgās are occasionally included. This tradition incorporates names of emanations of the Goddess as in the cases of the Mātrkās themselves and of acolytes of a lesser status like the *dikpālikās*. Mātrkā inclusive inscribed images do not correspond with textual lists and it appears that there were several regional and independent traditions of such Yogini groupings. The texts cannot, therefore, be of significant help in the identification of uninscribed Yogini images.

Durgā is perhaps the most important single aspect of Devi, and Durgā herself is worshipped in nine varying forms as the Navadurgās. There are two textual versions of the Nine Durgās and both sets form part of the list of 64 Yoginis contained in the *Kālikā-Purāṇa*. One set of nine names is indicative of the more destructive aspect of Durgā's nature and each name contains the word *candā* meaning fierce or wrathful. The texts list Ugrachandā, Pracandā, Candogrā, Candanayikā, Candā, Candavati, Candarupā, Aticandikā and Rudracandi. The *Kālikā* list of 64 Yoginis contains six of these nine titles. The more popular version of the Navadurgas reads like a chronological listing of the major events in the life of Pārvati. She is Sailaputri (Daughter of the mountains), Brahmacārini (Unmarried one, referring to her performance of penance to obtain Śiva as husband), Candraghantā, Kusmāndā, Skandamātā (Mother of Skanda), Kātyayani, (descriptive of the form in which she killed the buffalo-demon), Kālarātri, Mahāgauri and Siddhidātri (Giver of perfection). In the *Kālikā* Yoginis include seven of these nine forms, with only Brahmachārini and Siddhidātri being omitted.

Several other names belonging to the Goddess Supreme are also part of the *Kālikā* list. For instance Candikā, included here as a Yogini, is the principal name given to Devi in the *Devimāhātmya*. Among the Yoginis are also Kālikā, Kauśiki, Ambikā Śākambhari, Bhimā and Bhramari; these are names with which Candikā identifies herself in that famous poem. The *Kālikā* list of 64 Yoginis includes a number of Mātrkās. Nine Mothers of the familiar Brāhmi series and seven from the alternate concept of sixteen, results in a total of 16 Mothers. The *Kālikā-Purāṇa* clearly reflects a tradition in which the Yoginis were not so much attendants of the Goddess as 64 varying aspects of Devi herself. The chapter that contains this list tells us that the 64 Yoginis are to be worshipped individually (*Yoginistucatuṣaṣṭipujayetpṛthak pṛthak*), this statement reinforcing their elevated status."

তাছাড়া আগম বা তন্ত্রশাস্ত্রে অন্যান্য মাতৃকা ও যোগিনীদের উল্লেখপ্রসঙ্গে মাননীয়া দেহেজিয়া বলেছেন—

'*Other Yogini listings excluding Mātrkās* :

There exists a few other lists of Yoginis that do not belong to either Grpup A or B and also exclude the Mātrkās. One such example is the Kāśi-Khanda list of the *Skanda-Purāṇa* in which the Yoginis either have bird and animal heads, or alternatively, are fierce in character. Their names are clearly descriptive and include, to name just a few, Mārjāri (cat), Kraunchi (heron), Kapotikā (dove), Ulukikā (owl), Suki (parrot), Syeni (hawk), Kākatundica (crow-beaked), Simhamukhi (Lion-faced) Mṛgaśirsa (deer-headed), Svadamstrā (canine-toothed) and Vikatānanā (fearsome faced). A second list of Yoginis excluding Mātrkās is found in the *Devi Bhāgavata-Purāṇa* and in a manuscript in the

Barodā collection, the *Sāradātilaka-Tantra*. However, unlike Groups A and B, these names are generally indicative of divinity and include some of the Yoginis of the famous Śri Cakra such as Anangamadana, Anangamekhalā and Anangakusuma. While the various configurations of the Sri Cakra are presided over by 'Yoginis', these Śri Cakra-Yoginis, as we have seen, are conceptually different from the Yoginis of the Yogini temples and they stand distinctly apart. Their inclusion here suggests that the *Sāradātilaka* list is a late compilation which collected and amalgamated names from varying traditions." (Vide *Yogini,---Cult and Temples* (1986, pp 187—188 and 204):

চৌষট্টি (৬৪) ছাড়া একাশী (৮১) যোগিনী ও মাতৃকাদের মন্দিরও ভেড়াঘাট-ব্যতীত ভারতের অপরাপর স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে,—তান্ত্রিক-আচারে যেখানে যোগিনী ও মাতৃকাদের অর্চনার ও উপাসনার প্রচলন ছিল এবং এখনও আছে।

তাছাড়া সমগ্র ভারতের বিভিন্ন দেশে শক্তিপীঠগুলিতে মহাশক্তি কালিকা ও অন্যান্য তান্ত্রিক দেবী তান্ত্রিক-আচার-অনুসারে এখনও পূজিতা হ'য়ে থাকেন। 'বৃহৎ-তন্ত্রসার'-গ্রন্থে 'পীঠনির্ণয়' বা 'মহাপীঠনিরূপণ'-প্রসঙ্গে প্রধানত চারটি পীঠস্থানের উল্লেখ পাওয়া-যায়,—(১) জালন্ধর, (২) উড্ডীয়ান, (৩) পূর্ণগিরি ও (৪) কামরূপ। কালিকাপুরাণে পীঠস্থানগুলির নাম একটু ভিন্ন, যেমন ওড্র জালশৈল, পূর্ণশৈল ও কামরূপ বা কামাখ্যা। নামগুলি ভিন্ন হলেও স্থানগুলি মনে হয় একই রকমের, —যেমন (১) ওড্র উড্ডীয়ানেরই নামান্তর, -যেখানে দেবী কাত্যায়নী ও মহাদেব শিব পূজিত। (২) জালশৈল জালন্ধরেরই নামান্তর —যেখানে দেবী চণ্ডিকা বা চণ্ডী ও দেবতা মহাদেব শিব পূজিত। (৩) পূর্ণ বা পূর্ণগিরির নামান্তর পূর্ণশৈল,—যেখানে দেবী পূর্ণেশ্বরী ও দেবতা মহানাথ-শিব পূজিত। (৪) কামরূপে বা কামাখ্যায় (আসাম) দেবী কামেশ্বরী ও দেবতা কামেশ্বর-শিব পূজিত। কামাখ্যার পরিবর্তে 'শ্রীহট্ট' নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তন্ত্রস্থান শক্তিপীঠ বা দেবীপীঠরূপে চট্টল বা চট্টগ্রামের নামেরও উল্লেখ আছে। সাধক সর্বানন্দ চট্টলে (চট্টগ্রামে) তন্ত্রসাধনা ক'রে সিদ্ধ হয়েছিলেন।

তবে শক্তিপীঠের নির্ণয়ব্যাপারে তন্ত্রচূড়ামণি, মন্ত্রচূড়ামণি, চন্দ্রচূড়ামণি, ভাবচূড়ামণি

ও পীঠমালা প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থে একান্নটি (৫১) শক্তিমহাপীঠেরই উল্লেখ আছে। তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার'-গ্রন্থে একান্নটি শক্তিপীঠের প্রমাণ পাওয়া যায়। পৌরাণিক কাহিনী যে, প্রজাপতি দক্ষরাজ হিমালয়-দুহিতা উমার বা সতীর জামাতা ভূতনাথ-শিবকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ না করায় দেবী দেহত্যাগ করেন এবং গণনায়ক মহাদেব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করলে সমগ্র বিশ্ব প্রকম্পিত ও রসাতলে যায় দেখে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ তাঁর সুদর্শনচক্রের সাহায্যে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করলে এক একটি সতীদেহখণ্ড ভারতের যে যে স্থানে পতিত হয় সেই সকল স্থানই পবিত্র শক্তিপীঠ নামে পরিচিত হয়। পৌরাণিকী-কাহিনী যেমনই হোক, প্রাচীন ভারতের সর্বত্র মহাশক্তি মহামায়ার উপাসনা ও সাধনস্থল বা সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বৈদিক উপাসনা ও সাধনার পাশাপাশি তান্ত্রিক উপাসনা ও সাধনার ক্ষেত্র ও পীঠস্থানরূপে। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে, দেবীপুরাণে ও দেবীভাগবতে এবং তাছাড়া এই সকলের পূর্বে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ণ তাঁর মহাভারতের বনপর্বে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অন্তত তিনটি শক্তিক্ষেত্র তথা শক্তিপীঠের নামোল্লেখ করেছেন। গুপ্তযুগে গুপ্তরাজাদের আমলে শক্তিপীঠের প্রসারণ এবং ঐ সকল পীঠে বা ক্ষেত্রে মহাদেবীদের সঙ্গে সঙ্গে দেবীসহচরী অসংখ্য মাতৃকা ও যোগিনীদের পূজার প্রচলন হয়েছিল।

মাননীয় কারমেল বার্কসন তাঁর তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ: *The Caves at Aurangabād: Early Buddhist Tāntric Art in India* (New York, 1986)-গ্রন্থে বলেছেন মহারাষ্ট্রের Western Ghat-এর অন্তর্গত পর্বত-মালায় অবস্থিত ৭০০ ফিট উচ্চ আওরঙ্গবাদ-পর্বতগুহায় বৌদ্ধ-মহাযানধর্মের অন্তর্গত তন্ত্রযান ও বজ্রযান ধর্মপ্রভাবিত বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে সঙ্গে বোধিসত্ত্ব হারিতী প্রভৃতি তান্ত্রিক দেব-দেবীদের মূর্তির আবিষ্কার থেকে বোঝা যায় যে, ৭ম-৮ম খ্রীষ্টাব্দ থেকে বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রাচারের অনুশীলন বৌদ্ধধর্মসাধনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ডাক্তার সঙ্কালিয়া, ঐতিহাসিক রাধাকৃষ্ণ চৌধুরী, যোগেশ্বর মিশ্র প্রভৃতি মনীষীরা বলেছেন যে, বিক্রমশীলা, নালন্দা, ওদন্তপুর প্রভৃতি সুবিশাল বৌদ্ধ-মহাবিদ্যালয়ে বৌদ্ধতন্ত্র শিক্ষা দেওয়া হ'ত এবং সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রসাধনার যথেষ্ট অনুশীলন ও প্রচার ছিল। ঐতিহাসিক লামা-তারানাথ তাঁর *History of Buddhism in India*-গ্রন্থে নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি মহাবিদ্যালয়ে তন্ত্রের অনুশীলনের কথা উল্লেখ করেছেন। ডাক্তার সঙ্কালিয়া (H. D. Sanklia) তাঁর বিখ্যাত *The University of Nālandā* (1934)-গ্রন্থে লিখেছেন—

"From references in Tibetan work in Nālandā as a great Centre of Tāntric studies, or to a person as professor of Tantra at NālanJā and also from a number of books evidently Tāntric, ascribed to the pandits of Nālandā in the Chinese, it would appear that Tantra was, perhaps, a very popular subject with the studies as well as professors in the Nālandā Univetsiry."

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় *Two Vajrayāna Works*-গ্রন্থে (G.O.S. No XLIV, Introduction, p. 3) বলেছেন : বজ্রযান-তন্ত্রসাধনায় মুদ্রা, মন্ত্র, মণ্ডল, ধারণা, যোগ ও যোগোক্ত-সমাধি প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানপাদ, কমলশীল, রাহুলভদ্র, অভয়ঙ্করগুপ্ত, অতীশ-দীপঙ্কর প্রভৃতি বৌদ্ধ-অধ্যাপকরা নিযুক্ত ছিলেন। পণ্ডিত রত্নরক্ষিত ছিলেন প্রখ্যাত একজন তন্ত্রের অধ্যাপক। তন্ত্রযান থেকে যখন বজ্রযান সাধনার প্রবর্তন হ'ল তখন বৌদ্ধ-শ্রমণদের মধ্যে তন্ত্রের ব্যবহারিক-সাধনাও বিশেষভাবে প্রচলিত হয় এবং কালচক্রযান ও বজ্রযানের সংমিশ্রণে সহজযানধর্মসাধনার প্রবর্তন হয়। সাধনার দেবতারূপে হেরুকা, বজ্রতারা, বজ্রযোগিনী, বজ্রচণ্ডিকার উপাসনা বৌদ্ধ-শ্রমণদের মধ্যে বিশেষভাবে সমাদর লাভ করে। ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের আমন্ত্রণে পণ্ডিত কমলশীল এবং পরে অতীশ-দীপঙ্কর, জিনমিত্র, শীলেন্দ্রবোধি সুরেন্দ্রবোধি, প্রজ্ঞাবর্মন প্রভৃতি বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের সঙ্গে নিয়ে তীব্বতে বৌদ্ধধর্ম ও বিশেষ ক'রে তন্ত্রধর্ম প্রচারের জন্য গমন করেন। সুতরাং ভারতের তন্ত্র শুধু তিব্বতেই নয়, মঙ্গোলিয়া, চীন ও যাভার অন্যান্য দেশেও প্রচারিত হয়। অবশ্য বিস্তৃত ও ঘটনাবহুল এই ইতিহাস। এই ইতিহাস থেকেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, তন্ত্রসাহিত্য, তন্ত্রদর্শন ও তন্ত্রসাধনার জন্মভূমি সুজলা-সুফলা-ভারতবর্ষই এবং ভারতবর্ষই তার তন্ত্রসাধনার ও তন্ত্রসাহিত্যের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের বহু বিষয় ভারতেতর দেশে বিতরণ করেছিল এবং সখ্যসূত্রে সকল দেশের ও জাতির সঙ্গে আবদ্ধ হয়েছিল। ভারতের এই অবিস্মরণীয় দানের কথা বিশ্বের সকল সুসভ্য দেশ ও জাতিই অবশ্য স্বীকার করে। তাছাড়া ভারতে বৌদ্ধধর্মে তন্ত্র ও তন্ত্রাচার কোন্ সময় থেকে প্রবেশ করে সেই সম্বন্ধে লামা তারানাথ তাঁর *The History of Buddhism in India*-গ্রন্থে বলেছেন যে, তন্ত্রধর্ম ও তন্ত্রসাধনা বহু পূর্ব থেকেই বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যদের সমাজে প্রচলিত ছিল।

অবশ্য আচার্য অসঙ্গ ও আচার্য ধর্মকীর্তির সময়ে বৌদ্ধতন্ত্রের সাধনপ্রণালী বিশেষভাবে গোপন করা হয়েছিল। তাছাড়া সরহপাদ, নাগার্জুন, লুইপাদ, পদ্মবজ্র, অনঙ্গবজ্র ও পরিশেষে রাজা ইন্দ্রভূতি তন্ত্রাচার ও তন্ত্রসাধনাকে প্রকাশ্যে সর্বসাধারণ্যে প্রচার করেন। তাছাড়া পদ্মবজ্র-লিখিত 'গুহ্যসিদ্ধি'-গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' বজ্রযানসম্প্রদায়ের বৌদ্ধতন্ত্রসাধনার একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। রাজা ইন্দ্রভূতি তাঁর 'জ্ঞানসিদ্ধি'-গ্রন্থে গুহ্যসমাজের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন। কথিত আছে, বৌদ্ধতন্ত্রবাদকে সাধকসমাজে সুপরিচিত করার জন্য সর্বতথাগত-কায়বাক্‌চিত্ত নামীয় সিদ্ধেরা গুহ্যসমাজতন্ত্রের মতবাদ ও সাধনপ্রণালী এক আহুত বৌদ্ধ-অধিবেশনে উপস্থাপন ও প্রচার করেছিলেন বিশেষভাবে।

এ'প্রসঙ্গে বহু মনীষীর অভিমত যে, ভগবান তথাগত-বুদ্ধের জীবদ্দশায়ই বৌদ্ধতন্ত্রের মূলসূত্রগুলি বর্তমান ছিল, কিন্তু তাঁর অধিকাংশ শিষ্যেরা সে'গুলি গ্রহণ করেন নি নানা কারণে, বরং অনেকেই বিরুদ্ধাচরণও করেছিলেন এবং সেজন্য দ্বিতীয় বৌদ্ধ-অধিবেশনে (Second Buddhist Councilএ) স্থবিরগণ মহাসাঙ্ঘিকদের অনেককে ধর্মসংঘ থেকে বিতাড়িতও করেছিলেন। আবার অনেক বৌদ্ধস্থবিরও ঐ সকল তন্ত্রাচারের মূলসূত্রের উপর বিশ্বাসী ছিলেন ও তাঁরা ঐ সকল তন্ত্রাচারকে নিয়ে গোপনে সাধনও করতেন। বৌদ্ধতন্ত্রের আদিম-মূলসূত্রগুলি সংগীতির আকারে লিপিবদ্ধ ও রক্ষিত ছিল। অনেকের অভিমতে, স্বয়ং বুদ্ধদেবই নাকি ঐ সকল সংগীতিতে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান স্থবিরদের সমাজে প্রচারও করেছিলেন। যদিও 'মূলকল্প'-গ্রন্থে ঐ সকল সংগীতির উল্লেখ নেই, কিন্তু পরবর্তী গুহ্যসমাজতন্ত্রে সংগীতিগুলির স্পষ্ট-উল্লেখ আছে। বৌদ্ধতন্ত্র-ধর্মের পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ ও তাঁদের মন্ত্র, মুদ্রা, ধারণী প্রভৃতির উদ্ভব পরে হয়েছিল। গুহ্যসমাজতন্ত্রে এ'গুলির বিবরণ বিশেষভাবে পাওয়া যায়। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন : "Moreover, the Mantras and Mudrās, which were later on systematised in the Vajrayāna books, are found scattered in the body of the text of the *Mulakalpa* in a disorganised manner. The Mantras of some of the Dhyāni-Buddhas themselves are found in the *Mulakalpa*, though not exactly with the same meaning or form, in which they are met with in the *Guhyasamaja*."[১] মোটকথা যে, 'মূলকল্প' মন্ত্রযান-

১। Vide *Sadhanamala*, Introduction. p. XXXV.

ধর্মমতের গ্রন্থ, সুতরাং গুহ্যসমাজতন্ত্রে উল্লিখিত বজ্রযান-মতবাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক না থাকারই কথা। তাই সকল দিক থেকে এ'সম্বন্ধে বিচার ও পর্যালোচনা করলে একথাই অনুমান করা একেবারে অসঙ্গত হয় না যে, ভগবান তথাগত-বুদ্ধ নিজেই আচার ও আসাধনার প্রবক্তা ছিলেন,—যদিও প্রকাশ্যে তিনি এ আচার ও সাধনা তাঁর শিষ্যসমাজে শিক্ষা দিয়ে যান নি। আর এটাই নাকি মন্ত্রযান-মতবাদের গূঢ়রহস্য এবং আচার্য আন্তরক্ষিত বা শান্তরক্ষিত ও আচার্য কমলশীলেরও অভিমত। তাঁরা একথাও বলেছেন যে, তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল, ধারণী প্রভৃতির প্রচারও বুদ্ধদেব নিজে গোপনে নির্দিষ্ট করেছিলেন তাঁদের জন্য,—যাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিবর্তে জাগতিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করতেন,—"were delivered by Buddha himself for the benefit of such of his followers who cared more for the material prosperity than for spiritual."[১০]

শক্তিসাধনার পীঠস্থান বা কেন্দ্রগুলি-সম্বন্ধে ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধ-'সাধনমালা'-গ্রন্থের অবতরণিকায় (Introduction) এ-সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে বলেছেন : "In the *Sād'hanamālā*, we find mention of four Pithas or sacred spots of the Vajrayānists, namely, Kāmākhyā, Srihaṭṭ, Purṇagiri, and Uddiyāna."[১১] অবশ্য বিভিন্ন পুরাণে ও তন্ত্রে এই চারটি শক্তিপীঠকে হিন্দুপীঠ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ডক্টর ভট্টাচার্য মহাশয় ঐ চারটিকে বজ্রযানী-বৌদ্ধদের শক্তিপীঠ বলেই উল্লেখ করেছেন।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের পরিচালনাধীনে ডক্টর কল্যাণী মল্লিক তাঁর 'নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী' (১৯৫০) এই ডক্টরেট-থিসিসে উল্লেখ করেছেন : "তিব্বতীয়-ঐতিহাসিক লামা-তারানাথের মতে, পালনৃপতিদের রাজত্বকালে বহু বজ্রাচার্যদের প্রাদুর্ভাব হয়। তাঁহারা সিদ্ধিবলে নানা অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন। এই সময়ে রচিত বহু তান্ত্রিক-গ্রন্থও তৎকালীন প্রভাবের সাক্ষী হয়।

বৌদ্ধধর্মের সাধন ও তত্ত্বগুলি কিরূপে ক্রমশঃ (হিন্দু)-তন্ত্রে প্রবেশলাভ ঘটে তার বিবরণ ওয়াডেল সাহেবের রচিত গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় : তিনি বলেছেন যে, "ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মে শক্তিপূজা বিশেষভাবে প্রতিপত্তি লাভ করে। শক্তি

১০। *Ibid.* p. XXXVI.

১১। সাধনমালা, ৪৫৩, ৫০০ পৃষ্ঠায় পীঠগুলির উল্লেখ আছে।

পূজার সহায়ে সিদ্ধিলাভ উদ্দেশ্য ছিল। হিউয়েন সাং ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে বোধিসত্ত্বদের মূর্তিসহ শক্তিমূর্তি দেখেন। 'তিব্বতে আনুমানিক ৬৪০ খ্রীস্টাব্দ হইতে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ অধোগতির পথে প্রবেশ করে। নাগার্জ্জুন 'মন্ত্র'-সহায়ে তন্ত্রে সিদ্ধিলাভের প্রচার করেন, এবং এই পন্থাই 'মন্ত্রযান' নামে পরিচিত। * * দশম শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে কাশ্মীর ও নেপালে 'কালচক্রযান' নামক তান্ত্রিকতার প্রচার হয়। ইহাদের উপাস্য দেবতা ও দেবী হেবজ্র ও কালী। ইহারা মন্ত্রযানের পূজাপদ্ধতি গ্রহণ করিলেও নিজেদের 'বজ্রযান'-সম্প্রদায় বলিত এবং সিদ্ধদের নাম ছিল বজ্রাচার্য। বজ্রযান হইতে নানাধর্মের উৎপত্তি; ইহাতে ভূতপিশাচাদির পূজা আছে"।

"বঙ্গদেশে দ্বাদশ শতাব্দী-পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। বেণ্ডল সাহেব ১৪৪৬ খ্রীস্টাব্দ-পর্যন্ত রচিত বৌদ্ধপুঁথি বঙ্গদেশে পাঠাইয়াছেন। সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে তিব্বতে চীনদেশের 'তাও ধর্মের' অনুরূপ 'বন' (Bon) ধর্মের প্রাধান্য ছিল। * * * অষ্টম শতাব্দীতে ভারত হইতে গুরু পদ্মসম্ভব আমন্ত্রিত হইয়া তিব্বতে যান ও (তিব্বতে) লামাধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। পদ্মসম্ভব তান্ত্রিক যোগাচার্য ছিলেন। তিনি যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, জগদ্দল, সোমপুরী ও পাণ্ডুভূমির মহাবিহারসমূহ বৌদ্ধধর্ম, তন্ত্র ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল" সেকথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

ডক্টর কল্যাণী মল্লিক 'নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী' গ্রন্থে (১৯৫০) পুনরায় উল্লেখ করেছেন: "মৈত্রেয়ের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া অসঙ্গ খ্রীষ্টীয় তিন শতাব্দীতে 'মহাযান'-বৌদ্ধধর্ম মধ্যে তন্ত্রের প্রচলন করেন। অসঙ্গের সময় হইতে মহাযানী-বৌদ্ধরা নির্বান বা নির্বাণের জন্য কামনা না করিয়া বোধিসত্ত্ব-রূপে পুনর্জন্মলাভের কামনা করেন। তন্ত্রপূর্বযুগে ভারতে যাহা-কিছু সুন্দর ও উচ্চ-আদর্শ বিশিষ্ট ছিল তন্ত্রশাস্ত্রে তাহা গৃহীত হইয়াছে" (পৃঃ ১৫১-৫২)।

বৌদ্ধধর্মে মহাযানতন্ত্রধর্ম ক্রমে আঠারোটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। গৌড়বঙ্গদেশে তথা বাংলাদেশে হিন্দুতন্ত্রধম ও বৌদ্ধতন্ত্রধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম মিশ্রিত হ'য়ে সহজ-যান-তন্ত্রধর্মের সৃষ্টি হয়। তান্ত্রিক-সহজযানধর্ম থেকে বাঙলাদেশে ক্রমশ বাউল, কর্তাভজা প্রভৃতি ধর্মের সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণাচার্যপাদের দোঁহাকোষ, অকুলবীরতন্ত্র, কৌলজ্ঞাননির্ণয়, চর্যাপদের বিভিন্ন দোঁহায় তন্ত্রনিষ্ণাত সহজসাধনার তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া যায়। কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে পীঠ, উপপীঠ, ক্ষেত্র, ডাকিনী ও যোগিনীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, খ্রীষ্টীয় যুগের প্রথমপাদে গুপ্ত-

রাজাদের সময়ে তান্ত্রিকসাধনায় মাতৃকা, যোগিনী, ডাকিনী, প্রভৃতিদের সাধনার উল্লেখ আছে এবং ঐ গুপ্তযুগে রচিত সপ্তশতীচণ্ডীতেই তান্ত্রিক দেবী বা মহাদেবীদের গণ, অনুচর ও সঙ্গিনীরা বিভিন্ন মাতৃকা ও চৌষট্টী যোগিনী-ছাড়া শ্রীশ্রীচণ্ডীতে কোটীযোগিনীপরিবৃত মহাশক্তিময়ী দেবীদের তন্ত্রমতে আরাধনার কথার উল্লেখ আছে। কুলার্ণবতন্ত্রে বীর বা কৌলাচারের উল্লেখ আছে। বীরাচারই বামাচাররূপে পরিচিত। বাঙলাদেশে প্রচলিত পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকারে তন্ত্রসাধনের সমাদর ছিল এক সময়ে। বীরাচার বা বামাচার প্রভৃতির সাধনা আসাম-গৌহাটী-অঞ্চলে কামাখ্যাদেবীর বীরাচারে পূজা-উপাসনার পদ্ধতি থেকেই সৃষ্টি হয় ব'লে অনেকের ধারণা,—যদিও এ'সম্বন্ধে মতভেদ আছে। গৌড়বঙ্গদেশে তথা বাঙলাদেশে ও আসাম বা কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলে ও বিশেষভাবে আসামে দেবী কামাখ্যার উপাসনায় বামাচার বা বীরাচারমতে পূজার প্রচলন ছিল। মাননীয় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এর উল্লেখ ক'রে লিখেছেন—

(১) "The age-old controversy about the admissibility of wine in worship against clear Vedic prohibition created in Bengal as elsewhere a sharp division of the Tāntrik worshippers into two rival schools popularly known as পশ্বাচার and কুলাচার। But the latter system prevailed throughout the province of Bengal in such a surprisingly large scale as is quite incompatible with the almost impossible conditions imposed on it. The author of the *Tantrasāra*, by far the most popular treatise in Bengal, though a follower of the পশ্বাচার, included at the end of his comprehensive work short sections on the দূতীযাগ and কুলাচার। He is responsible, however, for the view that the offering of wine is worship, warranted by a large number of texts, is prescribed only for the Sudras, and is prohibited for the Brāhmaṇas who are competent to use only substitutes. Raghunātha Tarkavagīśa, author of the আগমতত্ত্ববিলাস (1687 A. D.), is also of the same opinion, which was undoubtedly inspired by the writings of Raghunandana which dominated West Bengal. The stronghold of কুলাচার on

the other hand was Kāmākhyā, the premier Śākta shrine in India, and the eastern tracts adjacent to it. Both Sarvānanda and Purṇānanda, the two most celebrated *Vīras* of Bengal hail from East Bengal and both according to tradition drew their inspiration from Kāmākhyā. We shall cite here an interesting passage from an 18th century writer, কেশব-ন্যায়ভূষণ (author of the কালিকাধনচন্দ্রিকা), which besides giving a historical explanation of the enormous propagation of the কুলাচার, proves that it held its sway in other parts of Bengal including Gauḍa and Rāḍha, inspite of the great influence of Raghunandana and Kṛṣṇānanda :

'এবমুক্তপ্রবন্ধেন বামাচারে শূদ্রস্যাধিকার ইতি স্থিতম্। ইদানীং গৌড়দক্ষিণ-রাঢ়েষু অন্যেষ্বপি চ দেশেষু বহুবশ্চাতুর্বনিকাঃ কুলাচারেণেষ্টদেবতামারাধয়ন্তি ॥"

—(দীক্ষণচন্দ্রিকা, fol. 103b)।

(২) "A notorious passage, supposed to be cited from the যোগিনী তন্ত্র or the যোগিনীহৃদয়, in the *Tantrasāra* gives a list of certain places where Tantrik initiation is directly prohibited and these include চট্টল and an unknown place called মতঙ্গ। We venture to hazard a conjecture that মতঙ্গ mentioned along with চট্টল i.e. Chittāgong is identical with the place of Sarvānanda's *Siddhi*, which originally bore the memories of a forgotten মতঙ্গমুনি and Kṛṣṇānanda only proved his animus against a rival cult by declaring it an excluded area. This, however, launches us into the vexed problem of Sarvānanda's date which is discussed below in detail."

'কৌলমার্গরহস্য'-গ্রন্থকার সর্বানন্দের বংশধর সাধক ও পণ্ডিত সতীশচন্দ্র অভিমতে তন্ত্রে কুলধর্মানুসারে দেবী কালিকার উপাসকগণ কুলাচারমতে সাধনা করেন এবং কুলাচারমতে সাধনার প্রচলন দক্ষিণ-ভারতেও শ্রীবিদ্যার উপাসনায় পূজায় ব্যবহৃত হয়। বাঙলাদেশে, কামরূপে তথা গৌহাটী ও আসামে বীরাচার বা বামাচার[১২]

১২। বামমার্গ সাধনা তন্ত্রে বামাচার নামে বিখ্যাত। বামাচারে পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার ব্যবহৃত হয়।

অনুসারেও পূজার প্রচলন দেখা যায়। আমরা পরে যখন তন্ত্রে আচার প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করবো তখন এ'সম্বন্ধে পুনরায় কিছু উল্লেখ করার চেষ্টা করবো।

সমগ্র বাঙলাদেশে বস্তুতে বৃহৎবঙ্গে তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ-আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার'-অনুসারে তন্ত্রসাধনারই প্রচলন অধিক ছিল। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে তন্ত্রাচার্য রঘুনাথ তর্কবাগীশের আবির্ভাবেও তাঁর প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ 'আগমতত্ত্ববিলাস' এবং সঙ্গে সঙ্গে স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য-লিখিত স্মৃতিগ্রন্থের বিধি-ব্যবস্থা ও নিয়মাবলী বাঙলা-দেশের তন্ত্রসাহিত্যে ও তন্ত্রসাধনায় কিছু নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য কাশ্মীরে শৈবতন্ত্রে ও শক্তিসাধনায় এবং দক্ষিণ-ভারতে শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরসুন্দরীর বা ষোড়শীর উপাসনাপদ্ধতিতে তান্ত্রিকাচার ও তান্ত্রিক-অনুষ্ঠানপদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন। কাশ্মীরীয় কুল, প্রত্যভিজ্ঞা ও ত্রিক-পদ্ধতি শিবকেন্দ্রিক ও ক্রমপদ্ধতি শক্তিকেন্দ্রিক। অনেকের অভিমতে, ক্রমপদ্ধতি কামরূপের দেবী কামাখ্যার পূজাপদ্ধতি ও আচারের দ্বারা প্রভাবিত। তাছাড়া কাশ্মীরীয় কুল, প্রত্যভিজ্ঞা ও ত্রিকপদ্ধতি অপার্থিব বিশ্বোত্তীর্ণভাবযুক্ত ও ক্রমপদ্ধতি পার্থিব ভোগসুখযুক্ত। সেজন্য কাশ্মীরীয়-পদ্ধতি তথা তন্ত্রসাধনা দক্ষিণদেশে শ্রীবিদ্যার উপাসনাপদ্ধতির ত্যাগ ও ভোগকেন্দ্রিক,—'both transcendent and immanent,'—'ভোগমোক্ষসামরস্যক্রমঃ'। পরমহংস পূর্ণানন্দকৃত 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি'-গ্রন্থের পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে ২১—১৫৮ শ্লোকগুলিতে শ্রীবিদ্যা বা ললিতার কালী, করালী প্রভৃতি সহস্রনামের উল্লেখ আছে। অবশ্য পণ্ডিত ভাস্কর-রায়ের বিস্তৃত টীকাসহ 'ললিতাসহস্রনাম'-গ্রন্থ বর্তমানে ছাপার আকারে পাওয়া যায়। ঐ 'ললিতাসহস্রনাম'-গ্রন্থের-টীকায় ভাস্কর-রায় শ্রীবিদ্যা, ষোড়শী বা ললিতা বা ত্রিপুরসুন্দরী-তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অভিনবগুপ্তাদি-প্রচারিত প্রত্যভিজ্ঞা, বসুগুপ্তের আচারিক-ত্রিকপদ্ধতি, শিবানন্দ-প্রবর্তিত ক্রমপদ্ধতি ও মৎস্যেন্দ্র-প্রবর্তিত কুলপদ্ধতির ধারা ও সাধনাপদ্ধতি গৌড়-বঙ্গদেশের ও দক্ষিণ-দেশীয় শ্রীবিদ্যার সাধনপদ্ধতি থেকে বেশ-কিছু ভিন্ন ও অভিনব। বৃহদ্বঙ্গ তথা বাঙ্গালা, আসাম, বিহার ও কলিঙ্গ তথা উড়িষ্যার তান্ত্রিকীপদ্ধতি বিশেষভাবে আচার্য কৃষ্ণানন্দ-আগমবাগীশ-প্রচারিত 'তন্ত্রসার'-শাস্ত্রের নিয়মাধীন ও বিধি-নিষেধাত্মক। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে আচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যোগাযোগ ছিল, কিন্তু মহাপ্রভু বৈষ্ণবধর্মকেই প্রধানভাবে গ্রহণ করেছিলেন,—যদিও মহাপ্রভু নিত্যানন্দ তন্ত্রসাধনাকেও গ্রহণ করেছিলেন তাঁর অধ্যাত্মসাধনার অঙ্গরূপে। তবে রঘুনাথ তর্কবাগীশের আবির্ভাবে বাঙলার তন্ত্র-সাধনায় কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ তন্ত্রে সম্প্রদায়ভেদ ও বিভিন্ন তন্ত্রসাহিত্য ও দেবীসাধনা ॥

আম্নায়ভেদে তন্ত্র বিভিন্ন এবং বিভিন্ন তন্ত্রগুলির সাধনাও কিছু-কিছু ভিন্ন ছিল। শাস্ত্র তন্ত্রের ও সাধনপথের দিশারী.—'জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্'। তবে তন্ত্রে সাধনার ব্যবহারিক (practical) নির্দেশই প্রধান। তন্ত্রে যেমন শাম্ভবী, শাক্তী, মান্ত্রী প্রভৃতি দীক্ষার উপদেশ আছে, তেমনি আছে শাক্ত্যাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, রাজ্যাভিষেক, সাম্রাজ্যাভিষেক, মহাসাম্রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি স্তরভেদ ও ক্রমভেদে বিচিত্র সাধনার ধারা। ক্রিয়াসিদ্ধ ব্যবহারিক-সাধনা ও প্রত্যক্ষ-অনুভূতিই তন্ত্রের প্রতিপাদ্য ও লক্ষ্যের বিষয়। অবশ্য চরমলক্ষ্য সামরস্যানুভূতিই তন্ত্রের শেষকথা।

ডক্টর কল্যাণী মল্লিক তাঁর গ্রন্থে নাথগ্রন্থের উপর তন্ত্রের প্রভাব স্বীকার ক'রে বলেছেন: "তন্ত্র ও তাহার উপাসনাপদ্ধতি কেবল বাঙলার নহে। * * তন্ত্রের বিকৃত আচারই মুখ্য ও মূল আদর্শ নহে। ভারতের বিভিন্ন দেশে তন্ত্রের আলোচনার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাশ্মীরে অভিনবগুপ্ত, দাক্ষিণাত্যে ভাস্কর-রায়, লক্ষ্মণ-দেশিকের নাম উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মণদেশিকের 'সারদাতিলক' গ্রন্থের নির্দেশ অনুসারে তান্ত্রিককৃত্য সম্পাদিত হয় দক্ষিণ ভারতে ও সর্বত্র। বাঙলাদেশে কৃষ্ণানন্দের (কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের) 'তন্ত্রসার'-গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। উড়িষ্যায় পূর্ণানন্দের 'তত্ত্বানন্দতরঙ্গিনী', কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের 'শ্যামাসপর্য্যাবিধি' সুবিদিত। পূর্ণানন্দের 'পুরশ্চর্যার্ণব' নামক বৃহৎগ্রন্থ অদ্যাপিও বর্তমান। গয়া, পাঞ্জাব, কাশ্মীর; নেপাল, বোম্বাই প্রভৃতি বাংলার বাহিরে বহু স্থানে শক্তি-মন্দির আছে।"[১] অবশ্য এই বিবরণ সংক্ষিপ্ত।

শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ তন্ত্রে সম্প্রদায়ভেদ ও বিভিন্ন তন্ত্রসাহিত্য-সম্বন্ধে 'কৌলমার্গরহস্য'-গ্রন্থে (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) বলেছেন: "বঙ্গদেশীয় নিবন্ধসমূহের অল্পই মুদ্রিত হইয়াছে......। জিজ্ঞাসুগণ পূর্ণানন্দ পরমহংসের 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি'

১। ডঃ কল্যাণী মল্লিক: 'নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী' (১৯৫০, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পৃঃ ১৫০।

শাক্তক্রম শ্যামারহস্য, তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী, ব্রহ্মানন্দ গিরির 'তারারহস্য', শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী' গৌড়ীয় শঙ্করাচার্যের 'তারারহস্যবৃত্তিকা' জগদানন্দ মিশ্রের 'কৌলিকার্চ্চন-দীপিকা', সর্বানন্দের 'সর্বোল্লাসতন্ত্র', শ্রীকৃষ্ণবিদ্যাবাগীশের 'তন্ত্ররত্ন', কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশের 'তন্ত্রসার' প্রভৃতি নিবন্ধ বা গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ। মিথিলাতেও বহু তান্ত্রিক নিবন্ধ (গ্রন্থ) রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নৃসিংহ ঠাকুরের 'তারাভক্তিসুধার্ণব' একখানি বৃহৎ ও উপাদেয় গ্রন্থ। নেপালের মহারাজ প্রতাপ শাহের 'পুরশ্চর্য্যার্ণব' বা 'পুরশ্চারণার্ণব' সুবৃহৎ গ্রন্থ।"

সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় পুনরায় উল্লেখ করেছেন : 'দাক্ষিণাত্যের শক্তিসম্প্রদায় প্রায় সকলেই শ্রীবিদ্যার উপাসক . ...। এইজন্য দাক্ষিণাত্যের গ্রন্থ ও নিবন্ধগুলি শ্রীবিদ্যার উপাসনার প্রতিপাদক। অবশ্য তাহাতে কৌলাচার বিহিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে কেরল-সম্প্রদায় এবং বঙ্গালার গৌড়ীয়সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচলিত সাম্প্রদায়িক ভেদও কিছু কিছু আছে। এই সম্প্রদায়িকভেদ এবং তদগত রহস্যও 'পুরচর্যার্ণব' গ্রন্থে পাওয়া যায়।'

॥ ভারতের বিভিন্ন তান্ত্রিক-সম্প্রদায় ॥

ভারতে তন্ত্রশাস্ত্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি শাস্ত্রগুলির নির্দেশিত সাধনপ্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন। তাছাড়া আম্নায়ভেদে ও আচারভেদে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গীতেও পার্থক্য আছে। ঐ বিভিন্ন দৃষ্টিসেবী তন্ত্রগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে বলি তান্ত্রিকসম্প্রদারেব কথা।

॥ তন্ত্রতত্ত্বসাধক ও তান্ত্রিক-সম্প্রদায় ॥

ভারতের তন্ত্রসাধকগণ প্রাধাণতঃ তিনটি সম্প্রদায়ে (Schools) বিভক্ত : বঙ্গদেশীয়-ক্রিয়াকেন্দ্রিক-সম্প্রদায়, কাশ্মীরীয়-প্রত্যভিজ্ঞাতত্ত্ব-নির্ণায়ক-সম্প্রদায় ও দক্ষিণ-ভারতীয়-শ্রীবিদ্যা-সম্প্রদায়। শ্রীবিদ্যাসম্প্রদায়ের গ্রন্থ 'পরশুরামকল্পসূত্রে' ত্রিপুরসুন্দরী শ্রীবিদ্যার বা ষোড়শীর উপাসনার বিবরণ আছে। সারদাতিলক, তন্ত্ররাজ-তন্ত্র, বরিবস্যারহস্য ও তার ভাষ্য, ললিতাসহস্রনাম প্রভৃতি শ্রীবিদ্যা বা ললিতার রহস্যকথা প্রকাশ করে। ললিতা, ত্রিপুরসুন্দরী ও শ্রীবিদ্যা এক ও অভিন্ন। পরশুরামকল্পসূত্রের তৃতীয় খণ্ডে শ্রীক্রমের বর্ণনায় একনায়িকা ললিতার বা শ্রীবিদ্যার উপাসনার কথা আছে। ঐ কল্পসূত্রে চতুর্থখণ্ডে আছে যে, ললিতাক্রম অর্থে ললিতাবিদ্যার বিশেষ-উপাসনা। পঞ্চমখণ্ডে শ্রীচক্রে বা শ্রীযন্ত্রে ললিতার (ষোড়শীর)

পূজা ও উপাসনার বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীচক্রে বা শ্রীযন্ত্রে বিন্দু, ত্রিকোণ, অষ্টকোণ, অন্তর্দশা, বহির্দশা, চতুর্দশা, অষ্টদলপদ্ম, ষোড়শদলপদ্ম ও ভূপুর এই ন'টি যন্ত্র, চক্র[২] ও তত্ত্বের সমাবেশ আছে। সাধক পূর্ণানন্দ-রচিত 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি' শ্রীতত্ত্বউপাসনারই নির্দেশক।

কামকলাবিলাস, স্বচ্ছন্দসংগ্রহ, তন্ত্ররাজ, যোগিণীহৃদয় প্রভৃতি তন্ত্রেও শ্রীচক্র ও তার সাধনার পরিচয় আছে। ললিতাসহস্রনাম, পরশুরামকল্পসূত্র, বরিবস্যারহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ ঐ সম্বন্ধে প্রামাণিক। এ'বিষয়ে টীকাকার রামেশ্বর বলেন যে, দেবী শ্রীবিদ্যা বা ললিতার সাক্ষাৎভাবে পূজা করতে যাঁরা অক্ষম, তাঁরা প্রথমে দীক্ষা—'দীয়তে শিবসাজুয্যং ক্ষীয়তে পাপবন্ধনম্' এবং পরে গণপতির পূজা-উপাসনা এবং বারাহীর ও পরার উপাসনা করেন এবং পরিশেষে শ্রীবিদ্যার বা ললিতার উপাসনা। এই উপাসনায় জীবনসিদ্ধিরূপ পরমজ্ঞান লাভ করেন সাধক। শ্রীবিদ্যা, ললিতা বা ত্রিপুরসুন্দরীর পূজার ও উপাসনার অধিকারী তাই যথার্থজ্ঞানসম্পন্ন সাধক।

তাছাড়া শুধু পরশুরামকল্পসূত্রে নয়, সকল সম্প্রদায়ের তন্ত্রশাস্ত্রমতে তন্ত্র বেদ-ভিত্তিক। বেদই সকল তন্ত্রের আধার ও অধিষ্ঠান। প্রকাশ ও বিমর্শ—শিব ও শক্তির ঐক্যজ্ঞান সকল তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অদ্বৈতবেদান্তে মায়া, অবিদ্যা বা অজ্ঞান যেমন প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন এবং অজ্ঞানের দূরীকরণে বা অপসারণে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিকারণ, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রমতে বিমর্শরূপ শক্তি ও প্রকাশরূপ ব্রহ্ম বা শিবের সমরসজ্ঞানই মুক্তির কারণ। তন্ত্রশাস্ত্রমতেও প্রকাশ ও বিমর্শ,—শিব ও শক্তি স্বরূপত এক ও অভিন্ন,—একই টাকার এ'পীঠ ও ও'পীঠ।

তন্ত্রে শিবের পাঁচটি মুখ কল্পনা করা হয়েছে। শিবের ঐ মুখের নামই আম্নায়। পূর্বাম্নায়, দক্ষিণাম্নায়, পশ্চিমাম্নায়, উত্তরাম্নায় ও ঊর্ধ্বাম্নায়, ঈশান, অঘোর প্রভৃতি আরও পাঁচটি নাম আছে। ষট্‌ত্রিংশৎ বা ৩৬টি তত্ত্বসম্বন্ধে আলোচনা তন্ত্রশাস্ত্রে আছে। পরশুরামকল্পসূত্রের চতুর্থ সূত্র—'ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বানি',—অর্থাৎ বিশ্বচরাচর ছত্রিশটি তত্ত্বের পরিণতি বা রূপ। শিবই এদের মধ্যে আদি বা প্রথম তত্ত্ব, (শিবতত্ত্ব)। পরে ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিরূপিণী নিত্যা শক্তি দ্বিতীয়তত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব। কল্পসূত্রকার বলেছেন: "তৎত্রিতয়কারণীভূতা সূক্ষ্মরূপা শান্তানাম্নী, তস্যা এব পরমশিবরূপায়া নিত্যত্বাৎ। তথা চ তাদৃশাসসৃক্ষারূপোপাধিবিশিষ্টঃ পরমশিব এব কেবল শিবপদবাচ্যো ভবতি। স এব তত্ত্বানাং মধ্যে আদিমঃ"।

২। চক্র বা যন্ত্র এককথা। যোগের চক্র এবং শ্রীচক্রের যন্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কল্পসূত্রকার পুনরায় বলেছেন : "সিসৃক্ষাপ্রপঞ্চবাসনারূপা শক্তিরিতি দ্বিতীয়তত্ত্বম্"। সদাশিবপদবাচ্যঃ তৃতীয়ং তত্ত্বম্"। "ঈশ্বরপদবাচ্যঃ তুরীয়ং (চতুর্থং) তত্ত্বম্"। পঞ্চমতত্ত্ব 'অহন্তা', অর্থাৎ অহন্তা ও ইদন্তার ঐক্যপ্রতিপাদনকারিণী বিদ্যা ষট্‌তত্ত্ব-মায়া। সপ্তমতত্ত্ব অবিদ্যা। অষ্টমতত্ত্ব কলা ('জীবনিষ্ঠং সর্বকর্তৃত্বং যৎকিঞ্চিৎ কর্তৃত্বেন সঙ্কুচিতম্'), নবমতত্ত্ব রাগ, দশমতত্ত্ব কাল, একাদশতত্ত্ব নিয়তি, দ্বাদশ-তত্ত্ব অবিদ্যাশ্রয় জীব। এভাবে ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বের প্রতিপাদন করেছেন পরশুরামকল্প-সূত্রকার ও টীকাকার রামেশ্বর। পরিশেষে বলেছেন—

'প্রপঞ্চবাসনারূপা শক্তিরিত্যভিধীয়তে।
নিষ্প্রপঞ্চশ্চিদেকাত্মা শিবতত্ত্বং সমীরিত ॥'—চিৎস্বরূপ আত্মাই শিবতত্ত্ব।

'কঞ্চুকং আচ্ছাদনং, তেন আবৃতং শিব এব জীবঃ'। অদ্বৈতবেদান্তের কথাও তাই যে, অজ্ঞান বা মায়াছায়া আবৃত ব্রহ্মই জীব। আসলে স্বরূপে জীবই কিন্তু শিব বা ব্রহ্ম।

তন্ত্রকার শুদ্ধ, অশুদ্ধ ও মিশ্র এই তিনরূপে জীবকে ভাগ ক'রে বলেছেন,—শিব, শক্তি ও সদাশিব এই তিন তত্ত্ব। তন্ত্রকারের মতে, নিজের বা পরমশিব-স্বরূপের প্রত্যভিজ্ঞানই পুরুষার্থ। কাশ্মীরীয় প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের কথাও তাই।

॥ তন্ত্রসকলের লক্ষ্য ॥

তবে বঙ্গদেশীয় (Bengal School) তন্ত্রশাস্ত্র, কাশ্মিরীয়-ত্রিকতান্ত্রিক-তন্ত্রশাস্ত্র এবং দাক্ষিণদেশীয় কেরলীয়-তন্ত্রশাস্ত্র সকলেরই সিদ্ধান্ত ও চরমলক্ষ্য প্রায় এক ও অভিন্ন। সকল শ্রেণীর তন্ত্রশাস্ত্রের চরমসিদ্ধান্ত সচ্চিদানন্দময় এবং সচ্চিদানন্দময়ী শিব ও শক্তির সামরস্যানুভূতি।

॥ শক্তিসাহিত্য তন্ত্রশাস্ত্র ॥

শক্তিসাহিত্য তন্ত্রশাস্ত্রের সংখ্যা অসংখ্য। শৈবাগম ও শাক্ত্যাগম অর্থাৎ আগম ও নিগমভেদে তন্ত্রশাস্ত্রগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আগম শিবমুখ নিঃসৃত এবং নিগম শক্তিমুখনিঃসৃত শাস্ত্র। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকে নবদ্বীপে পণ্ডিত আগমবাগীশ তন্ত্রসারগ্রন্থ রচনা করেন সকল তন্ত্রের সারসংকলন করে। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকে কিংবা ১৮শ শতকের প্রথমভাগে শ্রদ্ধেয় রঘুনাথ তর্কবাগীশ 'আগমতত্ত্ববিলাস'-গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় রঘুনাথ তর্কবাগীশ যে-সকল প্রামাণিক তন্ত্রশাস্ত্রের নামোল্লেখ করেছেন সে'গুলির নাম—স্বতন্ত্র, ফেৎকারিণী,

উত্তর, নীল, বীর, কুমারী, উজ্জ্বল, কালী, নারায়ণী, উত্তমতারিণী, বালা, সময়া, ভৈরব, ভৈরবী, ত্রিপুরা, বামকেশ্বর, কুক্কুটেশ্বর, মাতৃকা, সনৎকুমার, বিশুদ্ধেশ্বর, সম্মোহন, গৌতমীয়, বৃহদ্-গৌতমীয়, ভূত-ভৈরব, চামুণ্ডা, পিঙ্গলা, বারাঙ্গী বা বরাহী, মুণ্ডমালা, যোগিনী, মালিনীবিজয়, স্বচ্ছন্দভৈরব, মহাতন্ত্র, শক্তি, শ্রেষ্ঠ-চিন্তামণি, উন্মত্তভৈরব, ত্রৈলোক্যসার, বিশ্বসার, তন্ত্রামৃত, মহাফেৎকারী, বায়বীয়, তোড়ল, মালিনী, ললিতা, ত্রিশক্তি, রাজরাজেশ্বর, হংসপরমেশ্বর, কামধেনু, বর্ণবিলাস, মায়া, তন্ত্ররাজ, উত্তমকুব্জিকা, বিজ্ঞানলতিকা, লিঙ্গাগম, ঈশানসংহিতা, শ্রীবিনায়কসংহিতা, অগস্ত্যসংহিতা, পবিত্রনন্দিকেশ্বরসংহিতা, বশিষ্ঠসংহতা, দক্ষসংহিতা, মনুসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতা, দিব্যসনৎকুমারসংহিতা, কুলানন্দসংহিতা, বৈশম্পায়ণসংহিতা, নৃসিংহতাপনীয়, দক্ষিণামূর্তিসংহিতা, ব্রহ্মযামল, রুদ্রযামল, আদিযামল, বৃহদ্যামল, সিদ্ধযামল, কল্পসূত্র, মৎস্যসূত্র, কামরাজ, শিবাগম, উড্ডীশ, কুলোড্ডীশ, অড্ডীশ, বীরভদ্র, ভূতডামর, ডামর, যক্ষডামর কালিকাকুলসর্বস্ব, কুলচূড়ামণি, দিব্যকুলসার, কুলার্ণব, কুলামৃত, কুলাবলী, কালী, কুলপ্রকাশ, বশিষ্ঠ, সিদ্ধসারস্বত, যোগিনী, যোগিনীহৃদয়, মাতৃকার্ণব, যোগিনীজলকূরক, লক্ষ্মীকুলার্ণব, তারার্ণব, চন্দ্রাপীঠ, মেরু, চতুঃশতী, তত্ত্ববোধ, মহোগ্র, স্বচ্ছন্দসারসংগ্রহ, তারাপ্রদীপ, সঙ্কেতচন্দ্রোদয়, ষট্‌ত্রিংশৎ, লক্ষ্যানির্ণয়, ত্রিপুরার্ণব, বিষ্ণুধর্মোত্তর, মন্ত্রদর্পণ বৈষ্ণবামৃত, মানসোল্লাস, পূজাপ্রদীপ, ভক্তিমঞ্জরী, ভুবনেশ্বরী, পারিজাত, প্রয়োগসার, কামরত্ন, ক্রিয়াসার, আগতদীপিকা, ভাবচূড়ামণি, তন্ত্রচূড়ামণি, শ্রীক্রম, নবরত্নেশ্বর, সোমভুজগাবলী, সিদ্ধান্তশেখর: গণেশবিমর্শিনী, মন্ত্রমুক্তাবলী, তত্ত্বকৌমুদী, তন্ত্রকৌমুদী, মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ, শ্রীরামার্চনচন্দ্রিকা, শারদাতিলক, জ্ঞানার্ণব, সারসমুচ্চয়, কল্পদ্রুম, জ্ঞানমালা, পুরশ্চারণচন্দ্রিকা, আগমোত্তর, তত্ত্বসাগর, দেবপ্রকাশিনী, তন্ত্রার্ণব, ক্রমদীপিকা, তারারহস্য, শ্যামারহস্য, তন্ত্ররত্ন, তন্ত্রপ্রদীপ, তারাবিলাস, বিশ্বমাতৃকা, প্রপঞ্চসার তন্ত্রসার, রত্নাবলী প্রভৃতি ১৫৬।১৫৭ খানি তন্ত্রগ্রন্থ। তন্ত্রগুলি শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি ভেদে বিভক্ত। তাছাড়া বৌদ্ধতন্ত্রের সংখ্যাও অনেক। তিব্বতীয়-তন্ত্রের সংখ্যাও কম নয়। বিশেষভাবে সোং কা-পা (Tsong-Ka-Pa) তাঁর *Tantra in Tibet*-গ্রন্থে হেবজ্র, কালচক্র, বজ্র প্রভৃতি ও তা'ছাড়া বহু বজ্রযানতন্ত্রের নামোল্লেখ করেছেন। পুনরায় 'সর্বরহস্যনামতন্ত্ররাজ'-গ্রন্থে বহু তিব্বতীয়-তন্ত্রশাস্ত্রের ও তান্ত্রিক-সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিব্বতে বজ্রযানী সাধকের সংখ্যাই অধিক,— যদিও তন্ত্রযানী, মন্ত্রযানী ও কালচক্রযানী সাধকের সংখ্যাও কম নয়। স্নেল-গ্রোভ-অনূদিত *Hevajra-Tantra*, vols. I-II এ' বিষয়ে দ্রষ্টব্য।

কাশ্মীরীয়-অদ্বৈত-শৈবসাহিত্য প্রধানতঃ (ক) আগমশাস্ত্র, (খ) স্পন্দশাস্ত্র. (গ) প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্র নামে বিভক্ত। এদের মধ্যে (ক) আগমশাস্ত্র,—মালিনী-বিজয়, স্বচ্ছন্দ, মৃগেন্দ্র, রুদ্রযামল ও শৈবসূত্র ; (খ) স্পন্দশাস্ত্র,—স্পন্দকারিকা, স্পন্দসন্দোহ, স্পন্দনির্ণয় প্রভৃতি, এবং (গ) প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্র,—শিবদৃষ্টি, ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা, প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী, প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়, তন্ত্রালোক প্রভৃতি। ভট্ট-উৎপল বা উৎপলদেবের 'স্পন্দপ্রদীপিকা' ও তার কারিকা কাশ্মীরীয়-ত্রিকশাস্ত্রের একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। শাক্তসম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, শিব ও শক্তি আগম ও নিগমের স্রষ্টা ও প্রবক্তা। আম্নায়ভেদে তাই তন্ত্রসাহিত্যের সংখ্যা অসংখ্য সে'কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তন্ত্রসাধকদের অভিমত যে, শৈব ও শাক্ত-ভেদে—শিবের উপাসকরা শৈব এবং শক্তির উপাসকরা শাক্ত, এই দু'টি শ্রেণীতে তন্ত্রসাহিত্য প্রচারিত। শৈবাগম ও রুদ্রাগম দু'টি নামেও এদের প্রচলন আছে।

আগমশাস্ত্রগুলির মধ্যে কোন-কোনটি দ্বৈতমত ও কোন-কোনটি অদ্বৈতমত সমর্থন করে। শাক্তসাহিত্য শিব ও শক্তির অবিনাভাবসম্বন্ধে অভেদ স্বীকার করে। এই অবিনাভাবসম্বন্ধই তন্ত্রে অদ্বৈতমতপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। তবে কাশ্মীরীয় -তন্ত্রসাহিত্য অদ্বৈতবাদ অর্থে শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদের প্রচারক ও সমর্থক। শক্তি-বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদে শিব ও শক্তি উভয়ে চিন্ময়সত্তাবিশিষ্ট, উভয়েই সৎ বা সত্য এবং উভয়ের চণকাকারে মিলিত রূপই অদ্বৈত। এই শক্তিবিশিষ্ট, অদ্বৈতবাদে মায়া বা মহামায়া মহাশক্তিময়ী-আদ্যাশক্তি,—যিনি মায়োপাহিত-ঈশ্বর সগুণ-ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। তন্ত্রসাহিত্যের মতে, মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তি কালীই[২] সৃষ্টিময়ী ও সৃষ্টিকারিণী। শিব বা মহাকাল সহায়কমাত্র। অদ্বৈতবেদান্তের মতো তন্ত্রসাহিত্য দু'টি শিব তাই কল্পনা করে,—সদাশিব (নির্গুণ) ও মহাকাল (সগুণ)। সদাশিব নির্গুণ, এজন্য সম্পূর্ণভাবে তিনি 'শব' এবং এর অর্থ সর্বগুণের ও সকল ক্রিয়ার তিনি অতীত। মহাকাল-শিব সগুণ-ব্রহ্ম, কেননা নৃত্যচঞ্চলা ও গুণময়ী-কালী মহাকালের সঙ্গে সমাসক্ত। তন্ত্রের এই তত্ত্ব ও ধারণাই আদি বা প্রথম ধারণা। পরে তন্ত্রসাধকগণ একটিমাত্র শিব—মহাকালের কল্পনা

২। এই কালী দক্ষিণাকালী বা শ্যামাকালী। তাছাড়া আছে বামাকালী,—যাঁর বামপদ তারাদেবীর মতো শব-শিবের বক্ষে প্রসারিত। উত্তর-ভারতে কালী শবাসনা এবং দক্ষিণা-কালী দক্ষিণ-ভারতে শ্রীবিদ্যা, ষোড়শী, ললিতা বা ত্রিপুরসুন্দরী। কাশ্মীরীয়তন্ত্রে কালী মহাশক্তি,—সত্ত্ব-রজঃ-তমোময়ী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী। সকল তন্ত্রের আরাধ্যা দেবী কালিকা,—সৃষ্টিময়ী সগুণ-ব্রহ্ম এবং মহাচৈতন্যরূপিণী।

করেছেন। এই কল্পনায় মহাকাল নির্গুণ-ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়-শব এবং কালী মহাশক্তি সগুণ-ব্রহ্ম। মোটকথা চিন্তায়, ধারণায় ও তত্ত্বভাবনায়ই যা ভেদ, আসলে শব বা শিব যখন সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি মহাশক্তি কালীর রূপ ধারণ করেন। তন্ত্রধারণায় একটি নির্গুণসত্তা ও অপরটি সগুণসত্তা —যা অদ্বৈতবেদান্তের মূলকথা ভিন্নভাবে।[৩]

॥ মমঃ গোপীনাথ কবিরাজের তন্ত্রসাহিত্য-সম্বন্ধে মতবাদ ॥

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর 'তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগদর্শন'-গ্রন্থে (1916) 'নবযুগের চতুঃষষ্টিতন্ত্র'-আলোচনায় তোড়লতন্ত্রের উল্লেখ করেছেন,—যাতে ৬৪ তন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। সাধক সর্বানন্দও তাঁর 'সর্বোল্লাসতন্ত্রে' ঐ তোড়লতন্ত্রে উল্লিখিত ৬৪ তন্ত্রের নামোল্লেখ করেছেন। এই উল্লেখ সম্পূর্ণ নূতন। সাধক সর্বানন্দ তাঁর সর্বোল্লাসতন্ত্রে ৬৪টি নবনির্ধারিত তন্ত্র সম্পর্কে বলেছেন, ঐ ৬৪ তন্ত্রের নাম যথা,—১। কালী, ২। মুণ্ডমালা, ৩। তারা ৪। নির্বাণ, ৫। শিবসার, ৬। বীর, ৭। নিদর্শন, ৮। লতার্চন, ৯। তোডল, ১০। নীল, ১১। রাধা, ১২। বিদ্যাসার ১৩। ভৈরব, ১৪। ভৈরবী, ১৫। সিদ্ধেশ্বর, ১৬। মাতৃকা, ১৭। সময়া (সময়াবার ?), ১৮। গুপ্তসাধন, ১৯। মায়া, ২০। মহামায়া, ২১। অক্ষয়া, ২২। কুমারী, ২৩। কুলার্নব, ২৪। কালিকা-কুলার্নব, ২৫। কালিকাকল্প, ২৬। বারাহী, ২৭। যোগিনী, ২৮। যোগিনীহৃদয়, ২৯। সনৎকুমার, ৩০। ত্রিপুরাসার, ৩১। যোগিনীবিজয়, ৩২। মালিনী, ৩৩। কুক্কুট, ৩৪। শ্রীগণেশ প্রভৃতি। বামকেশ্বর, উড্ডীশ, তন্ত্রচিন্তামনি, ফেৎকারিণী প্রভৃতিও গৃহীত হয়েছে ।

৩। অদ্বৈতবেদান্তের অনুসারী মহানির্বাণতন্ত্র ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ এই দু'টির দ্বারা ব্রহ্মসত্তার স্বরূপ নির্ণয় করেছে, কিন্তু আসলে তন্ত্র আভাসবাদ-অনুযায়ী শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদেরই প্রবক্তা। এ'সম্বন্ধে আলোচনা করবো পঞ্চম অধ্যায়ে। মহানির্বাণতন্ত্রে আছে—

'সত্তামাত্রং নির্বিশেষং অবাঙ্ মনসগোচরম্ ।
অসত্ত্রিলোকীসদ্ভানং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম ।
সমাধিযোগৈস্তদ্বেদ্যং সর্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ ।
দ্বন্দ্বাতীতৈ নির্বিকল্পৈ'……ইত্যাদি। (৩/৬-৭)

টীকাকার হরিহরানন্দ স্বরূপও তটস্থ দু'টি লক্ষণের দ্বারা স্বরূপ নির্ণয় করতে বলেছেন।

॥ কাশ্মীরীয়-প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্র ॥

স্মরণ ও দৃষ্টিক্রিয়ার সম্মিলিত রূপই 'প্রত্যভিজ্ঞা' নামে পরিচিত। প্রত্যভিজ্ঞা বলতে : "*Pratyabhijñā* is a combination of perception (*drişti*) and memory (*smaraṇa*)"। আসলে অনুভূতি ও স্মরণ বা পূর্বস্মৃতি,—মানবমাত্রে শিব,—এই তত্ত্বের স্মৃতি বা স্মরণই আত্মার মধ্যে পরমাত্মার সুপ্ত বা বিলুপ্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয় এবং জাগিয়ে দেয় জীবাত্মা ও পরমাত্মার,—জীব ও শিবের মধ্যে অভেদসম্বন্ধ ও তাদাত্ম্যভাবকে। কাশ্মীরীয়-শৈবদর্শন 'আভাসবাদ' স্বীকার করে। আভাসবাদে (theory of reflection) বিশ্ববিকাশ মিথ্যা নয়, সত্য এবং নিত্য, চিদ্রূপিণী শক্তির বিকাশ, সে'জন্য নিত্যের বা শিবের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া বলে জগৎ বা বিশ্বপ্রপঞ্চও নিত্য ও সত্য। আভাসবাদ আচার্য শঙ্করের বিবর্তবাদের বিপরীত, কেননা বিবর্তবাদে এক ব্রহ্মচৈতন্যই মিথ্যা-জগদ্রূপে বিবর্তিত, ব্রহ্মচৈতন্যই সত্য, আর জগৎ বা বিশ্ববৈচিত্র্য মিথ্যা অর্থে অনিত্য। মিথ্যাজ্ঞানের (false-knowledge) জন্য জগৎ বা বিশ্ববৈচিত্র্যকে আমরা দেখি ও ভাবি, কিন্তু স্বরূপে বিশ্ববৈচিত্র্য ও জীব শিব বা ব্রহ্মছাড়া অন্য:কিছু নয়।

কাশ্মীরীয়-শৈবদর্শনে কুণ্ডলিনীশক্তির পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চার রকম বিকাশ বা রূপ (বিচ্ছুরণ) স্বীকার করা হয়। শব্দতত্ত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মহাভাষ্যকার ঋষি পতঞ্জলি ও বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি যে'ভাবে পরা, পশ্যন্তী প্রভৃতি নাদ বা শব্দ-বিভাগের ব্যাখ্যা ও পরিচয় দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে অভিনব-গুপ্তের ব্যাখ্যার কিছুটা পার্থক্য (difference) আছে।

কাশ্মীরীয়-শৈবদর্শনের অন্যতম প্রবক্তা ও ভাষ্যকার উৎপলদেব ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের কারিকায় বলেছেন যে, আত্মা বা মহেশ্বর জ্ঞাতৃত্বশক্তি ও কর্তৃত্বশক্তি-ছাড়াও স্বাতন্ত্র্যশক্তির (মাহেশ্বর্যশক্তির) অধিকারী। এই তিনটি শক্তিই আত্মার তথা মহেশ্বরের প্রধান শক্তি। এই তিন প্রধানশক্তি-ছাড়াও তাঁর মধ্যে স্মরণশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও অপোহনশক্তির বিকাশ আছে। স্মরণ, জ্ঞান ও অপোহন এই তিনশক্তির আধারস্থল বা আধার ও কেন্দ্র হলেন আত্মা বা মহেশ্বর। মহেশ্বর ক্রিয়াশক্তির সাহায্যে তাই সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির বিকাশ করেন, আর ভেদাভেদ, মান ও তৎফলমেয়কারণ—এই বিভাগত্রয়ের সাহায্যে মহেশ্বর বিশ্বপ্রকৃতির শাসন ও নিয়মন করেন। উপরিউক্ত তিনটি শক্তি কিন্তু আসলে এক ক্রিয়াশক্তিরই প্রকাশ বা ফলশ্রুতি। ঐ তিনশক্তি সচঞ্চল ও ক্রিয়মান হ'লে তবেই নির্মাণশক্তির বিকাশ

হয়। নির্মাণশক্তিই সমগ্র বিশ্বের স্থিতি ও সত্তার কারণ। ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞার (১৩।২) অভিমতে, আভাসবাদ ও স্বাতন্ত্র্যবাদ পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদের সমগোত্রীয়।

॥ আগম বা তন্ত্রদৃষ্টিতে শিব ও শক্তি ॥

অদ্বৈতবেদান্তের প্রবক্তা ও ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর যেখানে একমাত্র 'প্রকাশ'-রূপ ব্রহ্মকে নিত্য, সত্য ও পরমার্থিক-সত্ত্বা বলেন, আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রবক্তারা ও ভাষ্যকারেরা সেখানে 'প্রকাশ' ও 'বিমর্শ' বা শিব তথা শক্তির চণকাকারে একাত্মক ও অভিন্ন-সত্তাকে নিত্য ও সত্য বলেন। স্যর জন. উড্রফ তাঁর *Shakti and Shākta* (1929)-গ্রন্থে বেদান্ত ও তন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসঙ্গে বলেছেন: "But Shankarāchārya defines the Truly Real as that which is changeless. In this sense, the World as a changing thing has *relative* reality only. Shankara so defines Reality because he sets forth his doctrine from the standpoint of transcendent Being. The Shākta-Shāstra, on the other hand, is a practical Scripture of Worship, delivered from the world-standpoint, according to which the world is necessarily real. According to this (Shākta) view, a thing may be real and yet to be subject to change, because the World is the Lord's Experience, and the Experience of the Lord is never unreal" (pp. 29-30).

ঋগ্বেদে উল্লিখিত অর্ধনারীশ্বরের অভিন্ন বা অবিনাভাবে অদ্বৈতরূপই মনে হয়, আগমে ও তন্ত্রে একাত্মকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। মাননীয় স্যর জন. উড্রফ এ'সম্বন্ধে বলেন: "Shiva and Shakti are one (according to Tantra). The Shaiva (in the narrower sense) predominantly worships the right side of the Ardhvanārishvara-Murti, the Shākta worships the left (Vāma or Shakti) side..." (Vide *Shakti* and Shākta, p. 530). মোটকথা তন্ত্রের মতে, অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি যেমন এক ও অভিন্ন, তেমনই শিব ও শক্তি অভিন্ন, এক ও অখণ্ড।

॥ শৈবাগমশাস্ত্রে ঈশ্বর ও মায়াশক্তি ॥

সকল তন্ত্রশাস্ত্রে কিন্তু শিব ও শক্তিই প্রধান তত্ত্ব,—"প্রপঞ্চবাসনারূপা শান্তিরিত্যভিধীয়তে, নিস্প্রপঞ্চশ্চিদেকাত্মা শিবতত্ত্বং সমীরিতম্"। এটি কাশ্মীরীয়-পরমানন্দতন্ত্রের কথা। অন্যান্য তন্ত্রে তত্ত্বদুটির বর্ণনা হয়তো কিছু-কিছু পৃথকভাবে আছে।

পরশুরামকল্পসূত্রে ১।২ মন্ত্রবাক্যে ভগবান শিব মায়াশক্তি বা শক্তির (মায়াশক্তি এখানে নিত্যাশক্তি) সাহায্য নিয়ে অষ্টাদশ বিদ্যা, সর্বদর্শন প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। অই কল্পসূত্রকার আচার্য পরশুরাম বলেছেন ঃ "ভগবান্ পরমশিবভট্টারকঃ শ্রুত্যাদি-অষ্টাদশবিদ্যাঃ সর্বাণি দর্শনানি লীলয়া তত্ত্বদবস্থাপন্নঃ প্রণীয়..."। বৃত্তিকার পণ্ডিত রামেশ্বর এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "ইত্যেতাদৃশ-ষড়্গুণৈশ্বর্য-সম্পন্নো ভগবান্। ননু পরমশিবঃ তত্ত্বাতীতঃ, তস্য বিদ্যাকর্তৃত্বং ন সম্ভবতি উপাধিশূন্যত্বাৎ...। জগদীশ্বরস্বরূপধর্মবান মায়োপাধিকঃ ইতি তদর্থঃ।...লীলয়া অনায়াসেন তত্তদবস্থাপন্নঃ ঈশ্বরাবস্থাপন্নো বেদান নির্মায়ঃ।"[৪] এখানে 'লীলা'-শব্দে অন্ত্রকার বলেছেন, নিজের প্রয়াসব্যতীত সম্বিন্ময়ী (সম্বিদ্‌ময়ী) স্বাত্মাভিন্না ভগবতী ভৈরবীর অবস্থাপন্ন হন ঈশ্বর। এই অবস্থাপন্ন হওয়ার সময়েই ঈশ্বরের নাম 'মায়িন', মায়াশক্তিসম্পন্ন পুরুষ বা মহেশ্বর। এই ঈশ্বরসহচারিণীশক্তিই আগমে বা তন্ত্রে ভৈরবীশক্তি—যে শক্তির সাহায্যে ঈশ্বর (সগুণ-ব্রহ্ম) বিশ্বসৃষ্টি করেন। বৃত্তিকার রামেশ্বর এই লীলাশ্রয়ী ঈশ্বরকে 'ভট্টারকো জগদ্রূপনাট্যরঞ্জকঃ' বলেছেন। বেদান্তে ইনিই সগুণ-ব্রহ্ম,—যিনি স্বরূপে সম্বিদ্ বা শুদ্ধচৈতন্য।

কাশ্মীরীয়-অদ্বৈত-শৈবদর্শনে বা শৈবাগমে সকল পরিবর্তনের অতীত একমাত্র পরমশিব বা শিবতত্ত্ব থেকেই বিশ্বসৃষ্টির উন্মেষ ও প্রসরণ স্বীকৃত হয়, তাই সৃষ্টির উন্মেষে পরমশিব শক্তি বা বিমর্শরূপে প্রতীয়মান হলেও তিনি পরমশিব থেকে স্বরূপে অভিন্নই। এই শক্তি আনন্দোচ্ছলিতা,—অর্থাৎ পরমশিবের আনন্দরূপ ও প্রকাশ, সে'জন্য সাধারণদৃষ্টিতে শিবের (শিবতত্ত্বের) ও শক্তির (মায়াশক্তির) রূপ চণকাকারে অখণ্ড।

তবে শক্তিতত্ত্বের মধ্যে সাধারণভাবে পার্থক্য বা ভেদ দেখা গেলেও স্বরূপে সেই শক্তি ভেদাতীত-এক ও অভিন্ন। এ'জন্যই কাশ্মীরীয়-শৈবাগমতন্ত্রের নাম অদ্বৈতশৈব-দর্শন! তবে মনে রাখা উচিত যে, অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের দৃষ্টি ও সিদ্ধান্ত এবং কাশ্মীরীয়-অদ্বৈতশৈবদর্শনের দৃষ্টি ও সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে এক ও অভিন্ন নয়, কিন্তু

৪। আচার্য শ্রীকণ্ঠের অভিমতও অনেকটা তাই

তাহলেও উভয়ের তত্ত্বদৃষ্টির মধ্যে বিশেষ-কোন প্রধান-ভেদ বা পার্থক্য দেখা যায় না। কাশ্মীরীয়-ত্রিকদর্শনের সিদ্ধান্তসম্বন্ধে অবশ্য কিছুটা পূর্বে আলোচনা করেছি।

কাশ্মীরীয়-তন্ত্র শৈবাগমশাস্ত্র, স্পন্দশাস্ত্র ও প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্র তিনভাগে বিভক্ত সে'কথা বলেছি। মালিনীবিজয়, বিজ্ঞানভৈরব, মৃগেন্দ্র, স্বচ্ছন্দ রুদ্রযামল, শৈবসূত্র প্রভৃতি আগমশাস্ত্রের অন্তর্গত। স্পন্দশাস্ত্র বা স্পন্দকারিকা ও কোন কোন অন্য কারিকা স্পন্দশাস্ত্রের অন্তর্গত। আচার্য সোমানন্দ-কৃত শিবদৃষ্টি, উৎপলাচার্য-কৃত ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা, অভিনবগুপ্ত কৃত তন্ত্রালোক (১ম – ১২শ ভাগ), ক্ষেমরাজ-কৃত প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয় প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রের অন্তর্গত। মোটকথা কাশ্মীরীয়-শৈবাগমশাস্ত্র ও অন্যান্য তন্ত্রশাস্ত্রের বিষয়বস্তু ও বিচারশৈলী ভিন্ন ভিন্ন হলেও চরমসিদ্ধান্তে তারা একভাবে প্রমাণ করেছে যে, চিদ্ বা পরমশিব চেতন এবং চিতি বা পরাশক্তি স্বরূপে এক ও অভিন্ন, একমাত্র প্রকাশেই কেবল ভিন্ন। প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ে আচার্য ক্ষেমরাজ এ'সম্বন্ধে বলেছেন : 'চিতি স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ ?",—চিতি বা শক্তির স্বতন্ত্র-ইচ্ছাতেই বিশ্বসৃষ্টির সার্থকতা, –"প্রসরন্ত্যাং জগৎ উন্মিষতি ব্যবতিষ্ঠতে চ নিবৃত্তপ্রসারায়াং চ নিমিষতি।" মোটকথা চিতি, প্রকৃতি বা মায়ার সহায়তায় চিদ্ বা ঈশ্বর তথা ব্রহ্মচৈতন্যের ভিন্নভাবে প্রকাশ সম্ভব হয়। পুনরায় বলা হয়েছে : "চিদেব ভগবতী স্বচ্ছ-স্বতন্ত্ররূপা তত্তদনন্তজগদাত্মনা স্ফুরতি"। সুতরাং অদ্বৈত-আগমশাস্ত্রের অভিমত যে চিদ্ ও চিতি, এদের মধ্যে পরমশিবরূপী ব্রহ্ম বা ঈশ্বর চিতি, প্রকৃতি বা মায়াশক্তির প্রভাবে জগদ্রূপ ধারণ করেন, কিন্তু স্বরূপে তারা সকল বিকার ও পরিবর্তনের অতীত, এক ও অভিন্ন।

॥ গৌড়বঙ্গদেশীয়-তন্ত্রে শক্তিদেবীরা রূপভেদে দশমহাবিদ্যার কল্পনা ও ভাবনা ॥

তান্ত্রিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কালীকুল, শ্রীকুল প্রভৃতির মতো কাদি, হাদি ও ক-হাদি-সম্প্রদায়ের প্রচলন আছে বিভিন্ন শক্তিসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ বা পার্থক্য-নির্ণয়ের জন্য। (১) বিষ্ণুক্রান্তার সাধকরা সাধারণত কালীকুলের অন্তর্গত। (২) শ্রীকুলের সাধকরা প্রথমেই গুরুর ও গুরুশক্তির পূজা করেন। শ্রীকুল দক্ষিণ-ভারতীয় শ্রীবিদ্যার উপাসক। গৌড়বঙ্গদেশে তথা বাঙলাদেশের সাধকরা প্রায় কালীকুলের অন্তর্গত। পূর্বে বাঙ্গলাদেশ বিহার, বাঙ্গলা, আসাম উৎকল বা উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশকে নিয়ে 'বৃহদবঙ্গ' নামে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ছিল। এ জন্য বাঙ্গলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার শক্তিসাধকগণ প্রায় কালীকুলের

অন্তর্গত বলা যায়। কালীকুলের তন্ত্রসাধকরা কালীর রূপভেদে শ্যামা, দক্ষিণাকালী, বামাকালী প্রভৃতি এবং কালী, তারা, ষোড়শী প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার সমর্থক। অনেক সময়ে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চণ্ডঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী, সিদ্ধিদাত্রী এই নবদুর্গার পূজার বর্ণনা করেন। সপ্তশতীচণ্ডীর শ্রীশ্রীচণ্ডিকা, কাত্যায়নীর বা পরবর্তী দুর্গা-পূজায় কিছু-কিছু বিধি-নিয়ম আছে অনেক ক্ষেত্রে। শ্রীশ্রীদুর্গা শ্রীশ্রীচণ্ডীকা প্রভৃতির পূজা তান্ত্রিক-বিধি-অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। বিশেষত কালিকুলের তান্ত্রিক-সাধকরাই দেবী দুর্গার, দেবী চণ্ডিকার ও দেবী কালিকারই বিশেষভাবে পূজা করেন। তন্ত্রোক্ত-বিধি-ছাড়াও শ্রীশ্রীদুর্গার পূজার কিছু নূতন বিধি আছে, তবে তান্ত্রিক বিধি-অনুসারে দেবীপূজাই প্রশস্ত ও শাস্ত্রসঙ্গত। বাঙলার তথা গৌড়বঙ্গ-তান্ত্রিক-সম্প্রদায় এই পূজার অনেকাংশভাবে অধিকারী।

॥ মহাশক্তি-কালীর রূপভেদ ও ধ্যানভেদ ॥

গৌড়বঙ্গ-তান্ত্রিকসম্প্রদায়ে অর্থাৎ একমাত্র বাঙলা দেশেই শ্রীশ্রীকালীর রূপ-ভেদের প্রচলন বিশেষভাবে দেখা যায়। শ্রীশ্রীদেবী কালিকার রূপভেদে দশমহাবিদ্যার বিশেষ প্রচলন বাঙ্গলা-বিহার-আসাম-উড়িষ্যার তান্ত্রিক-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। খ্রীষ্টীয় ১৬শ—১৭শ শতকে শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁর 'তন্ত্রসার'-গ্রন্থে এবং পরে শ্রীমৎ রঘুনাথ তর্কবাগীশ তাঁর 'আগমতত্ত্ববিলাস'-গ্রন্থে দেবী কালীকার রূপভেদের বিস্তার এবং পূজার কথা উল্লেখ করেছেন।

তাছাড়া সাধারণত নবদুর্গার মতোই দেবী কালীকার নয় রকম কালীমূর্তির কল্পনার ও পূজার বিধি আছে। নয় রকম কালীমূর্তি যথা,—দক্ষিণাকালী, মহাকালী, শ্মশানকালী, গুহ্যকালী, ভদ্রকালী, চামুণ্ডাকালী, সিদ্ধকালী, হংসকালী, কামকলা-কালী এই নয়টি মূর্তি। মূর্তিভেদে ধ্যানেরও পার্থক্য আছে।

কাশ্মীরীয়-তন্ত্রকার আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁর 'তন্ত্রালোক'-গ্রন্থে দেবী কালীকার আরও কিছু অধিক রূপভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই রূপভেদ ত্রয়োদশ প্রকার বা তেরো রকমের ;—যেমন, ভদ্রকালী বা রুদ্রকালী, রক্তকালী, সৃষ্টিকালী, সংহারকালী, স্থিতিকালী, মার্তণ্ডকালী, মহাভৈরব বা ঘোরচণ্ডকালী, কালাগ্নিরুদ্রকালী প্রভৃতি। এই রূপভেদে এঁদেরও ধ্যানভেদের কথা উল্লিখিত হয়েছে 'ক্রমস্তুতি' গ্রন্থে।

মহাকালসংহিতা, কামাখ্যাতন্ত্র, তন্ত্রসার, চিদ্‌গগনচন্দ্রিকা প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রে

বিভিন্ন কালীর ধ্যানের বর্ণনা আছে। তন্ত্রসাধকগণ আপনাপন রুচি ও কল্পনা-অনুসারে সকামভাবে, আবার নিষ্কামভাবেও সিদ্ধকালী, মহাকালী, ভদ্রকালী, গুহ্যকালী, বামাকালী প্রভৃতি শক্তিদেবীর ধ্যান ও পূজাদি সম্পন্ন করেন।

বিশেষ ক'রে বৃহদবঙ্গে তথা গৌড়-বঙ্গদেশে বিহারে, আসামে ও উড়িষ্যায় দশমহাবিদ্যার পূজার প্রচলন ছিল এবং এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল দেশে দেখা যায়। বিভিন্ন তন্ত্রে ও পুরাণে মহাশক্তির বিচিত্রভাবে পূজার কথা বর্ণনা আছে,—যেমন বর্ণনা আছে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী দুর্গা, অম্বিকা, কাত্যায়নী, চণ্ডীকা প্রভৃতি দেবীর পূজাসম্বন্ধে। মৎস্য, বামন, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে শক্তির রূপভেদের ও প্রকাশবৈচিত্র্যের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দশমহাবিদ্যা একমাত্র মহাশক্তি কালীরই ভিন্ন ভিন্ন রূপভেদ,—যেমন একমাত্র শ্রীচণ্ডিকার বিভিন্ন রূপভেদ শ্রীদুর্গা, পার্বতী, ভবানী, উমা কৌষিকী, কালী, তারা, চামুণ্ডা, বারাহী প্রভৃতি।

॥ দশমহাবিদ্যা ও দশমহাবিদ্যাতত্ত্ব ॥

তন্ত্রে কালিকুলের সাধকগণ শক্তিসাধনার জন্য কালী বা দক্ষিণাকালিকা ছাড়া তারা, ষোড়শী প্রভৃতির পূজা ও সাধনা করেন। দশমহাবিদ্যা—

'মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী বগলা ছিন্নমস্তা কমলাত্মিকা।
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণাং মোক্ষফলপ্রদাম্ ॥'

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা বা কমলাত্মিকা। এ'রা সকলেই মহাবিদ্যা ও মহাশক্তিরূপিণী দেবী। দশমহাবিদ্যার মধ্যে দেবী ষোড়শীরও রূপ ও বর্ণনার কথা কোন কোন তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। দেবী ষোড়শী চারিহস্তবিশিষ্টা, আবার ৮+৮=১৬ হস্ত-বিশিষ্টা।[৫] এই দেবী ষোড়শীই দক্ষিণদেশীয় কেরলীয়-শাক্তসম্প্রদায়ে ললিতা, ষোড়শী, শ্রীবিদ্যা ও ত্রিপুরসুন্দরী বা মহাত্রিপুরসুন্দরী। বিহারে কৌশাম্বীতে প্রাপ্ত ষোড়শ হস্তবিশিষ্ট মূর্তি অপরূপ। ষোড়শীদেবী মুক্তি ও ভুক্তি বলতে ভোগ ও মোক্ষ দুই-ই প্রদান করেন,—যেমন বাঙ্গলাদেশে দেবী দক্ষিণাকালীকা ভোগ ও মুক্তি উভয়ই দান করেন সকাম-সাধককে। কিন্তু বামাকালী ভোগবন্ধনমুক্ত ক'রে একমাত্র মুক্তিই দান করেন।

৫। অষ্টাদশ (১৮) হস্তবিশিষ্টা শক্তিমূর্তিরও বর্ণনা আছে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে

॥ দশমহাবিদ্যার কল্পনা শক্তিসাধনার ক্রমস্তরবিশেষ ॥

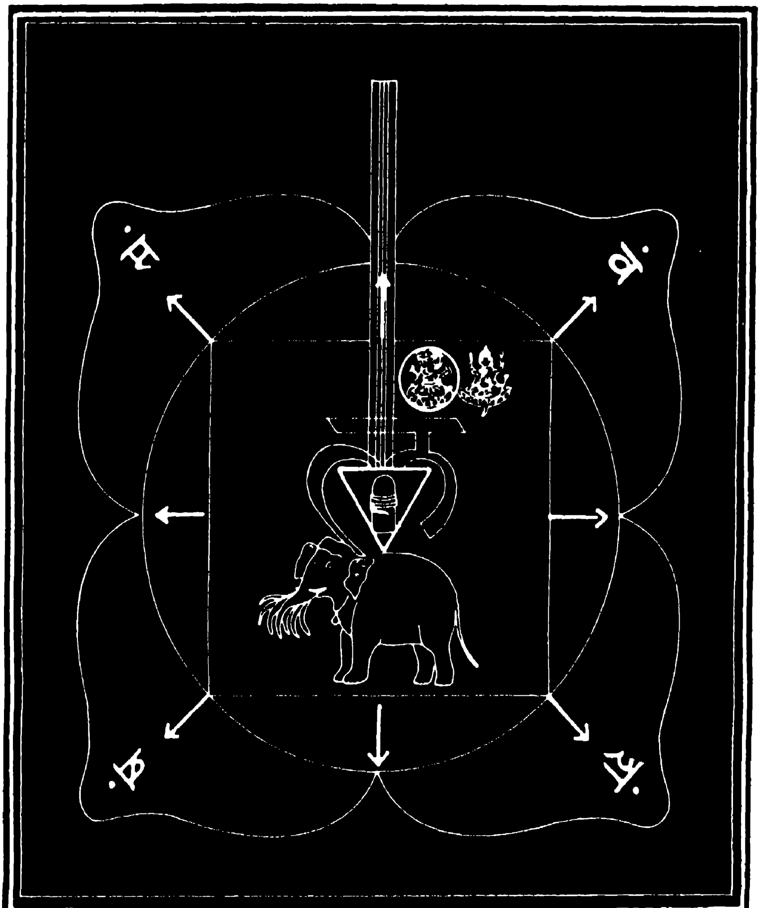
দশমহাবিদ্যার সাধনা শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে ক্রমোচ্চস্তরবিশেষ। দশমহাবিদ্যার মধ্যে সকল দেবীর সাধনা বিহিত থাকলেও একমাত্র দক্ষিণাকালিকার ধ্যানেই জীবন-সিদ্ধি লাভ হয়। শ্যামাকালী দক্ষিণাকালীর নামান্তর বলা যেতে পারে। দক্ষিণা বরদা ও কল্যাণী। গৃহবাসী ও বনবাসী—গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী এই উভয় শ্রেণীর সাধকরাই দক্ষিণাকালীর সাধনা করতে পারেন। বামাকালী কিন্তু সংসারবন্ধন নাশিনী, এ'জন্য একমাত্র ত্যাগীসন্ন্যাসীর পক্ষেই বামাকালীর পূজা ও সাধনা বিধেয়। দক্ষিণাকালীর দক্ষিণপদ সম্মুখে (শিব বা মহাকালের বুকে) ন্যস্ত বা প্রসারিত, আর বামাকালীর দেবী তারার মতো বামপদ সম্মুখে প্রসারিত। ধ্যানমন্ত্র দক্ষিণা ও বামার একটু ভিন্ন। দক্ষিণার একাক্ষরী বীজমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। দ্ব্যক্ষরী, ত্র্যক্ষরী, একাদশাক্ষরী, দ্বাবিংশাক্ষরী প্রভৃতি বীজমন্ত্রও আছে। হ্রীং এবং ক্রীং দেবী কালিকার সাধারণ বীজমন্ত্র। তা ছাড়া মন্ত্রে বৈদিক বীজ ওঁ এবং কীলকাদির ব্যবহার আছে।

॥ ক্রমবিবর্তনে দক্ষিণাকালীর মূর্তিভেদ ॥

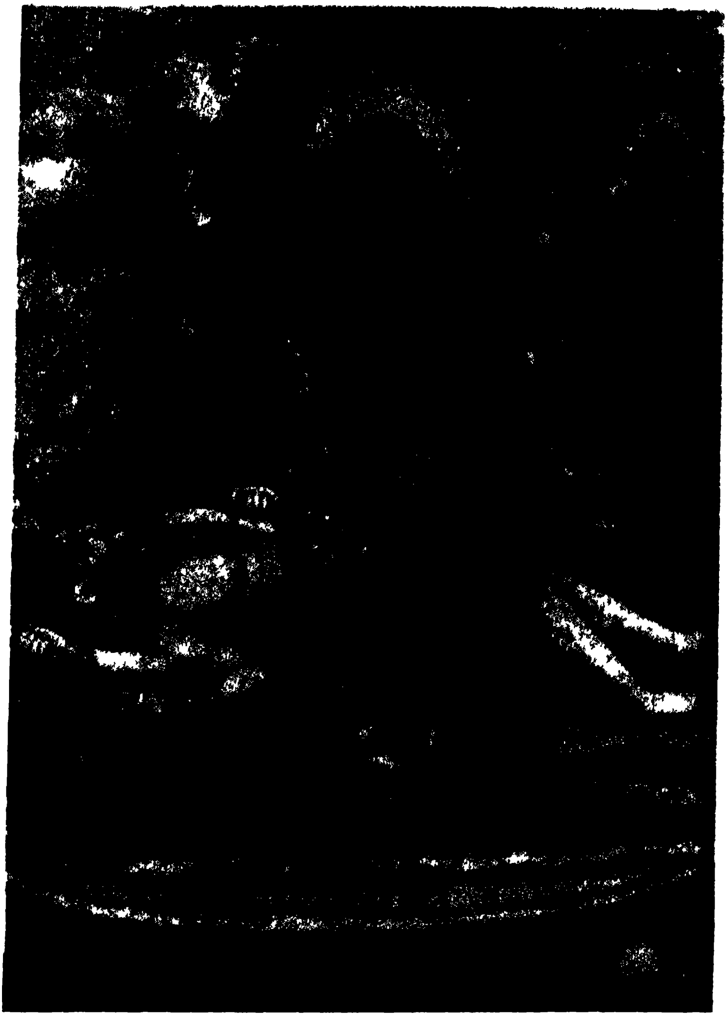
দক্ষিণাকালীর ও শিবের মূর্তিতে বর্তমানে বহু পবিবর্তন সাধিত হয়েছে সেকথা সংক্ষেপে পূর্বে বলেছি। বর্তমানকালে কালীমূর্তি অনেকটা ভদ্ররুচিসম্পন্ন, কিন্তু শাস্ত্রবিগর্হিত। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণাকালী মহাকালের উপর উপবিষ্টা থাকেন ও মহাকাল-শিবের নীচে সদাশিব-শিব শায়িত থাকেন। দুই শিব, সদাশিব ও মহাকাল। সাধককে জন্মমৃত্যুচক্র থেকে নির্মুক্ত করার জন্য দেবী বিপরীতরতাতুরা। সর্বনিম্নের নিষ্ক্রিয় সদাশিব-শিব কূটস্থ-নির্গুণ-ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতীক। সদাশিবের উপর নিষ্ক্রিয় মহাকাল-শিব সৃষ্টি-উন্মুখী-সগুণব্রহ্ম,—যিনি অদ্বৈতবেদান্তের মায়াধীশ ঈশ্বর এবং তন্ত্রে লীলাচঞ্চলা নৃত্যশীলা মহাকালী। আর আছে বামাকালী,—যাঁর বামপদ শিবের বুকে রক্ষিত,—অনেকটা শ্রীশ্রীতারাদেবীর মতো।

॥ দক্ষিণাকালীর মূর্তিবর্ণনা ॥

প্রথমে মহাকাল-শিব। সদাশিব মহাকালেরও পারে,—সর্বাতীত। অব্যক্ত বা গুণোত্তীর্ণ মহাকালের ব্যক্ত বা ব্যাকৃত রূপ—দেবী কালী। কালী ও শিব সে'জন্য একটি টাকার এপীঠ ও ওপীঠ। একই শিব,—কখনও সৃষ্টিরূপিণী কালী, আবার কখনও সৃষ্টির অতীত মহকাল ও সদাশিব। বর্তমানে অদ্বৈততত্ত্বের শিবাদ্বৈতের ভাবকে রক্ষা ক'রেই একটিমাত্র শিব-মহাকালের উপর মহাশক্তির নৃত্যবিলাস দেখা যায়।



কুল-কুণ্ডলিনী কালীর সৃষ্টি-উৎস মূলাধারচক্র ।



দেবী কালিকা বিশ্বপ্রসবিনী মহাপ্রকৃতির প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্তি।
প্রথম বিকাশস্তবের কালী। [প্রথমস্তরে প্রথমে সদাশিব (নির্গুণ) ও তার
উপরে মহাকাল (সগুণ)। মহাকালের উপর উপবিষ্টা দেবী কালিকা]।



দেবী কালিকা (মহাকাল শিবের উপর উপবিষ্টা দ্বিতীয় বিকাশস্তরে)।



তৃতীয়স্তরের দেবী কালিকা মহাকাল শিবের উপর দণ্ডায়মানা। এটি বামাকালী,—বামপদ শিবের বক্ষে ন্যস্ত এবং দক্ষিণাকালীর ডান বা দক্ষিণপদ পশ্চাতে ন্যস্ত। বামকালী—সর্বনাশা অর্থে সকল কামনা বাসনার নাশ করেন।

দক্ষিণাকালী অনুকূলা, কি গৃহী ও কি সন্ন্যাসী সকলের পূজার অধিকার আছে দক্ষিণাকালীর পূজার।

শিবের বুকে পা রাখার তত্ত্ব বা রহস্য হলো দেবী কালিকা মহাকাল-শিব-ছাড়া অন্য-কিছু নন। শিব ও শক্তির সম্পর্ক অবিনাভাবের-ও অদ্বৈতের। শিবশক্তিতত্ত্ব আসলে ব্রহ্মতত্ত্বই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বানুভূতির অদ্বৈতানুভূতিও ঐ এক ও অদ্বৈত তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত : 'যিনি শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম', 'বেদান্তে যাকে শক্তি বা কালী বলে কয়, তাঁকেই আমি ব্রহ্ম ব'লে কই, 'কালী চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব, আবার আরো কত কি'। বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দিব্যানুভূতি সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ, বিশ্বগত-বিশ্বোত্তীর্ণ এই পরমসত্য ও চরমতত্ত্বকে মিলনসূত্রে গ্রথিত এবং বিচিত্র মতভেদের জগতে এক পরমবিস্ময়কর মহাসমন্বয়ের সত্য আবিষ্কার করেছে।

অনভিষিক্ত সাধকের পক্ষে দক্ষিণাকালীর পূজা সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু অভিষিক্তপক্ষে দক্ষিণাকালীর পূজায় 'রহস্যপূজা'-র বিধি আছে। 'রহস্যপূজা' একমাত্র পূর্ণাভিষিক্ত বা অন্যান্য অভিষিক্ত সাধকই অনুষ্ঠান করতে পারেন। রহস্য-পূজার প্রারম্ভে শ্রীশ্রীকামিনীদেবীর পূজার বিধি আছে। শ্রীশ্রীকামিনীদেবী দেবী দুর্গা বা দেবী কালিকারই রূপভেদ। আবার দাক্ষিণাত্যে দেবী কামিনী শ্রীবিদ্যা বা দেবী ললিতা বা কামেশ্বরী ও ষোড়শী। দেবী কামিনীর ধ্যান হোল,—'সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং রক্তবর্ণাং চতুর্ভুজাম্' প্রভৃতি। পূজার পূর্বে ভূতশুদ্ধির উদ্দেশ্যে দেবী মাতৃকাকে সর্বাঙ্গে আবাহন করা হয়। সেজন্য ভূতশুদ্ধির বিধি সকল পূজাতেই থাকে। সর্ববর্ণ বা বর্ণবীজরূপিণী দেবী মাতৃকার পূজা, আবাহন ও সাধনাই মহাশক্তির সাধনা। দেবীপূজায় বাণলিঙ্গরূপী শিবপূজার বিধি আছে। এই পূজার রহস্যকথা এই যে, শিব ছাড়া শক্তি নাই এবং শক্তি ছাড়া শিব নাই,—শিব-শক্তির অবিনাভাবসম্বন্ধ চণকাকারে, এবং চণকাকারে সামরস্য অর্থে চৈতন্যে চৈতন্যে মিলিত এক অখণ্ড-মহাচৈতন্য,—যে মহাচৈতন্য দু'টি ভাগে বিভক্ত, কিন্তু অবিনাভাবসম্বন্ধে এক ও অখণ্ড।

॥ তারাদেবীর বর্ণনা ॥

মহাকালীর পরে তারাদেবী। তারিণী যিনি, তিনিই গৌড়বঙ্গসম্প্রদায়ে তারাদেবী এবং বৌদ্ধতন্ত্রে বিভিন্ন মূর্তির তারাদেবীরূপে প্রকাশিত।

॥ তারাদেবী ॥

পৃথক পৃথক হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধারণায় ও ভাবনায় বিভিন্ন তারাদেবীর রূপ, বীজ, মন্ত্র, যন্ত্র ও পূজা কল্পনা করা হয়েছে। বৌদ্ধতন্ত্রে দেবী তারার রূপভেদ অনেক

বা বিচিত্র। দেবী তারার ধ্যান যেমন—

'প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ।'—প্রভৃতি।

॥ দেবী তারার রূপভেদ হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় তন্ত্রে ॥

ভিন্ন ভিন্ন বীজাক্ষরে তারাদেবীর রূপকল্পনাও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন, পঞ্চাক্ষরী একজটা বা নীলসরস্বতী, ত্র্যক্ষরী উগ্রতারা বা মহানীলসরস্বতী প্রভৃতি।

দেবী তারা-সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক হীরানন্দ শাস্ত্রী *The Origin and Cult of Tārā*-গ্রন্থে লিখেছেন : দেবী তারা ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ এই উভয় ধর্মেই শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিতা। দেবী তারার প্রধান তিনটি রূপ,—একজটা, নীলসরস্বতী, ও উগ্রা,—যদিও তারার আরও অনেক রূপের ও নামের প্রচলন আছে। দেবী তারার তিনটি নামভেদ হলেও স্বরূপতঃ তিনি এক ও অদ্বিতীয়া,—'একৈব হি মহাদেবী নামমাত্রং ত্রিধা ভবেৎ'। অগ্নিপুরাণে দেবী তারা অক্ষোভ্যা ও সর্বজ্ঞা এই দুই 'যোগিনী' (দেবী নয়) নামে পরিচিতা। অক্ষোভ্য ও সর্বজ্ঞা আবার ধ্যানীবুদ্ধকেও বলা হয়। কিন্তু যোগিনী-অক্ষোভ্য ও সর্বজ্ঞা-অক্ষোভ্যা সর্বজ্ঞারূপ-ধ্যানীবুদ্ধ থেকে পৃথক। ব্রাহ্মণ্যধর্মে দেবী তারাকে পরমসিদ্ধিদায়িনী বলা হয়েছে,—"নৈব তারাসমা কাচিদ্দেবতা সিদ্ধিদায়িনী"। মাননীয় হীরানন্দ শাস্ত্রীর মতে, ব্রাহ্মণ্যধর্মে তারাদেবীর প্রচলন আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে নয়,—'**perhaps they do not go back further than the 6th century A.D**'। রায় বাহাদুর এইচ. কৃষ্ণশাস্ত্রীর মতে, কাঞ্চীভরমে প্রতিষ্ঠিতা কামাক্ষীদেবী নাকী বৌদ্ধ-তারাদেবীরই রূপভেদ বা হিন্দু-তারাদেবীর অভিন্নরূপ। দাক্ষিণাত্যে তারাদেবীর বিশেষ পূজার প্রচলন নাই, সেজন্য শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ রাও তাঁর *Hindu Iconography*-গ্রন্থে তারাদেবীর কোন বর্ণনা দেননি। হেমেন্দ্র 'অভিধানচিন্তামণি'-গ্রন্থে বলেছেন যে, জৈনদেবীরূপে তারাদেবীকে শ্রদ্ধা করলেও জৈন-সম্প্রদায় তারাদেবীকে কোন মুখ্যদেবতারূপে গ্রহণ করেন নি।

মহাযান-বৌদ্ধধর্মে দেবী তারা অবলোকিতেশ্বরের শক্তি। ব্রাহ্মণ্য-দেবী দুর্গার ন্যায় তারাদেবী শক্তিশালিনী ও প্রধানা দেবী। তাছাড়া বৌদ্ধ-মহাযানীরা তারাদেবীকে পরবর্তী বিভিন্ন বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের জননী ও সৃষ্টিকারণ বলে গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে এবং রুদ্রযামল ও ব্রহ্মযামলে তারাদেবীকে 'প্রজ্ঞাপারমিতা' (বৌদ্ধ) ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ প্রজ্ঞাপারমিতা বৌদ্ধদেবী। পুনরায় তোড়লতন্ত্রে ব্রাহ্মণ্য-শিবকে বলা হয়েছে অক্ষোভ্য ও তাঁর শক্তি তারাদেবী—

'সমুদ্রমন্থনে দেবী কালকূটনং সমুপস্থিতম্ ।
সর্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ মহাক্ষোভমবাপ্নুয়ুঃ ॥
ক্ষোভাদিরহিত' যস্মাৎ পীতং হলাহলং বিষম্ ।
অতএব মহেশানি, অক্ষোভ্য পরিকীর্তিতঃ ॥
তেন সার্ধং মহামায়া তারিণী রমতে সদা ।'

দেবীরূপে তারিণী ও তারা একই। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে শিবকে বলা হয়েছে অক্ষোভ্য ও তাঁর শক্তি তারা।[৬] তারাদেবীর উৎপত্তি (origin -সম্পর্কে শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন : **"Regarding the place of origin of Tārā or Tārā-worship, I am of opinion that we should rather look towards the Indo-Tibetan borderland...",** পুনরায় তিনি বলেছেন : **"......that Tārā-worship originated somewhere towards Lādākh[৭]** বরোদা থেকে প্রকাশিত বৌদ্ধ-'সাধনমালা'-গ্রন্থে (ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত ৩য় ভাগ পৃষ্ঠা ১৭৬), বিভিন্ন তারামূর্তির বিবরণ ও ধ্যানের বর্ণনা আছে। ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু-তন্ত্রে তারার রূপবর্ণনা, ধ্যান ও সাধনবিধির উল্লেখ আছে কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রে তারার রূপবৈচিত্র্য এবং ধ্যানভেদ লক্ষ্য করার বিষয়। তারণ (উদ্ধার) করেন বলে তিনি তারা বা তারিণী। তারাদেবীর ভিন্ন রূপ একজটা বা উগ্রতারার মূর্তি ভয়ানক-রসের উদ্বোধক। শ্রদ্ধেয় হীরানন্দ শাস্ত্রী *The Origin and Cult of Tārā*; প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু *Archaeological Survey of Mayurbhāñja*-গ্রন্থে দেবী তারার বর্ণনা আছে।

দেবী তারা প্রত্যালীঢ়পদা,—অর্থাৎ তার বামপদ অগ্রবর্তী ও দক্ষিণবর্তি,—যেমন দেখা যায় বামাকালীর। বামা ও দক্ষিণা-কালীর দু'টি রূপ সমান হলেও বেশ ভিন্ন। দেবী তারা ঘোরা এবং মুণ্ডমালা-বিভূষিতা, খর্বা ও লম্বোদরী। কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্মাচ্ছাদিত, নবযৌবনসম্পন্না, লেলিহানাদি পঞ্চমুদ্রাসংযুক্তা, চতুর্ভুজা এবং জিহ্বা বহির্গতা। তবে অতিভীষণা হ'লেও দেবী বরদা ও কল্যাণী। তাঁর ঊর্ধ্ব ও অধঃ দক্ষিণকরদ্বয়ে খড়্গ ও কর্তরী এবং বামকরদ্বয়ে কপাল ও পদ্ম। শিরোভাগে অক্ষোভ্য বিরাজিত এবং পিঙ্গলবর্ণ দীর্ঘ একটি জটা দোদুল্যমান।

৬। Vide *The Origin and Cult of Tārā* (Govt. of India Publication, 1925) p. 13.

৭। শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয়ের তারাদেবীর উৎপত্তি-সম্বন্ধে অভিমত বা সিদ্ধান্ত যথার্থভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে বৌদ্ধতারার কথা স্বতন্ত্র।

লোচনত্রয় বালসূর্যের মতো রক্তাভ ও জ্যোতির্ময়। জ্বলন্ত চিতার মধ্যে অবস্থিতা ও ভীষণ-দশনা, কিন্তু মুখ হাস্যময়। নানা অলংকারে ভূষিতা।

দেবীতারার ধ্যান পূর্বে উল্লেখ করলেও পুনরায় ভিন্নভাবে বলি—

'প্রত্যালীঢ়পদা ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ ॥
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্ ॥
খড়্গকর্ত্রী সমাযুক্ত-সব্যেতং ভুজদ্বয়াম্।
কপালোৎপলসংযুক্ত সব্যপানিদ্বয়ান্বিতাম্ ॥
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্।
বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রয়ভূষিতাম্ ॥
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্।
সাবেশ-স্মেরবদনাং অলংকারবিভূষিতাম্ ॥'

॥ দেবী তারার একটি অজ্ঞাত-স্তোত্র ॥

'নীলসরস্বতী তারে ভগবতি হর-জড়তাপতমাত্মগতম্।
পৃথু-লম্বোদরি ভূষণ-বিষধরি জয় শিবসুন্দরি পাহিসুতম্ ॥'

এই তারাদেবীই বৌদ্ধতন্ত্রে নীলসরস্বতী। আমার 'তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা'-গ্রন্থে বৌদ্ধতারা নীলসরস্বতী ও বিভিন্ন বৌদ্ধতারাদেবীদের আলোচনা আছে। অষ্টসিদ্ধাই-লাভের জন্য অনেকে দেবী নীলসরস্বতীর উপাসনা করেন।

মহাশক্তি তারাদেবীর পর দেবী ষোড়শী। ষোড়শীর কথা পূর্বে কিছুটা উল্লেখ করলেও পুনরায় বলি—

দেবী ষোড়শীই ললিতা, ত্রিপুরসুন্দরী বা শ্রীবিদ্যা। 'আনন্দলহরী' বা 'সৌন্দর্যলহরী'-স্তোত্র আচার্য শঙ্কর-রচিত এবং তার টীকা রচনা করেছেন শ্রীমদচ্যুতানন্দ ও শ্রীমল্লক্ষ্মীধর। আচার্য শঙ্কর সৌন্দর্যলহরীতে বলেছেন—

শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিরথ রবিঃ শীতকিরণ,
স্মরো হংস শক্রস্তদনু চ পরামারহরয়ঃ।
..........জননী নামাবয়বতাম্ ॥ ৩২

টীকাকার লক্ষ্মীধর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন—

'ত্রিখণ্ডো মাতৃকামন্ত্রঃ সোমসূর্যানলাত্মকঃ'।

টীকাকার লিখেছেন : "ইতি অবরোহক্রমেণেতি শেষঃ। সোমসূর্যানলাত্মকঃ ... . ত্রিখণ্ডইত্যুক্তি জ্ঞানশক্তীক্রিয়াশক্ত্যাত্মকং খণ্ডত্রয়মিতি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাত্রয়াত্মকং, বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞ-বৃত্তিত্রয়াত্মকং খণ্ডত্রয়ম্" প্রভৃতি।

পুণরায় ত্রিখণ্ড অর্থে সোম বা চন্দ্র, সূর্য ও অনল বা অগ্নি। মাতৃকামন্ত্রের এই তিনখণ্ড বা তিনটি ভাগ। সোম ও সূর্যের মধ্যে বিষ্ণুগ্রন্থিরূপ ভুবনেশ্বরীর বীজ এবং সেখানেই একাক্ষর চন্দ্রকলা বা চন্দ্রকলাখণ্ডঃ 'অত্র শিবঃ শক্তিরিত্যাদিশব্দাঃ...তথাহি ত্রিপুরসুন্দরীমন্ত্রস্য ষোড়শবর্ণাঃ।.. সা চ পরা কলা চিদেকরসা।"

দেবীর ষড়ঙ্গন্যাসে বলা হয়েছে : 'ঐং সর্বজ্ঞাশক্তি শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী' প্রভৃতি ত্রিপুরসুন্দরীর তিন পুর বা প্রতিষ্ঠা = পরা, পশ্যন্তি ও মধ্যমা এবং বহিঃপুর বৈখরী। বিষ্ণু-সম্পর্কেও বলা হয়েছে : 'একাংশেন স্থিতঃ জগৎ' এবং 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' ;—অর্থাৎ পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমা বিদ্যুৎলতাকারা কামকলা-কুণ্ডলিনীর তিনটি বিচ্ছুরণ বা প্রকাশ,—সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মভেদে—পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা এবং একাংশ (বহিরাংশ) হলো বৈখরী = স্থূল-শব্দময় ও পদার্থময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আসলে শ্রীবিদ্যা, ললিতা বা ত্রিপুরসুন্দরীই ষোড়শী। এই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা দেবী চতুর্হস্তবিশিষ্ট, আবার ৮ + ৮ = ১৬ হাতবিশিষ্ট সেকথা পূর্বে বলেছি। ষোড়শহস্তবিশিষ্ট ষোড়শী বা ত্রিপুরসুন্দরীর একটি মূর্তির ছবি আমাদের সংগ্রহে আছে। ষোড়শীদেবী অপরূপা লাবণ্যময়ী সুন্দরী। দেবীকে ধ্যানে বলা হয়েছে—

'পদ্মানিভাং দেবী বালার্ককিরণোজ্জ্বলাম্
জবাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাম্ ॥'

॥ দেবী ভুবনেশ্বরী ॥

এরপর ভুবনেশ্বরী 'আনন্দময়ীং সাক্ষাচ্ছব্দব্রহ্মস্বরূপিণীম্'। তারপর ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী। ছিন্নমস্তা দেবী প্রচণ্ডচণ্ডিকা, ভয়ঙ্করা কিন্তু অমৃতদায়িনী।

॥ দেবী ছিন্নমস্তা ॥

দেবী ছিন্নমস্তার ধ্যান বিভিন্ন তন্ত্রে বিভিন্ন রকম, তবে সাধারণত এই ধ্যানই প্রশস্ত—

'স্বনাভৌ নীরজং ধ্যায়েচ্ছুদ্ধং বিকশিতং সিতম্।
তৎপদ্মকোশমধ্যে তু মণ্ডলং চণ্ডরোচিষঃ ॥
জবাকুসুমসঙ্কাশং রক্তবন্ধুকসন্নিভম্।
রজঃসত্ত্বতমোরেখাযোনিমণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥

মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্।
ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্ ॥
প্রসারিতমুখীং ভীমাং লেলিহানগ্রজিহ্বিকাম্।
পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠ বিনির্গতা ॥
বিকীর্ণ কেশপাশাঞ্চ নানাপুষ্পসমন্বিতাম্।
দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্।
দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ়পদাস্থিতাম্ ॥
অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগ যজ্ঞোপবীতিনীম্।
রতিকামোপবিষ্টাঞ্চ সদাধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ ॥
সদাষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
বিপরীত রতাশক্তৌ ধ্যায়েদ্রতিমনোভবৌ ॥
ডাকিনী যোগিনী যুক্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ।
দেবীগল্লোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্ব্বীতম্।
বার্ণনীং লোহিতসোম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্ ॥
কপালকর্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ ॥
নাগযজ্ঞোপবীতাচ্যাং জ্বলত্তেজোময়ীমিব।
প্রত্যালীঢ়পদাং দিব্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্ ॥'[৮]—প্রভৃতি।

ধ্যান আরম্ভ হয়েছে এ'ভাবেঃ "অথ প্রচণ্ডচাণ্ডকামন্ত্রঃ"। এটি গুপ্তসারতন্ত্র থেকে উদ্ধৃত।

দেবী ছিন্নমস্তার পর দেবী ধূমাবতীর ধ্যান—

বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরী।
বিবর্ণকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা ॥
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা।
সূর্পহস্তাতিবৃক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা ॥ —প্রভৃতি

॥ দেবী বগলামুখী।

দেবী বগলামুখীর ধ্যান—

ওঁ মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী—
সিংহাসনোপরিগতাং পরিণীত বর্ণাম্।

৮। এই ছিন্নমস্তাদেবীর বিস্তৃত বর্ণনা আমার 'তন্ত্রতত্ত্বপ্রকাশিকা'-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

পীতাম্বরাভরণ মালাবিভূষিতাঙ্গীং
দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গরবৈরী জিহ্বাম্ ॥—প্রভৃতি।

এরপর মাতঙ্গী, কমলা (লক্ষ্মী) প্রভৃতির ধ্যান ও উপাসনা।

মোটকথা দশমহাবিদ্যাগণ কুণ্ডলিনীরই প্রতিরূপ মহাশক্তি 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'। এ'জন্য দশমহাবিদ্যার ধ্যান ও পূজার পর আধারশক্তি কুণ্ডলিনীর ধ্যানের ও পূজার বিধি আছে।

তত্ত্বচিন্তায় শুধু নয়, সকল রকম দেবতা ও দেবীচিন্তায় এবং অধ্যাত্মচিন্তায়ও নিজের দেহরূপ ভাণ্ডকে ব্রহ্মাণ্ডরূপে কল্পনা ক'রে মূলাধারে সুখশায়িতা ও সাধারণভাবে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীশক্তিকে পরমারাধ্যা দেবীরূপে ভাবনা ও পূজা করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন—'যা আছে ভাণ্ডে, তা' আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। নিজের দেহের মধ্যে মহাপ্রাণরূপ শিব সর্বগত,—সর্বাতীত ব্রহ্মচৈতন্য এবং মহাশক্তি কালী বিরাজিত। এ'জন্য সাধক নিজের মধ্যে জীবাত্মাকে পরমাত্মারূপে চিন্তা ক'রে সাধনার সাহায্যে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-রূপ অনুভূতির পর 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই উপলব্ধি করেন। তন্ত্রসাধনার মর্মকথাই তাই।

॥ তন্ত্রে শক্তিপূজা কুণ্ডলিনীশক্তির পূজা ॥

তন্ত্রসাধনা শক্তি তথা মহাশক্তির সাধনা। প্রতিটি মানুষের ও প্রাণীর শরীরের মধ্যে মহাশক্তি কুণ্ডলিনী সাধারণভাবে নিদ্রিতা। তন্ত্রসাধনায় ঐ নিদ্রিতা ও প্রসুপ্তা মহাশক্তিকে জাগ্রত এবং চক্রে চক্রে উত্থিত ক'রে পরিশেষে জ্ঞানচক্র বা গুরুচক্র আজ্ঞাচক্র ভেদ এবং সহস্রারে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হ'তে হয়। এই মিলনের নামই চৈতন্যে-চৈতন্যে একরসে মিলন। খণ্ডচৈতন্য অখণ্ড-মহাচৈতন্য-পরমশিবের সঙ্গে মিলিত এবং একীভূত হয়। তখন সমান রসসম্পন্ন-সামরস্যে শিব ও শক্তি অবিনাভাবে মিলিত হয়। অজ্ঞানে জীব এবং শিব। নিদ্রায় জীব ও জাগরণে শিব। জাগরণের অর্থ অখণ্ড ও একরস-চৈতন্যসমুদ্রে একাকার হওয়া এবং চিতিশক্তি ও শিবচৈতন্যসাগরে এক হওয়া। এই সমরসরূপ একাকার তথা সামরস্যের অনুভূতিলাভই তন্ত্রসাধনার মূল ও চরমকথা।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ তন্ত্রসাধনায় আচার ও তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ॥

তন্ত্রসাধনা সাধনসিদ্ধ গুরুর নির্দেশনা ও উপদেশ-সাপেক্ষ। তন্ত্রসাধনার নির্দেশক ও পথপ্রদর্শক আগম, নিগম ও যামল। কথিত যে, এই সকল আকর বা আধারস্বরূপ শাস্ত্রের বক্তা শিব ও শক্তি। শিব ও শক্তি এ'জন্য তন্ত্রসাধনায় উপাস্য-দেবতা। শিবের মুখই আম্নায়। পঞ্চানন শিব পঞ্চ-আম্নায়যুক্ত। সুতরাং আগম নিগমস্বরূপ তন্ত্রশাস্ত্রের আম্নায় পাঁচটি—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও উর্ধ। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শিব আগমশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং দেবী মহাশক্তি নিগম-শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিতা।

॥ আগম, নিগম ও যামল ॥

তন্ত্রশাস্ত্রের মতে, শিব ও শক্তি থেকে সকল তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি। তন্ত্রশাস্ত্রগুলি আগম ও নিগম এবং কয়েকটি প্রধান যামলে বিভক্ত। শিবমুখনিঃসৃত তন্ত্রগুলির নাম 'আগম' ও শক্তিমুখনিঃসৃত তন্ত্রগুলির নাম 'নিগম'। মোটকথা : তন্ত্রশাস্ত্রগুলি যে শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত সেকথাই 'মুখনিঃসৃত'-শব্দে বুঝানো হয়েছে। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য 'সাধনমালা'-গ্রন্থের Introduction-এ আগম ও যামল দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। আগম ও যামল বলতে কি বুঝায় ও তাদের প্রকৃতি কি সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে পরিচয় দিয়েছেন বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। আসলে যামলও কয়েকটি,—যেমন শ্রীযামল, বিষ্ণুযামল, শক্তিযামল, ব্রহ্মযামল, রুদ্রযামল। রুদ্রযামলের সূচনায় বলা হয়েছে—

> 'শ্রীযামলং মহাতন্ত্রং স্বতন্ত্রং বিষ্ণুযামলম্।
> শক্তিযামলমাখ্যাতং ব্রহ্মণবৃত্তিহেতুনা ॥
> ব্রহ্মযামলবেদাঙ্গং সর্বত্র কথিতং প্রিয়ে।
> ইদানীং উত্তরাকাণ্ডং বদ শ্রীরুদ্রযামলম্ ॥'

যামলগুলি বেদস্বরূপ বা বেদাভিত্তিক। বেদ যেমন ব্রাহ্মণাদি-শাস্ত্রের উৎস, তেমনি যামলগুলি থেকে আগম ও নিগমাদি সকল তন্ত্রের সৃষ্টি।

রুদ্রযামলে ষট্‌চক্রের বিশেষ পরিচয় আছে। চক্র শক্তিসাধকদের পূজাকালে চক্রাকারে উপবেশনপ্রণালী নয়, পঞ্চপাত্র বা নবপাত্রাদি গ্রহণের প্রস্তুতি নয়, চক্র মন্ত্রবর্ণাদির সংস্থান পূজামণ্ডলকে সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজন।

শিবমুখনিঃসৃত তন্ত্রগুলিকে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে সে'কথা বলেছি। আম্নায় অর্থে মুখ (face)। পরশুরামকল্পসূত্রে আছে: "ভগবান পরমশিব-ভট্টারকঃ শ্রুত্যাদ্যষ্টাদশবিদ্যাং সর্বানি দর্শনানি সংবিদ্ময্যা ভগবত্যা ভৈরব্যা স্বাত্মাভিন্নয়া পৃষ্টঃ পঞ্চভিমুখৈঃ পঞ্চাম্নায়াম পরমার্থসারভূতান্ প্রণিনায়," — অর্থাৎ শিব বা সদাশিবের পাঁচটি মুখ থেকে বিভিন্ন তন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই তন্ত্রগুলির নাম 'আগম'। পূর্বেই বলেছি, যে তন্ত্রগুলির বিকাশ হয়েছিল শক্তি বা পার্বতীর মুখ থেকে সে'গুলি নিগমের অন্তর্গত। সদাশিবের পাঁচটি মুখ: (১) সদ্যোজাত,—পূর্বমুখ। এই সদ্যোজাতমুখ দিয়ে যে সকল তন্ত্র ব্যাখ্যা (বা সৃষ্টি) করেছেন শিব তাদের নাম 'পূর্বাম্নায়', (২) দ্বিতীয় অঘোর,—দক্ষিণমুখ। অঘোর-মুখে শিব যে সকল তন্ত্র ব্যাখ্যা ও প্রকাশ করেছেন তাদের নাম 'দক্ষিণাম্নায়', (৩) তৃতীয় তৎপুরুষ—পশ্চিমমুখ। তৎপুরুষমুখ থেকে যে সকল তন্ত্র নিঃসৃত হয়েছিল তাদের নাম 'পশ্চিমাম্নায়'; (৪) চতুর্থ মুখের নাম বামদেব,— উত্তর মুখ। বামদেব থেকে যে' সকল তন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল তাদের নাম 'উত্তরাম্নায়'; (৫) ঈশান—ঊর্ধমুখ। ঈশান থেকে যে সকল তন্ত্রশাস্ত্র নিঃসৃত হযেছিল তাদের নাম 'ঊর্ধাম্নায়'। সঙ্গীতশাস্ত্রে বলা হয়েছে, ভৈরবাদি পাঁচটি রাগ শিবের পঞ্চমুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং নটনারায়ণরাগ পার্বতীর মুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য এটি পৌরাণিক-মত। শিবের পঞ্চমুখের মধ্যে ঊর্ধাম্নায় থেকে সৃষ্ট হয়েছে তন্ত্র। সে'জন্য তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালী শ্রেষ্ঠ ও কৌলগণের মুক্তিপ্রদ। 'শিবতন্ত্ররহস্য'-গ্রন্থে এই পাঁচটি মুখ বা আম্নায়ের বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে।

এবং কুলার্ণবতন্ত্রের তৃতীয় উল্লাসের ৭ শ্লোকে আছে—

মম পঞ্চমুখেভ্য পঞ্চাম্নাযাঃ সমুদ্‌গতাঃ।
পূর্বশ্চ পশ্চিমশ্চৈব দক্ষিণশ্চোত্তরস্তথা ॥
ঊর্ধাম্নায়শ্চ পঞ্চৈতে মোক্ষমার্গাঃ প্রকীর্তিতা।

ঊর্ধাম্নায় থেকে তন্ত্রশাস্ত্রের বিকাশ, সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্র মুক্তিপ্রদ।

॥ বিভিন্ন তান্ত্রিক-আচার ॥

সাধকের নিজের মনের ভাব-অনুযায়ী তন্ত্রসাধনায় বিভিন্ন প্রকার আচার, অনুষ্ঠান

ও রীতির কল্পনা করা হয়েছে। যদিও মানুষের মনের ভাব বা ধারণা সাধারণভাবে দিব্য, বীর ও পশু এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—'ভাবস্তু ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ দিব্যবীরপশু-ক্রমাৎ', তথাপি অধিকাংশ তন্ত্রশাস্ত্রে ও বিশেষ ক'রে কুলার্ণবতন্ত্রে সাতটি আচারের কথা আছে। সাতটি সাধারণ আচার—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। কারু কারু মতে, বৈষ্ণবাচার পশুভাবের অন্তর্গত।

পশুভাব মানুষের সাধারণ ও স্বাভাবিক ভাব। কারুর মতে, দক্ষিণ, বাম ও সিদ্ধান্ত আচার বীরভাবের অন্তর্গত। অবশ্য এই সম্পর্কে মতভেদ আছে। কৌলাচারীরা কৌল বা শক্তিসাধক। তাঁরা 'কুল' অর্থে কালী বা দক্ষিণাকালীর পূজায় ও আরাধনায় শিবশক্তিসামরস্যতত্ত্ব উপলব্ধি করেন। কৌলরা দিব্যস্বভাবসম্পন্ন ও জীবন্মুক্ত কুলাবধূত। তন্ত্রে বীরভাব অবশ্য শ্রেষ্ঠ ভাব। বীরাচার ও সিদ্ধান্তাচার অনেকের মতে বীরভাবের অন্তর্গত। টীকাকার লক্ষ্মীধরের অভিমতে, কুলাচারের শাখাই বামাচার, দক্ষিণাচার প্রভৃতি। এ'গুলি অবশ্য মতভেদ। তাছাড়া আছে সময়াচার। সময়াচারীরা আন্তরপূজা-ছাড়া বাহ্যপূজানুষ্ঠান করেন না। বাহ্যপূজাকে তাঁরা একান্তপক্ষে অধম ও নিকৃষ্ট ব'লে মনে করেন। তবে কুলাচার, বামাচার ও সময়াচার আবার ব্রাহ্মণ্য, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ এই তিন সাধনায় ব্যবহৃত হয়। রাধাতন্ত্র প্রভৃতি ও পাঞ্চরাত্রমতে লক্ষ্মীতন্ত্র প্রভৃতি বৈষ্ণবতন্ত্র। আচার সাধারণভাবে এজন্য আচরণ বিধি ও পদ্ধতি নামে কথিত।

॥ সাতটি সাধারণ আচার ॥

সাতটি তন্ত্রাচারের মধ্যে বেদাচার সাধারণ এবং পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি বিধির অনুসারী। দক্ষিণাচার বেদাচারের মতোই শাস্ত্রবিধিকে অনুসরণ করে, আর বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার বীরভাবের সাধকগণই বিশেষভাবে অনুসরণ করেন। বীরাচারে গুরু মন্ত্র, দেবতা, বর্ণ ও ধ্যান এই পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার হয়। বামাচারী সাধকরা পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার ও যোষিৎ নিয়ে সাধনা করেন। বীরাচার বা বীরমার্গ এজন্য পিচ্ছিল ও বিপজ্জনক। স্বামী বিবেকানন্দ এই বামমার্গী বীরাচারীদের সাধনার প্রতি কটাক্ষ করেছেন, কিন্তু তন্ত্রাচার, মন্ত্রসাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি নয়। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশ থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর শোভাবাজারে রাধাকান্তদেবের ঠাকুরবাড়ীতে 'বেদান্ত'-সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন (*Reply to Calcutta Address at Shobhābāzar*) তাতে তন্ত্রোক্ত বামাচারের বিরুদ্ধে বলেছিলেন : "Give up this filthy *Vāmāchāra* that

is killing your country, you have not seen the other parts of India……This *Vāmāchāra* sects are honey-combing our society in Bengal." শ্রীম তাঁর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ৫ম ভাগের ১৮৯ পৃষ্ঠায় এই বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত করেছেন। বামাচারের অপর নাম বীরাচার বা পঞ্চতত্ত্বের সাধনপ্রণালী। পূর্বে এই বামাচারের কথা আলোচনা কর্বেছি। বামাচার একমাত্র বাঙলাদেশের কয়েকটি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বামাচারের নিন্দা করেছেন। কিন্তু বামাচার বা বীরাচারই একমাত্র তন্ত্রাচার নয়। এজন্য সামগ্রীক-ভাবে তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রাচার ব'লে তন্ত্র ও তন্ত্রসাধনাকে নিন্দা করা উচিত নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদুষী ও সাধনসিদ্ধ ভৈরবী-ব্রাহ্মণীর সাহায্যে তন্ত্রসাধনা করেছিলেন দিব্য-সময়াচার-মতে। 'সময়াচার'-সম্পর্কে সৌন্দর্য বা আনন্দলহরীর টীকাকার লক্ষ্মীধর এবং পরশুরামকল্পসূত্রকার আচার্য পরশুরাম যে বিস্তৃত বিচার করেছেন সেই সম্বন্ধে আমরা পরে এ'গ্রন্থে আলোচনা কববো। তন্ত্রের সময়াচার 'back door' নয়। সময়াচারে মদ্য মাংসাদি পঞ্চতত্ত্ব বা বামাচার-সাধনা নিন্দনীয়। অবশ্য বামাচার সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচারে ব্যবহৃত পঞ্চতত্ত্বরূপ মদ্য, মাংস, মৎস্য প্রভৃতি পঞ্চ-উপচারের সাহায্যে সাধনার কথা বলা আছে, কিন্তু যথার্থ-সাধকেরা সেখানে মহাসংযত, বিচারী ও পরমলক্ষ্যের একান্ত অনুগামী হন, তাই তাঁদের পথচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে না। তন্ত্রসাধনার শক্তিই গুরু বা সাধনসিদ্ধ আচার্য। গুরু যদি শিষ্য বা সাধককে যথার্থপথে পরিচালিত করেন তবেই তন্ত্রসাধনায় লক্ষচ্যুতির আশঙ্কা থাকে না। গুরু শিষ্য বা সাধককে তখন দিব্যাচারে বা সময়াচারে পরিচালিত ক'রে তন্ত্র-সাধনার প্রকৃত লক্ষ্য শিবশক্তিসামরস্যানুভূতি লাভে সাহায্য করেন।

॥ তন্ত্রসাধনায় সময়াচার ॥

পূর্বে বলেছি সময়াচারের কথা। মহাসাধিকা যোগেশ্বরী-ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থে ৬৪-খানি তন্ত্রের সাধনায় পরিচালিত করেছিলেন 'সময়াচার'-অনুসারে। 'সময়াচার' দক্ষিণ-ভারতের কেরলীয়-সম্প্রদায়-নির্দিষ্ট 'ষোড়শী' বা 'শ্রীবিদ্যা'-সাধনায় আচরিত ও নির্দেশিত। শ্রীবিদ্যা, ললিতা, ত্রিপুরসুন্দরী ও ষোড়শী একই দেবতা বা মহাদেবী। মহাসাধিকা যোগেশ্বরী-ব্রাহ্মণী তন্ত্রের সকল রকম সম্প্রদায়ের সাধনায় পারদর্শিনী ছিলেন। মনে হয়, ফলহারিণী-কালিপূজার দিনে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে ষোড়শী বা ত্রিপুরসুন্দরীরূপে পূজার

রীতি ও নির্দেশ মহাসাধিকা ব্রাহ্মণীই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তন্ত্রসাধনায় সময়াচারের কথা উল্লেখ করেছেন।

সময়াচারের উল্লেখ কুলার্ণবতন্ত্রের ২য় উল্লাসের ৩৯ শ্লোকে থাকলেও পরশুরাম-রচিত 'পরশুরামকল্পসূত্রম্'-গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। আর উল্লিখিত আছে শঙ্করাচার্য-রচিত 'সৌন্দর্যলহরী'-স্তোত্রের উপর লক্ষ্মীধরের টীকায়। 'নিত্যোৎসব'[১]-গ্রন্থে সময়াচারমতে শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর পূজার ক্রম এবং বিধির উল্লেখ আছে। 'পরশুরামকল্পসূত্র' দক্ষিণী-সাধনাক্রমের গ্রন্থরূপে বিশেষ সমাদৃত। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তন্ত্রের দার্শনিকাংশ-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য পরশুরামকল্পসূত্র, শক্তিসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন (Vide, "Preparatory Notes to First Edition of ত্রিপুরারহস্যম্,—জ্ঞানখণ্ডম্ as embodied in the 2nd Edition, 1965, published by বারাণসী সংস্কৃত-বিশ্ববিদ্যালয়")।

দক্ষিণী-ভাষ্যকার পণ্ডিত ভাস্কর-রায় 'সৌভাগ্য-ভাস্কর'-গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, শ্রীবিদ্যার বা ষোড়শীর উপাসনায় তিনটি নির্দেশ ও অভিমতের উল্লেখ পাওয়া যায়,—সময়মত (সময়াচার), কৌলমত (কৌলাচার) ও মিশ্রমত (মিশ্রাচার)। আসলে সময়মতের অনুসরণকারীরা সাধনায় যে আচার গ্রহণ করেন তার নাম 'সময়াচার'। সৌন্দর্যলহরী-র টীকাকার শ্রীমৎ লক্ষ্মীধর বলেন যে, বেদপন্থীদের জন্য পরমেশ্বর-পশুপতি 'শুভাগমতন্ত্রপঞ্চক'-রচনা করেছিলেন। এই শুভাগমতন্ত্রপঞ্চকে বৈদিকমার্গ-অনুসারে তান্ত্রিক-অনুষ্ঠানসমূহ নিরূপিত হয়। 'শুভাগমপঞ্চক'-নির্দিষ্ট নিয়ম, মার্গ বা ধারা ও পদ্ধতি (তান্ত্রিক) প্রদর্শন ও অনুসরণ করেছেন বিদগ্ধ প্রাচীন আচার্যগণ—সনক, শুক, সনন্দন ও সনৎকুমার। এই পূর্বগদের নিয়ম, মার্গ বা পদ্ধতির নামই 'সময়াচার'।

সময়াচারী-তান্ত্রিক-সাধকেরা 'সময়া'-নাম্নী 'আনন্দভৈরবী' শক্তি ও 'সময়'-নামক 'আনন্দভৈরব'-শিবের মানসপূজা করেন সহস্রদলপদ্মে মস্তকে। 'সময়া'—শক্তি এবং 'সময়'—শিব। সহস্রদলপদ্ম আজ্ঞাচক্রের পরে মস্তকে সহস্রারে,—যখন কুণ্ডলিনী-শক্তি সহস্রদলপদ্মে পরমশিবের সঙ্গে সমরসে বা সমান-চৈতন্যরসে মিলিত হন তখনই চৈতন্যে চৈতন্যে (চৈতন্যময়-শিব ও চৈতন্যময়ী-শক্তির সঙ্গে) মিলিত

১। 'নিত্যোৎসব' পরশুরামকল্পসূত্রের পরিশিষ্ট ও পূজাক্রমবিধি।

হ'য়ে আনন্দময় অদ্বিতীয় ও অখণ্ড আকারে প্রতিষ্ঠিত হন। সময়াচারীরা বাহ্যপূজার পরিবর্তে আন্তরপূজার আচরণ করেন, কেননা সময়াচারী সাধকরা বলেন যে, আন্তরপূজা ও সহস্রারে আরতিই সময়াচার এবং বাহ্যপূজা ও আরতি কৌলাচার। কৌলাচার ও সময়াচারের মধ্যে পার্থক্য এখানে। কৌলাচার অপেক্ষা সময়াচার এ'জন্য শ্রেষ্ঠ ও প্রশংসনীয়। তবে কৌলাচারের মধ্যেও সময়াচারের কথা আছে, কিন্তু সময়াচারের অর্থ সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'কুল' অর্থে মহাশক্তি-কালী, কৌল-সাধকরা এজন্য দক্ষিণাকালীর উপাসক। তবে 'পরশুরামকল্পসূত্র'-তন্ত্রের বৃত্তিতে টীকাকার পণ্ডিত রামেশ্বর সময়াচারের অর্থ করেছেন 'কুলশাস্ত্র-প্রতিপাদিত উপাসকীয় ধর্ম —অর্থাৎ কুলশাস্ত্রনির্দিষ্ট তান্ত্রিক গুপ্ত- আচার। মোটকথা, কুলাচারনির্দিষ্ট ধর্মে ও সাধনায় কিছু বিধি-নিষেধাত্মক বন্ধন বা আদেশ থাকে, কিন্তু সময়াচারমতে তন্ত্রসাধনায় কোন বিধি-নিষেধের-নিয়ম থাকে না, তখন স্বেচ্ছাচার। স্বেচ্ছাচার বলতে শুদ্ধ ও পবিত্র মনে সাধনপদ্ধতির আচরণ মুক্তির জন্য। স্বেচ্ছাচাররূপ পরিশুদ্ধ আচার ও অনুষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য থাকে শিব-শক্তির ঐক্যবোধ ও সমরস তথা একরস-চৈতন্যরসের একাকার (সম) অবস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একেই বলেছেন 'জলে জল—একাকার'। 'জল' এখানে চৈতন্য বা মহাচৈতন্য।

সময়াচারের কথা আচার্য পরশুরাম পরশুরামকল্পসূত্রে উল্লেখ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন বাঙলার তথা চট্টগ্রামের সাধক সর্বানন্দ ঠাকুর তাঁর সর্বোল্লাসতন্ত্রে। আর উল্লেখ করেছেন শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনার প্রসঙ্গে।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁর 'তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগদর্শন' (১ম ভাগ, 1916)-গ্রন্থে সময়াচারকে 'সময়মার্গ' নামে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন: "এই সময়মার্গের পাঁচটি আগমের নাম বশিষ্ঠসংহিতা, সনক-সংহিতা, শুকসংহিতা, সনন্দনসংহিতা ও সনৎকুমার সংহিতা। এই মার্গটি (সময়াচার) বৈদিক। বশিষ্ঠাদি পাঁচটি মুনি ইহার প্রদর্শক। ইহা সময়াচার অবলম্বন করিয়া প্রবর্তিত। সৌন্দর্যলহরীর টীকাকার লক্ষ্মীধর বলেন যে, শঙ্করাচার্য স্বয়ং এই সময়াচারের অনুসরণ করিতেন। শুভাগমগুলি (বশিষ্ঠসংহিতাদি) শুদ্ধ-সময়মার্গের প্রতিপাদক। শুভাগমে ষোড়শীনিত্যার প্রতিপাদক মূলবিদ্যাতে অন্তর্ভাব স্বীকার করিয়া করা হইয়াছে। তাই ইহা অঙ্গরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু চতুঃষষ্টি বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত যে চন্দ্রজ্ঞানবিদ্যা তাহাতে ষোড়শীনিত্যার প্রাধান্য

প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেইজন্য ঐ মার্গ কৌলমার্গ।” কৌলমার্গও শ্রীবিদ্যার উপাসনায় ব্যবহৃত হয়। এ সম্বন্ধে শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি দ্রষ্টব্য।

॥ সময়াচার ও কৌলাচারের তুলনামূলক আলোচনা ॥

সময়াচার ও কৌলাচার-সম্বন্ধে সৌন্দর্যলহরী বা আনন্দলহরীস্তোত্রে পরমশ্রদ্ধেয় শঙ্করাচার্য উল্লেখ করেছেন : ‘সরস্বত্যা লক্ষ্ম্যা বিধিহরিসপত্নো বিহরতে…’প্রভৃতি। এই ১০০ সংখ্যক শ্লোকে সাঙ্কেতিকভাবে এবং টীকাকার সময়াচারী লক্ষ্মীধর বিস্তৃতভাবে শ্রীবিদ্যা-উপাসনায় যথার্থ-অভিপ্রায়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এ’সম্বন্ধে টীকাকার লক্ষ্মীধর বলেছেন : “কৌলাঃ উপাসত ইতি’,—যাঁরা কৌল বা কৌলাচারী শক্তিসাধক-অবধূত, তাঁরা সময়মত বা সময়াচার অবলম্বন ক’রে মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানচক্র ভেদ ক’রে মণিপুরপদ্মে প্রতিষ্ঠিত হন ও পরে যোগে স্বাধিষ্ঠানাদি-চক্র ভেদ ক’রে আজ্ঞাচক্রে শ্রীবিদ্যার বা মহাত্রিপুরসুন্দরীর ধ্যান করেন। পরে ধীরে ধীরে সহস্রারে পরমশিবে তাঁরা মিলিত হন : “সময়সিদ্ধান্তরহস্যত্বেন কৌলসিদ্ধান্তরহস্যত্বেন…” প্রভৃতি। শ্রীমৎ লক্ষ্মীধর এর টীকায় বলেছেন : “ষট্‌চক্রভেদশিক্ষার্থী সময়াচারীর প্রাথমিক সেবা মূলাধার, কিন্তু তাঁর প্রকৃত ভজনস্থান ও উপাসনাস্থান সহস্রারদল-কমল,—যেখানে অবস্থিত চন্দ্রমণ্ডল ও তার মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবী শ্রীবিদ্যা, ষোড়শী বা ত্রিপুরসুন্দরী বিরাজিতা। এস্থানে শিব-শক্তি মিলিত হ’য়ে একই আসনে ও একই আধারে অবস্থিত। তাই সময়াচারী উচ্চস্তরের সাধক। সৌন্দর্যলহরীর রচয়িতা আচার্য শঙ্করও মনে হয় সময়াচারকে অবলম্বন ক’রে শ্রীচক্রে শ্রীবিদ্যার সাধনা করেছিলেন[২] নচেৎ তাঁর পক্ষে এই তন্ত্রযোগরহস্য ভেদ করা অসম্ভব।

॥ সময়াচারীদের পক্ষে চক্র বা যন্ত্র, মন্ত্র ও কলা ॥

সৌন্দর্যলহরী বা আনন্দলহরীর ৩২ সংখ্যক স্তোত্রে উল্লিখিত মূলাধারাদি ছ’টি চক্র যেমন খণ্ডত্রয়ে বিভক্ত, শ্রীচক্র ও শ্রীচক্রের মন্ত্র তেমনি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। এই তিনটি খণ্ড শ্রীবিদ্যারই অবিভক্ত অংশ। এ’জন্য শ্রীচক্রের ত্রিকোণ মূলাধারচক্ররূপে, অষ্টকোণ স্বাধিষ্ঠানচক্ররূপে, প্রথম দশার বা দশকোণ মণিপুররূপে, দ্বিতীয়দশার অনাহতরূপে, তৃতীয়দশার বিশুদ্ধচক্ররূপে, চতুর্দশার শিবচক্রচতুষ্টয় আজ্ঞারূপে এবং

২। কথিত কালাডি-মন্দিরে শ্রীচক্র রক্ষিত আছে এবং আচার্য শঙ্কর সেই শ্রীচক্রের পূজা করতেন।

বিন্দুস্থান চতুরস্র-সহস্রচক্ররূপে ধ্যেয়। এখানে ষট্‌চক্র ও নবযোনিচক্রের মধ্যে কোন-কিছু ভেদ বা পার্থক্য নাই।[৩]

॥ সময়াচারীর মতে কর্তব্য ও সময়াচারী কারা ॥

সময়াচারীর অভিমত ও উপাসনা অন্যান্য সাধক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সময়াচারীর পক্ষে আন্তর-উপাসনাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বা প্রধান উপাসনা সে'কথা বলেছি। বাহ্যপূজা সময়াচারীদের একেবারে কাম্য নয়। সময়াচারীদের মতে, সাধকের দেহমধ্যস্থ মূলাধারাদি ষট্‌চক্রই অথবা শ্রীযন্ত্রের তথা শ্রীবিদ্যার ত্রিকোণাদি নবচক্রই যোগের ষট্‌চক্র, কেননা ত্রিকোণাদি চক্রই মূলাধারাদি চক্ররূপে পরিণত। মস্তকাস্থিত সহস্রদলপদ্মের অন্তর্গত চতুষ্কোণ-চন্দ্রমণ্ডলই বিন্দুস্থান। ঐ বিন্দুস্থানই আগমশাস্ত্রে 'সুধাবিন্দু' ও বেদে 'সরঘা' নামে প্রসিদ্ধ। সময়াচারিগণ ঐ সুধাবিন্দুতে সময় ও সময়ার—শিব ও শক্তির ঐক্যানুসন্ধানরূপ মানসিক পূজা (অর্চনা) করেন। "সমং সাম্যং (ঐক্যং) প্রাপ্তম্" হন—এইঅর্থে 'সময়া'-পদ নিষ্পন্ন। তাছাড়া শিবের সাম্যপ্রাপ্তাশক্তিই 'সময়া' নামে ও শক্তির সাম্যপ্রাপ্ত শিবই 'সময়' নামে অভিহিত (অর্থাৎ সময়া = শক্তি এবং সময় = শিব)। এই সময় ও সময়ার (শিব ও শক্তির) উপাসনাই সময়াচারীর উপাসনা নামে কথিত এবং এ'দের সাধনপদ্ধতির নাম সময়মার্গ।

সময়াচারীদের মতে, শিব ও শক্তির সাম্য বা ঐক্য পাঁচ প্রকারের—অধিষ্ঠান-সাম্য, অবস্থা-সাম্য, অনুষ্ঠান-সাম্য, স্বর-সাম্য ও নাম সাম্য। প্রতিটি চক্রেই এই পাঁচটি সাম্য অবস্থিত। এই পাঁচটি সাম্যের বা ঐক্যের অর্থ তিন প্রকার—

(১) 'তবাধারে মূলে',—আধারচক্রে শিব-শক্তির অধিষ্ঠান-সাম্য, কারণ আধারচক্র উভয়ের অধিষ্ঠান।

(২) 'লাস্য-পরয়া',—শিবের তাণ্ডব ও শক্তির লাস্য—এই দুটি সাম্য বা ঐক্য = অবস্থা-সাম্য।

(৩) 'নবাত্মানম্',—শিব-শক্তির রূপ-সাম্য এবং নাম-সাম্যও সাধিত হয়। সময়াচারীদের পক্ষে এটি অবশ্য-কর্তব্য নয়।

এখানে মনে রাখ্‌তে হবে, আচার্য শঙ্কর ও টীকাকার লক্ষ্মীধর শ্রীচক্রের উপাসনার ক্ষেত্রে সময়াচারী-সাধকদের কোন্‌টি (কোন্ সাধন) করণীয় ও কোন্ সাধন করণীয় নয়, সে'কথাই বলেছেন।

৩। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাজযোগোক্ত ষট্‌চক্র এবং শ্রীবিদ্যার শ্রীচক্র বা নবচক্রের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। পরে এ'সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সৌন্দর্যলহরীর টীকাকার শ্রীমৎ লক্ষ্মীধর শ্রীচক্রসাধনরূপ ভাবনায় ও কর্মে মুক্তি অর্থে বলেছেন—'ষট্‌কমলভেদমতে সুখস্বরূপৈব মুক্তিঃ'। সুখ ও আনন্দ এককথা। সুখ লৌকিক ও অলৌকিক=পারমার্থিক। এ জন্য শাক্তমতে বলা হয়েছে ঃ "অত্যন্ত-দুঃখোচ্ছেদানন্তরং সাজুয্যসংসিদ্ধৌ শিবশক্তিসম্পুটান্তর্ভাবাৎ তাদাত্মকৈব মুক্তিঃ"।

পূর্বে নাদ ও বিন্দুর ঐক্যের বা সাম্যের কথা বলেছি। এই 'সাম্য' সার্থক হয় নাদ ও বিন্দুর,--শক্তি ও শিবের ঐক্যসাধনে। শ্রীবিদ্যার উপাসনায় ত্রিপুরেশ্বরীদেবী এবং কালীসাধনায দক্ষিণাকালিকা। ত্রিপুরসুন্দরীর মূলমন্ত্রটি ত্রিকুট,—যাতে পঞ্চদশ অক্ষর বর্তমান এবং 'কলা' সেই সেই অক্ষরস্বরূপা (=পঞ্চদশ কলা)। পঞ্চদশ অক্ষর পুনরায় তিনটি -তে বিভক্ত। সেই খণ্ডত্রয় চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি। চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি পুনরায় ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি নামে পরিচিত। এই গ্রন্থিগুলিব মধ্যে নিহিত তিনটি মায়াবীজ,—অর্থাৎ ঐ তিনটি গ্রন্থিই মায়াবীজস্বরূপ। ঐ মায়াবীজত্রয়ই পুনরায় দেবী ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র। ঐ বীজ ত্রিপুরসুন্দরীর মূলমন্ত্রের অন্তর্গত। মূলমন্ত্রও শ্রীবিদ্যাযন্ত্রের নবচক্রের সঙ্গে জড়িত ও অভিন্ন। ঐ নবচক্র পুনরায় দেহমধ্যস্থ ষট্‌চক্র, তিন গ্রন্থি (ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি), এবং সহস্রদলপদ্মের সঙ্গে এক ও অভিন্ন। এইভাবে শ্রীচক্রের ধ্যানে তাদাত্ম্যধ্যানেব প্রয়োগ হয়। এই তাদাত্ম্যধ্যানের নামই কলা ও নাদের—শিব ও শক্তির ঐক্যসাধনা -- যার সাহায্যে সামরসসত্তার জ্ঞান ও মুক্তি হয়। শাক্তমতে এর নাম অদ্বৈতজ্ঞান। এই অদ্বৈতজ্ঞানে জীব, ঈশ্বর ও সর্বক্ষেত্রজ্ঞ পবমাত্মার ঐক্যসাধন। এ'সম্বন্ধে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

॥ শ্রীবিদ্যাসাধনায় কুণ্ডলিনী-জাগরণ ॥

আগমরহস্যেব অভিমতে, মানুষেব মেরুদণ্ডেব দু পাশে ঈড়া ও পিঙ্গলা-নাড়ী ও মধ্যে সুষুম্নানাড়ী। ঈড়া ও পিঙ্গলা বেদের দেবযান ও পিতৃযান। সূর্য ও চন্দ্র দেবযান ও পিতৃযানরূপ ঈড়া ও পিঙ্গলা-দ্বারা জীব অহোরাত্র বিচরণ করে যখন ঐ চন্দ্র-সূর্যের মিলন হয় আধারচক্রে তখনই অমাবস্যাতিথি। অমাবস্যাই কুণ্ডলিনীর স্বপ্নাবস্থা। কৃষ্ণপক্ষের যাবতীয় তিথি এই অমাবস্যার অন্তর্গত। এই কৃষ্ণপক্ষই কুণ্ডলিনীশক্তির আধারচক্রে স্থিতি ও শয়নকাল। এরইজন্য মূলাধার অন্ধতামিস্রলোক নামে প্রসিদ্ধ। সূর্যকিরণের সম্পর্ক থাকায় স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর মিশ্রলোক নামে পরিচিত। অনাহতচক্র জ্যোতির্লোক এবং সহস্রদলকমল জ্যোৎস্নাময় লোক। সহস্রদলকমলের মধ্যে চন্দ্রবিম্বই শ্রীচক্র। এ'টি সম্পূর্ণ অধ্যাত্মদৃষ্টিব কথা এবং সময়াচারী সাধকদের পক্ষে বিহিত।

আগমরহস্যের মর্মকথা হোল, সমাহিতচিত্ত সময়াচারী যোগসাধকের যোগমহিমায় চন্দ্র চন্দ্রস্থানে ও সূর্য সূর্যস্থানে বায়ুদ্বারা যখন নিরুদ্ধ হয় তখনই স্বাধিষ্ঠানচক্রে বহ্নিদ্বারা শুষ্কপ্রায় অমৃতকুণ্ডে কুণ্ডলিনী আহার ও পুষ্টি না পেয়ে জাগ্রত হয় এবং সর্পের ন্যায় ফুৎকার করতে করতে গ্রন্থিত্রয় ভেদ করে জ্যোৎস্নাময় লোক সহস্রদলকমলে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হয়। এ'থেকেই শুক্লপক্ষের সৃষ্টি। এ জন্য শুক্লপক্ষে, কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ হয়, কৃষ্ণপক্ষে হয় না।

সময়াচারীরা ত্রিপুরসুন্দরীর সাধনকালে যন্ত্র, কলা ও মন্ত্রকে এবং পক্ষান্তরে মন্ত্র ও যন্ত্রকে এক ও অভেদরূপে চিন্তা করেন। কামকলাবিদ্যায় কথিত ঃ—'স্পষ্টা পশ্যন্ত্যাখ্যা ত্রিমাতৃকা চক্রতাং যাতা'। এদের মধ্যে চন্দ্রের ১৬ কলা, সূর্যের ২৪ কলা ও অগ্নির ১০ কলার সমষ্টি ৫০ কলাই পঞ্চদশ (৫০) বর্ণ। বর্ণই মাতৃকা। মাতৃকাবর্ণের অনুলোম ও বিলোম আছে। মাতৃকাসাধনেও মন্ত্র ও যন্ত্রের ঐক্যসাধন হয় এবং কলা, মন্ত্র ও যন্ত্রের ঐক্যসাধন তান্ত্রিক-সাধনার উদ্দেশ্য। টীকাকার লক্ষ্মীধর এই আগমরহস্যের ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীযন্ত্রের এই নাদ ও বিন্দুর সাধনা সিদ্ধগুরুর সাহায্যসাপেক্ষ, কেবলই গ্রন্থ বা শাস্ত্রপাঠে সার্থক হয় না। পরমরহস্যময় এই আগমরহস্য। এ জন্য আগম বা তন্ত্রশাস্ত্রকে 'গুপ্তকুলবধূরিব' বলে। দেবী কালিকার উপাসনায় ষট্‌চক্র ও দেবী শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনায় নবচক্রের সাধনার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে কিন্তু উভয়ের চরমসিদ্ধান্ত এক ও অভিন্ন।

॥ ত্রিপুরা বা ত্রিপুরসুন্দরীর মন্ত্র ও তত্ত্ব ॥

ত্রিপুরসুন্দরীর পঞ্চদশাক্ষরী (১৫টি অক্ষর) তিনখণ্ডে বিভক্ত ঃ (১) শিব (ক), শক্তি (এ), কাম (ঈ) ও ক্ষিতি (ল)=এই চারটি বর্ণ প্রথম-আগ্নেয়খণ্ড। রবি (হ), শীতকিরণ (স), স্মর (ক), হংস (হ), ও শক্র (ল)=এই পাঁচটি বর্ণ দ্বিতীয়-সৌরখণ্ড। এই আগ্নেয় ও সৌরখণ্ডের মধ্যে রুদ্রগ্রন্থিস্থানীয় হৃল্লেখবীজ (হ্রীং) নিহিত। পরা (স), মার (ক) হরি (ল)=তিনটি বর্ণ তৃতীয়-সৌম্যখণ্ড। সৌম্যখণ্ড ও সৌরখণ্ডের মধ্যে বিষ্ণুগ্রন্থিস্থানীয় ভুবনেশ্বরী-বীজ (হ্রীং)। চতুর্থ একাক্ষর চন্দ্রকলাখণ্ড,—যা সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানী গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য। সৌম্যখণ্ড ও চন্দ্রকলাখণ্ডের মধ্যে প্রথম খণ্ড অগ্নি, দ্বিতীয় খণ্ড সূর্য ও তৃতীয় খণ্ড সোমস্বরূপ। এই সোম+সূর্য+অগ্নি অবস্থাভেদে জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি,- জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুসুপ্তি—বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ (বেদান্তের)।

॥ সময়াচারী শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সময়াচার অনুসরণ ক'রে তন্ত্রসাধনা করেছিলেন সিদ্ধ-সাধিকা ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নির্দেশে। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ স্পষ্টভাবে সে'কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তন্ত্রসাধানার আলোচনাপ্রসঙ্গে। তাছাড়া মহাশক্তিময়ী সারদাদেবীকে অমাবস্যায় ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে ষোড়শী বা মহাত্রিপুরসুন্দরী-জ্ঞানেই যথাবিধি-অনুসারে পূজা করেছিলেন 'স্ত্রীজাতিই সমগ্রজগতে মহাশক্তি'—এই তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য।

সময়াচার ও কুলাচার প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ ও যথার্থ-আচার শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনার সময়ে তাই দেখি যে, পঞ্চতত্ত্বের অন্যতমতত্ত্ব কারণকে (মদ্যকে) শ্রীরামকৃষ্ণের শুধু স্পর্শ করা বা কারণের নাম শোনামাত্র সমাধিতে মহাকরণ-পরমচৈতন্য-শিবে বা ব্রহ্মে নিমগ্ন হয়েছিলেন। বিশ্বের নারীমাত্রেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিশ্বপ্রসবিনী ও বিশ্বপালিনী মহামায়া-মহাশক্তি-জগন্মাতা। 'সৌন্দর্যলহরী'-স্তোত্রের ব্যাখ্যায় সময়াচারী শ্রীমল্লক্ষ্মীধরও সময়াচারের দৃষ্টিতে ষোড়শীদেবী মহাকালির মহিমা এ'ভাবে বর্ণনা করেছেন।

॥ তন্ত্রে তত্ত্ববিশ্লেষণ ॥

মহারাজ নন্দকুমার রায়ের একটি গানে আছে—

'শ্রীনন্দকুমার কয় তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়
তব তত্ত্ব গুণত্রয় কাকীমুখ-আচ্ছাদিনী।

গানটিতে বলা হয়েছে বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণতত্ত্ব—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—তিন গুণ। এই গুণত্রয়কেই (সাম্যকেই) সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতি বলা হয়েছে : "গুণত্রয়ানাং সাম্যঃ প্রকৃতিঃ"। প্রকৃতির কার্যই আবৃত করা,—অর্থাৎ অজ্ঞানে আবৃত ক'রে মায়ার অন্ধকারে মানুষকে সংসারে আবৃত ও বন্ধন করা। প্রকৃতির আর-এক নাম তাই মায়া। সাধক নন্দকুমার মূলাধারাদি ছ'টি চক্র ভেদ ক'রে সঙ্গীতের ভৈরবাদি ছ'টি মূলরাগের প্রসঙ্গে তত্ত্বময়ী-মহামায়া-প্রকৃতি তথা তিনগুণান্বিত মায়া যে মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে সে'কথাই বলেছেন। তত্ত্বত্রয় বা তিনগুণান্বিতা মায়ার অতীত হ'তে পারে না সে'জন্য মানুষ। সুতরাং মহাশক্তিময়ী কুণ্ডলিনীশক্তি আজ্ঞাচক্র ভেদ ক'রে সহস্রারচক্রস্থিত জ্ঞানময় ও আনন্দময় পরমশিবের সঙ্গে সামরস্যরসে একীভূত হ'তে পারে না, ফলে তত্ত্বাতীততত্ত্ব মুক্তিকে লাভ ক'রে জন্মমৃত্যুরূপ

সংসারপ্রবাহের অতীত হ'তে পারে না, মায়ার সংসারেই বরং আবদ্ধ থাকে সাধারণ মানুষ। মহারাজ নন্দকুমারের গানটির কিছু অংশ যথা—

'ভুবন ভুবাইলি মা ভবমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য বিনোদিনী ॥

* * * *

মহামায়া মোহপাশে বদ্ধ করো অনায়াসে,
তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী।
শ্রীনন্দকুমারে কয় তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়
তব তত্ত্বগুণত্রয় কাকীমুখ-আচ্ছাদিনী ॥'

'সৌদামিনী' চিরসমুজ্জ্বল বিদ্যুৎলতাকারা কুলকুণ্ডলিনী। 'কুল' অর্থে কালী ও কুণ্ডলিনী উভয়ই। মূলাধাররূপ চতুর্দলপদ্ম মহাশক্তি কুণ্ডলিনীর স্থান। ঐ শক্তি আধারপদ্মে সুপ্তা, অর্থাৎ মূলাধারে নিদ্রিতা, পরমশিবের সঙ্গে সামরস্যে মিলিত হওয়ার জন্য জাগ্রত নয়, কারণ সত্ত্ব, রজঃ তমঃ গুণতিনটি কাকীমুখ ব্রহ্মদ্বার বা শিরদ্বার মায়ার আবরণে আচ্ছাদিত ক'রে রাখে। সুপ্তা কুণ্ডলিনীশক্তিই মায়াবদ্ধ জীব, কুণ্ডলিনীর জাগরণে মহাশিবের সঙ্গে মিলনে শিব। শোনা যায়, মহারাজ নন্দকুমার তান্ত্রিক-সাধক ছিলেন। তাঁর গানটিও তত্ত্বমুখী। তাই তন্ত্রালোচনা বা তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে গানটির উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক,—যদিও গানে উল্লিখিত তত্ত্বত্রয় ও তান্ত্রিক-সাধনায় উল্লিখিত বিদ্যাতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্ব এবং তাদের অর্থ এক নয়, কিন্তু ভাবের উদ্বোধন ও জীবনতত্ত্বসমাধানের সহায়ক। মনে রাখতে হবে যে, তন্ত্রসাধনায় কুণ্ডলিনীশক্তিই একমাত্র আশ্রয় ও সাধনার বস্তু।

॥ তন্ত্রে বিভিন্নভাবে তত্ত্বসাধনার কথা ॥

তন্ত্রসাধনা ক্রিয়ামূলক বা অনুষ্ঠানমূলক, আবার রূপাশ্রয়ী ও ভাবাশ্রয়ী। তন্ত্রসাধনায় ছত্রিশটি তত্ত্বের সঙ্গে সাধকের পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। পরশুরাম-কল্পসূত্রে (১।৪) আছে : 'ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বানি বিশ্বম্'' । শিব, শক্তি, সদাশিব, বিদ্যা, মায়া, অবিদ্যা, কলা, রাগ, কাল, নিয়তি, জীব বা পুরুষ, প্রকৃতি, মন প্রভৃতি ছত্রিশটি তত্ত্ব। (১) শিবতত্ত্বে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপিণী শক্তির পরিচয় দেওয়া আছে। ইচ্ছাশক্তিরূপ উপাধিযুক্ত শিব বা সদাশিবই 'শিবতত্ত্ব'। (২) শক্তিতত্ত্ব সৃষ্টির ইচ্ছারূপা শক্তি। (৩) এ ভাবে বিশ্বচরাচরের সঙ্গে যে শক্তি অভিন্নভাবে

সংশ্লিষ্ট তার নাম 'সদাশিবতত্ত্ব'। বাকী তত্ত্বগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে শক্তি, অর্থাৎ বিমর্শশক্তির কার্য ও প্রকাশ-অনুযায়ী।

দাক্ষিণী আচার্য ভাস্কর-রায় বলেছেন, ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বকে আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব ও তুরীয়তত্ত্ব বলে—

'মায়ান্তমাত্মতত্ত্বং বিদ্যাতত্ত্বং সদাশিবান্তং স্যাৎ।
শক্তিশিবৌ শিবতত্ত্বং তুরীয়তত্ত্বং সমষ্টিরেতেষাম্॥

ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্ব[৪] শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, বিদ্যা, মায়া, কলা, অবিদ্যা, রাগ, কাল, নিয়তি, পুরুষ, প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত।

তাছাড়া 'যোগিনীহৃদয়তন্ত্রে' শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে—

১। 'শক্তিতত্ত্বাত্মিকাং দেবীং
প্রসুপ্তভুজগাকৃতিম্।
শক্তিতত্ত্বং সমাখ্যাতং
ভুবনৈরাশ্রিতং মহৎ॥'

২। 'শম্ভুঃ শিবতত্ত্বং শক্তিতত্ত্বোপরি স্থিতম্।'
কিংবা—
'শক্তিতত্ত্বং সমাখ্যাতং শিবতত্ত্বং তদূর্ধ্বতঃ॥

তাছাড়া আছে—'তত্ত্বাতীততত্ত্ব' 'বাঙ্‌মনোতীত-অগোচরম্‌তত্ত্বা।'

তন্ত্রোক্ত ঐ ৩৬ তত্ত্বসমষ্টিই বিশ্ববৈচিত্র্য। তার মধ্যে শিব প্রকাশ বা অগ্নি এবং শক্তি বিমর্শ বা চন্দ্র। কামকলা বা কুণ্ডলিনী অবিচ্ছুরিত-শক্তি। পরা প্রথম তত্ত্ব, পশ্যন্তী দ্বিতীয়—বিচ্ছুরিত কুণ্ডলিনীর রূপ, মধ্যমা তৃতীয় এবং বৈখরী চতুর্থ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। উপনিষদে পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমাকে অমৃতরূপ স্বর্গলোকে অবস্থিত বলে।

দেবী ত্রিপুরা বা ত্রিপুরসুন্দরীই ষোড়শী, ললিতা ও শ্রীবিদ্যা। উত্তর-ভারতে কালী বা দক্ষিণাকালী এবং দক্ষিণ-ভারতে শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরসুন্দরী। দেবী ত্রিপুরার বা ত্রিপুরসুন্দরীর কৃপা ও অনুগ্রহরূপ শক্তিপাত-ছাড়া তন্ত্রসাধনায় সামরস্য মুক্তি লাভ করা অসম্ভব—বলে দাক্ষিণী বা দাক্ষিণদেশীয় কেরলীয়-তন্ত্র। বঙ্গদেশীয় তন্ত্রে দেবী কালিকা বা দক্ষিণকালীকার কৃপাছাড়া শিব-শক্তির সামরস্যরূপ মুক্তি লাভ হয় না। সামরস্যতত্ত্বে শিব ও শক্তি উভয়েই চরম ও পরম চৈতন্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন সদানন্দময় ও সদানন্দময়ী, শিব ও শক্তি,—সদানন্দময় ও সদানন্দময়ী,—সময় ও

৪। তন্ত্রশাস্ত্রে চতুর্বিংশতি বা ২৪ তত্ত্বের উল্লেখ আছে।

সময়া। এই সময় ও সময়া অথবা শিব ও শক্তি অবিনাভাবসম্বন্ধে চনকাকারে (কলাইয়ের একীকৃত দু'ভাগের) মতো এক ও অখণ্ড। এই নিত্য-চিন্ময়-অধিকারী-তত্ত্বের নাম মহাতত্ত্ব। এই মহাতত্ত্বের আস্বাদনেই সাধকের অজ্ঞানপাশমুক্ত মোক্ষ। তন্ত্রশাস্ত্রে এটিই সাধনার চরমকথা।

॥ পূর্বোক্ত তত্ত্বচতুষ্টয়ের মর্মকথা ॥

আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব তিনটি তত্ত্বের উচ্চারণ ক'রে উপাসনা ছাড়া প্রায় সকল দেবতার তান্ত্রিক-পূজা-উপাসনায় আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। তাছাড়া আর একটি চতুর্থ তুরীয়তত্ত্বের প্রয়োগ আছে,- 'তুরীয়তত্ত্বায় স্বাহা'।

অদ্বৈতবেদান্তের আলোচনায় আমরা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিনটি অবস্থার পরিচয় পাই। আচার্য গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য-উপনিষদের উপর 'কারিকা' রচনা ক'রেছেন এবং এই তিন অবস্থার উপরে তুরীয়াবস্থার পরিচয় দিয়েছেন। মাণ্ডুক্য-উপনিষদের ৮ম মন্ত্রে ওঙ্কারের চারটি পাদ বা মাত্রার পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে : ''সোঽয়-মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রাশ্চ পাদা অকার-উকার-মকার ইতি,'' এই অকার উকার-মকারই জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এবং সুষুপ্তির পারে তুরীয় বা চতুর্থ অনাময় পদাতীত পদ—আত্মা বা ব্রহ্ম তথা বৃহৎ-সর্বগত চৈতন্য। এই All-pervading সর্বগত চৈতন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টিভেদে দু'রকম,—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। তুরীয় অবস্থাকে জীবন্মুক্ত অবস্থাও বলে। গীতায় এই চতুর্থ অবস্থাকে স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা বলা হয়েছে। এই চতুর্থ অবস্থাকে গীতার ২।৭২ শ্লোকে ব্রাহ্মীস্থিতি এবং তন্ত্রে শিবশক্তির সামরস্যাবস্থা বলা হয়েছে। এরই নাম ব্রহ্মনির্বাণ ও মুক্তি।

তন্ত্রে ৩৬টি তত্ত্ব বা পদার্থের কথা বলা হয়েছে। তন্ত্রে এই ৩৬টি তত্ত্বকে আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব ও তুরীয়তত্ত্ব বলা হয়েছে চারটি ভাগে ভাগ ক'রে। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ বা ক্ষিতি, অপঃ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতিকে স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতমরূপে চিন্তা করা হয়। এগুলি থেকে বাহ্য-ইন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ভেদে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির সৃষ্টি। তন্ত্রে পঞ্চতত্ত্ব আচারে, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ তথা মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার—এই হোল ভূত বা পদার্থ—সৃষ্টির ক্রমানুসারে।

॥ শিবতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব প্রভৃতির পরিচয় ॥

(১) প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছাশক্তিরূপ উপাধিবিশিষ্ট পরমশিবই 'শিবতত্ত্ব'। এই শিব বা শিবতত্ত্বই তত্ত্বের মধ্যে প্রথম। (২) তারপর 'শক্তিতত্ত্ব' পরমশিবের ইচ্ছাশক্তি। (৩) 'সদাশিবতত্ত্ব', সমগ্র বিশ্বকে যিনি 'অহং' ব'লে মনে করেন তিনিই সদাশিব। সদাশিবেরই অহন্তা, পরাহন্তা বা পূর্ণহন্তা। (৪) 'ঈশ্বরতত্ত্ব' অর্থাৎ বিশ্বকে যিনি 'ইদং' ব'লে মনে করেন। (৫) বিদ্যাতত্ত্ব বা অহন্তা ও ইদন্তা এই উভয় ভাবের ঐক্যপ্রতিপত্তি। ঐক্যপ্রতিপত্তি বল্‌তে বোঝায় 'জগৎ বা বিশ্ব আমিই' ইত্যাকার যে সদাশিবে বৃত্তি*, তার নাম বিদ্যা। (৬) 'মায়াতত্ত্ব' অর্থাৎ 'ইদং জগৎ'—এই জগৎ আমা থেকে ভিন্ন এ'ধরণের ঈশ্বরের বৃত্তির নাম মায়া। (৭) 'অবিদ্যাতত্ত্ব'—বিদ্যাবিরোধিনী আচ্ছাদিনীশক্তি। (৮) 'কলাতত্ত্ব' শিবের সর্বকর্তৃত্বশক্তি সঙ্কুচিত হয়ে আংশিক-কর্তৃত্বরূপে জীবে অবস্থান করে। (৯) 'রাগতত্ত্ব'। (১০) 'কালতত্ত্ব'। 'কালতত্ত্ব'—ধ্বংসকারিণী শক্তি,—অস্তি, জায়তে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি প্রভৃতি শক্তি। (১১) নিয়তি (১২) 'জীবতত্ত্ব'—পুরুষই নিয়তি, কাল, রাগ, কলা ও অবিদ্যার আশ্রয়। (১৩) 'প্রকৃতিতত্ত্ব'। (১৪) 'মনস্তত্ত্ব'। (১৫) 'বুদ্ধিতত্ত্ব'। (১৬) অহংকারতত্ত্ব। (১৭-২১)। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ। (২২—২৬)। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পদ প্রভৃতি,—যার সম্বন্ধে পূর্বে বলেছি। (২৭—৩১)। পঞ্চসূক্ষ্মভূত, বা বিষয়,—শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি তত্ত্ব। (৩২—৩৬)। পঞ্চমহাভূত বা স্থূলভূত বা পদার্থ,—আকাশ, বায়ু প্রভৃতি তত্ত্ব। মহাভারতে চতুর্বিংশতিতত্ত্ব বলা হয়েছে। পরশুরামকল্পসূত্রে (১।৪) 'ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বানি বিশ্বম্'-সূত্রের পূর্বে আলোচনা করা হ'ল।

ভিন্নমতে ২৪টি তত্ত্ব ৩৬-এর পরিবর্তে। পরমানন্দ তন্ত্র ও স্কন্দপুরাণের কথাও তাই। 'তত্ত্ব'-শব্দের অর্থ 'তৎ'-এর যে ভাব বা ধর্ম তাই 'তৎ'। 'তৎ'-বলতে যে সত্তা সমগ্র বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত ক'রে থাকে—তাই। ঈশোপনিষদে 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—শ্লোকাংশের অর্থ ব্রহ্ম বা পরমশিব। এই ব্রহ্ম বা পরমশিবই তত্ত্ব,—আবার তত্ত্বাতীত-তত্ত্ব। শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব, শক্তি ও শিব এই পাঁচটি তত্ত্বের অসাধারণ-ধর্ম এবং কেবল প্রকাশকত্ব ও স্বয়ংজ্যোতিস্মান্ এবং ব্রহ্মতত্ত্ব বা শিবতত্ত্বের অন্তর্গত। বেদান্তে 'তত্ত্বমসি' তথা 'তৎ + ত্বং + অসি'—জীবই ব্রহ্ম। তন্ত্রে শক্তিই শিব। পরমশিব বা শিবকে দু'ভাবে চিন্তা করা হয়ঃ

* । বৃত্তির অর্থ কার্য।

এক,—সদাশিব (নির্গুণ) ও আর এক—মহাকাল (সগুণ)। কথাও তাই যে, নাদানুসন্ধান বা ষট্‌চক্রসাধনায মূলাধার থেকে কামকলা বা কুণ্ডলিনী যখন মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান অনাহত মণিপুর, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা প্রভৃতি চক্রগুলিকে ভেদ ক'রে সহস্রারে পরমশিবের সঙ্গে একরসে মিলিত হয় তখনই শক্তি শিব বা ব্রহ্ম। এ'টী তন্ত্রের কথা, আর অদ্বৈতবেদান্তের কথা—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা, কিংবা কেবলমাত্র বিচারস্বভাবসম্পন্ন শ্রবণের দ্বারা অজ্ঞান অপসারিত হ'লেই ব্রহ্মস্বরূপের প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি হয়। বেদান্ত ও তন্ত্রের পরমলক্ষ্য এক, কেবল সাধনায় পার্থক্য।

॥ তন্ত্রে তত্ত্বসাধনা ॥

তন্ত্রে তত্ত্বসাধনাই প্রধান। গৌড়বঙ্গদেশ বা বাঙলাদেশীয়-তন্ত্রের তত্ত্ব ও কাশ্মীরীয়-তত্ত্বসাধনার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। বঙ্গদেশীয়তন্ত্রে প্রধানত আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের সাধনারই প্রচলন আছে। কিন্তু এই তিনটি তত্ত্বের মধ্যে আরও সহায়ক-কতকগুলি তত্ত্বের অন্তর্নিবেশ আছে। তবে এ'সম্বন্ধে মতভেদও আছে। যেমন কোন মতে, (১) পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, চব্বিশটি (২৪) তত্ত্ব আত্মতত্ত্বের অন্তর্গত। পুরুষ থেকে মায়া-পর্যন্ত সাতটি তত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্বের অন্তর্গত এবং শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব, শক্তি ও শিব এই পাঁচটি তত্ত্ব শিবতত্ত্বের অন্তর্গত। এই শিবতত্ত্বের অন্তর্গত পাঁচটি তত্ত্ব বিশেষভাবে সাধারণ-ধর্মের প্রকাশক। কিন্তু শিব বা শিবশক্তিসামরস্য এই পরম ও চরম-তত্ত্ব তাত্ত্বতীত-তত্ত্ব, যার প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি হয় একমাত্র বোধিতে বা আত্মজ্ঞানে। এই পরমতত্ত্ব অদ্বৈতবেদান্তের তুরীয়তত্ত্ব। পরশুরামকল্পসূত্রে মহর্ষি পরশুরাম ১।৬ সূত্রে বলেছেন : "স্ববিমর্শঃ পুরুষার্থঃ,"—অর্থাৎ পরমশিবের বিমর্শ বা যথার্থজ্ঞানই পরমপুরুষার্থ। কিন্তু কাশ্মীরীয়-প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রের মতে, তত্ত্ব মাত্র দু'টি,—শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব।

পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, পরমশিবের বিশ্বোত্তীর্ণ (transcendental) ও বিশ্বগত বা বিশ্বময় (immanent or creative) এই দুটি বিকাশ। এই বিশ্বগত বা বিশ্বময় বিকাশের নাম শিবতত্ত্ব। এটিই পরমশিবের প্রথম বিকাশ বা স্পন্দ ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্বসন্দোহে আছে—

> 'যদয়মনুত্তরমূর্তির্নিজেচ্ছয়াখিলমিদং জগদ্‌স্রষ্টুম্।
> পস্পন্দে স স্পন্দঃ প্রথমঃ শিবতত্ত্বমুচ্যতে তজ্‌জ্ঞৈঃ' ॥

অনন্তশক্তিসম্পন্ন উন্মেষী-শক্তিই অনুত্তর ও স্বাতন্ত্র্য-শক্তি,—যাদের থেকে বিশ্ব-

চরাচরের সৃষ্টি হয়। আর (২) শক্তিতত্ত্ব হোল পরমশিবের উন্মেষী-সৃষ্টির শক্তি। শক্তির মধ্যে চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া এই পাঁচটি শক্তিবিকাশের মধ্যে যখন জ্ঞানশক্তির উন্মেষ হয় তখন নিষেধব্যাপাররূপ একটি নেতিভাবের বিকাশ হয়,—ইংরেজীতে যাকে বলে 'the principle of negation'। তখন প্রথমে শিব বা পরমশিবের মধ্যে 'ইদম্' বা বিষয়াভিমুখী ভাবের আরোপ করেন সাধক। তারপর চিৎ বা পরাসম্বিদের 'অহম্' বা বিষয়ীভাবের আরোপ হয়। অর্থাৎ সৃষ্টিতে বিষয় ও বিষয়ী,—Object and subject এই দুটি ধারা আরোপিত হয় এবং এই আরোপই শক্তিতত্ত্বের ক্রিয়া বা ফলশ্রুতি। আচার্য ক্ষেমরাজ এই বিষয়ীভাবে সম্পন্ন শিবকে 'অনাশ্রিত-শিব' আখ্যা দিয়েছেন। "শ্রীপরমশিব...পূর্বং চিদৈক্যাতিময়ানাশ্রিতশিবপর্য়ায়শূন্যাতিশূন্যাৎমতয়া প্রকাশ-ভেদেন প্রকাশমানতয়া স্ফুরতি"। প্রকৃতপক্ষে এই অবস্থায় শিব বা পরমশিব একমাত্র 'অহম্'-রূপে প্রকাশ পান, 'ইদম্' বা বিষয় (objective aspect) শূন্যাবস্থায় থাকে। তখন যেন এক মহাশূন্য,—যে শূন্যের মধ্যে একমাত্র 'অহম্'-সংবিদই প্রকাশমান বা ভাসমান থাকে।* কিন্তু এই অখণ্ড 'অহম্'-ভাবসমুদ্র থেকেই ক্রমে 'অহম্-ইদম্' বা বিষয়ী-বিষয় (subjective-objective) যুগ্মসত্ত্বারূপে বিশ্ব-বিকাশের উদ্ভব দেখা যায়,—যে উদ্ভব বা সৃষ্টি ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ডক্টর জয়দেব সিংহ এ'সম্পর্কে বলেছেন : "Śiva (i.e. Parama-Śiva) in this state appears a mere 'I' devoid of any objective content. In order that Siva may appear as the Universe, a break in the unitary experience becomes a necessary phase. But this is only a passing phase. To this Subjectivity disengaged from the objective content, the Universe is presented again not as an indistinguishable unity, but an 'I-this' (or I-It) in which both are distinguishable but not separable, as they form part of the same Self". তার অর্থ ডক্টর জয়দেব সিংহের ভাষায়ই পুনরায় বলি : "Śakti polarises consciousness into *Aham* and *Idam* (I and this),—subject and object".

মনে রাখতে হবে যে, কাশ্মীরীয়-প্রত্যভিজ্ঞামতে শুধু নয়, শিবাদ্বৈতমতে শক্তি বা বিমর্শ সৃষ্টির রূপ নিয়ে স্বয়ং-পরমশিবই। শিবের সৃষ্টি-উন্মুখতার অবস্থাই

* । এখানে স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত "এক, রূপ অরূপ" প্রভৃতি গান দ্রষ্টব্য। এই গানে এক চৈতন্য থেকে বহুর বা বৈচিত্র্যের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

শক্তি বা বিমর্শঃ "যদা স্বহৃদয়বর্তিনমুক্তরূপমর্থতত্ত্বং বাহ্যকর্তুমুন্মুখো ভবতি তদা শক্তিরিতি ব্যবহ্রিয়তে"। শক্তিকে সেজন্য 'পরমশিবের সৃষ্টির ইচ্ছা' বা সিসৃক্ষা বলা যায়। গৌড়-বঙ্গদেশীয়-তন্ত্র (Bengal School of Tantra)-মতেও ঐ এককথা। শিব তথা সদাশিব সম্পূর্ণ উদাসীন ও কূটস্থ, সেজন্য মহাকালরূপে তিনি নৃত্যচঞ্চলা কালীর সঙ্গে সম্পারিষক্ত। সামবেদীয়-ছান্দোগ্য-উপনিষদে (৬।২-১০) এ'তত্ত্বকেই ভিন্নভাষায় উপনিষদকার বলেছেন: "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদেক-মেবাদ্বিতীয়ম্...তদৈক্ষত, বহুস্যাম প্রজায়েয় ইতি"। এ'কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, কিন্তু তাহলেও প্রসঙ্গক্রমে দ্বিতীয়বার বলি যে, সৃষ্টিরূপ ঈক্ষণ বা ইচ্ছার সময়ে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যেন দুই বা দ্বিতীয়রূপে প্রতীয়মান। এখানে শঙ্কর-অদ্বৈতদৃষ্টি থেকে কাশ্মীরীয়-শিবাদ্বৈতের মধ্যে পার্থক্য আছে সেকথা পূর্বেই বলেছি। কেননা, শঙ্কর-অদ্বৈতে দুই যেন দ্বিতীয়ের আভাস,—'যেন দুই', কিন্তু কাশ্মীরীয়- শিবাদ্বৈতে দুই - 'polarised consciousness',—অহং ও ইদং,—positive and negative-সহকৃত অর্থে এক ও অদ্বিতীয় হ'লেও 'অহম্ ও ইদম্'-এ বিভক্ত, কিন্তু চণকাকারে এক ও সমরসে-অখণ্ড ও অদ্বৈত। একেই শিবাদ্বৈত বলে।

॥ জ্ঞানশক্তিতত্ত্ব ॥

ঈশ্বর তথা পরমশিব এখানে ঐশ্বর্যতত্ত্বযুক্ত। ঐশ্বর্যতত্ত্বের অর্থই ঈশ্বরতত্ত্ব। শ্রদ্ধেয় রাজানক আনন্দ এজন্য বিবরণভাষ্যে বলেছেন: "অত্র বেদ্যজাতস্য স্ফুটাবভাসনাৎ জ্ঞানমাত্রোদ্রেকঃ"। ঈশ্বরতত্ত্বে জ্ঞানশক্তি প্রধানভাবে থাকে।

॥ সদ্বিদ্যাতত্ত্ব বা শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব ॥

তৃতীয় সদাশিব বা সদাখ্যতত্ত্ব এবং চতুর্থ ঈশ্বরতত্ত্ব বা ঐশ্বর্যতত্ত্বের পর পঞ্চম্ তত্ত্ব সদ্বিদ্যা বা শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব। এই পঞ্চমতত্ত্বে ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্য থাকে। এই তত্ত্ব ভেদাভেদবিমর্শনাত্মক বা diversity-in-unity-র রূপ বলা যায়, সুতরাং এই অবস্থায় অহম্ ও ইদম্ অথবা I and It or This সমানাধিকরণ্যাবস্থায় থাকে। আসলে একে শুদ্ধবিদ্যা-অবস্থা বলে, কারণ এই অবস্থায় পরমশিব ও বিমর্শের মধ্যে সত্যকার সম্পর্ক কি তা জানা যায়।

॥ মায়াতত্ত্ব ও পঞ্চ-কঞ্চুকতত্ত্ব ॥

মায়া অর্থে মায়াতত্ত্ব। মায়াতত্ত্ব স্চঞ্চল ও তরঙ্গায়িত। এখান থেকে ঊর্ধ্বতন

সকল-কিছুই আবৃত ও অজানার মধ্যে,—তার কারণ এখান থেকে মায়া ও মায়াজাত কঞ্চুকের সর্বদা রাজত্ব ও বিলাস। পরিমাপ বা-সীমিত করার ভাব থেকেই 'মায়া'-শব্দের সৃষ্টি, সুতরাং শুদ্ধবিদ্যার পর থেকে সকল-কিছু তত্ত্বই সীমার মধ্যে,—অহম্ থেকে ইদমের, অথবা ইদম্ (বিষয়) থেকে অহমের (বিষয়ীর) কোন পার্থক্য বুঝা যায় না, সকল তত্ত্বই থাকে ভেদ এবং অজানার মধ্যে। সংকোচের ক্ষেত্র এখান থেকেই আরম্ভ। মায়ার আবরণ এর পরের সকল-কিছু তত্ত্বকে আবৃত (covered) ক'রে রাখে। সেজন্য মায়ার অর্থই বিভেদবুদ্ধি।

কঞ্চুকগুলি মায়ারই সৃষ্টি। কঞ্চুক পাঁচটি। তাদের নাম (১) কলা, (২) বিদ্যা, (৩) রাগ, (৪) কাল ও (৫) নিয়তি। (১) 'কলা' সকল-কিছু কর্মশক্তি ও কর্তৃত্বকে নষ্ট বা সীমায়িত করে; (২) 'বিদ্যা' সর্বজ্ঞত্বশক্তিকে হ্রাস করে। (৩) 'রাগ' পূর্ণত্বের ভাব অপূর্ণতায় পরিণত করে। (৪) 'কাল' নিত্যত্বকে সীমার মধ্যে এনে অনিত্য বলে বোধ করায়। (৫) 'নিয়তি' স্বতন্ত্রতা ও ব্যাপকত্বকে অধীন ও সীমিত ব'লে প্রতীয়মান করায়। এই পাঁচটি কঞ্চুক সকল-কিছুর স্বরূপকে বিরূপে পরিণত করে ও অসীমকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে।

এরপর কাশ্মীরীয়-প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রে পুরুষ ও প্রকৃতির, কথা। (১) পুরুষ বলতে শিব বা পরমশিব এখানে নিজেকে মায়ার ও কঞ্চুকের আবরণে আবৃত ক'রে পূর্ণতার পরিবর্তে নিজেকে অপূর্ণ ও আবদ্ধ ব'লে মনে করেন। পুরুষ এখানে শুধু মানুষ নন, তিনি সকল প্রাণী ও পদার্থ,—যেগুলি সৃষ্টির উপকরণ। মোটকথা, সবব্যাপক ও বৃহদ্-পরমশিব এখানে মায়া ও কঞ্চুকের আবরণের জন্য নিজেকে 'অণু' ও দেশ-কালের মধ্যে সীমায়িত মনে করেন। মোটকথা, শিব এখানে জীব-রূপে প্রতীত,—'পূর্ণত্বাভাবেন পারিমিত্যাম্ অণুত্বম্'।

॥ পুরুষ ও প্রকৃতি ॥

প্রকৃতি অর্থে কলাতত্ত্বেরই বিষয়রূপে পরিণতি,—'বেদ্যমাত্রং স্ফুটং ভিন্নং প্রধানং সূয়তে কলা'। এখানে প্রকৃতি সাংখ্যের মতো গুণসাম্যে বিদ্যমান থাকে, গুণক্ষোভ এখানে হয় না। অথচ এই প্রকৃতিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কারণ। এখানে প্রকৃতি শিবেরই সান্তাশক্তি এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ তিনটি শিবেরই ব্যক্ত জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া-শক্তিরূপে থাকে। সুতরাং সৃষ্টিক্ষেত্রে শিব ভোক্তা ও প্রকৃতি ভোগ্যরূপে বর্তমান থাকেন, অর্থাৎ প্রকৃতি এখানে (সৃষ্টিতে) পুরুষরূপ শিবের ভোগ্য-বিষয়রূপে পরিণত হয়।

॥ বুদ্ধি ও অহংতত্ত্ব ॥

এরপর বুদ্ধি, অহংকার ও মনের রাজ্য। প্রকৃতি এরপর নিজেকে সকল প্রাণীর অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয় ও ভূতে রূপায়িত করেন, এবং তখনই হয় মন, বুদ্ধি ও অহংকারের লীলায়নের খেলা। 'বুদ্ধি' সৃষ্টিতে প্রকৃতির প্রথম তত্ত্ব,—'ব্যবসায়াত্মিকা' রূপ। অহংকার ও মন এই দুটিই হয় তখন কর্মমুখী ও সচঞ্চল। এর পরেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির এবং সঙ্গে সঙ্গে বাগিন্দ্রিয়, হস্তেন্দ্রিয়, পাদেন্দ্রিয়, পায়ুরিন্দ্রিয় ও উপস্থেন্দ্রিয়রূপ কর্মেন্দ্রিয়গুলির সৃষ্টি ও ক্রিয়া হয়। 'ইন্দ্রিয়' বলতে বুঝায় যন্ত্র+শক্তি—যা যন্ত্ররূপ ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রাণবান করে ও কর্মচঞ্চল করে।

এরপর শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ তন্মাত্রাদির সৃষ্টি এবং আকাশাদি পঞ্চভূতের সৃষ্টি ও বিকাশ। শিবশক্তি থেকে বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি হয়েছে এভাবে ক্রমায়তনে।

কাশ্মীরীয়-প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রে যে' দু'টি দার্শনিক-মতের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয় সেই দুটি হোল (১) স্বাতন্ত্র্যবাদ ও (২) আভাসবাদ। ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞার মতে, স্বাতন্ত্র্যবাদ বলতে বুঝায়—"স্বাতন্ত্র্যং চ নাম যথেচ্ছং তত্রেচ্ছাপ্রসরস্য অভিঘাতঃ",—অর্থাৎ দিব্য-ঈশ্বরেচ্ছার স্বতঃস্ফুরণ। অভিনবগুপ্তাচার্য বলেছেন : "তস্মাদনপহ্নবীয়ঃ প্রকাশবিমর্শাত্মা সংবিৎস্বভাবঃ পরমশিবো ভগবান স্বাতন্ত্র্যাদেব রুদ্রাদিস্থাবরান্ত-প্রমাতৃরূপতয়া নীলসুখাদিপ্রমেয়রূপতয়া চ অনতিরিক্তয়াপি অতিরিক্তয়া ইব স্বরূপানাচ্ছাদিকয়া সংবিদ্রূপনান্তরীয়স্বাতন্ত্র্যমহিম্না প্রকাশত ইব অয়ং স্বাতন্ত্র্যবাদঃ প্রোন্মীলিতঃ"।

অর্থাৎ প্রকাশ-বিমর্শাত্মক-জ্ঞানরূপী পরমশিব-রুদ্র থেকে সকল প্রাণী ও পদার্থ প্রকৃতির মতো পৃথকীকৃত হয়ে প্রকাশ পায়,—যদিও স্বরূপত শিবের পরমসত্তা থেকে কোন-কিছুই পৃথক বা ভিন্ন হয় না। পরমশিবের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন ইচ্ছারই এই প্রকাশ বা পরিণতি। এই মতবাদকেই স্বাতন্ত্র্যবাদ বলা হয়।

আর আভাসবাদ হোল—

'দর্পণবিম্বে যদ্বদ্ নগরগ্রামাদিচিত্রমবিভাগি।
ভাতিবিভাগেনৈব চ পরস্পরং দর্পণাদপি চ ॥
বিমলতমপরমভৈরববোধাৎ তদ্বৎ বিভাগশূন্যমপি
অন্যোন্যং চ ততোঽপি চ বিভক্তমাভাতিজগদেতৎ ॥

দর্পণে বা আর্শীতে যেমন নগর, গ্রাম প্রভৃতির প্রতিবিম্ব পৃথক-পৃথকভাবে পতিত হয়, অথচ সেই প্রতিবিম্বগুলি দর্পণ বা আর্শী-ব্যতীত অন্য-কিছুই নয়, তেমনি

সমগ্র বিশ্ব পরমশিবের স্বচ্ছ-শুদ্ধ-জ্ঞানে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিবিম্বিত হলেও আসলে তারা সমস্তই পরমশিবের জ্ঞান-ছাড়া অন্য-কিছুই নয়। 'আভাস'-অর্থে প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া। আসলে দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া দর্পণ-ব্যতীত অন্য-কিছুই নয়, তেমনি বিশ্বচরাচর পরমশিবের বিশুদ্ধজ্ঞানে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিবিম্বিত হলেও আসলে তারা সকলেই এক ও অখণ্ড পরমশিবের চৈতন্য-ছাড়া অন্য-কিছু নয়: আসলে পরমশিব-পরমেশ্বরের নিজের স্বরূপের নানারূপে প্রতিফলন। দর্পণে বস্তুর প্রতিফলনের সঙ্গে পরমশিবের শুদ্ধজ্ঞানে বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতিফলনে পার্থক্য আছে, কেননা আর্শীতে (দর্পণে) প্রতিফলন হয় আর্শীছাড়া সূর্যের আলোকে বা যেকোন আলোকের সাহায্যে, কিন্তু আভাসবাদে যে আভাস বা বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতিভাস বা প্রতিচ্ছবি—তার সৃষ্টি হয় পরমশিবেরই নিজের জ্ঞানালোকের সাহায্যে। আসলে পরমশিবের শুদ্ধ-ইচ্ছাই সৃষ্টির সময়ে নানারূপে অশুদ্ধরূপে প্রতীত হয়, শুদ্ধবিষয়ী (Subject) অশুদ্ধ-বিষয়রূপে যেন প্রতীত হয়,—"অন্তর্বিভাতি সকলং জগদাত্মনীহ······বিমৃশং পরামৃশতি নো মকুরস্তথা",—পরমার্থসারে যোগরাজ এ'কথা বলেছেন। সুতরাং আভাস পরমেশ্বরের অন্তর-ইচ্ছারই বহির্বিকাশ মাত্র,—'projection of the ideation of the Divine': 'চিদাত্মৈব হি দেবোহন্তঃস্থিতমিচ্ছাবশাদ্বহিঃ, যোগীব নিরুপাদানমর্থজাতং প্রকাশয়েৎ'। সুতরাং কুম্ভকার যেমন বাইরের মৃত্তিকার সাহায্যে ঘট-সরাবাদি নির্মাণ করে, এই বিশ্বসৃষ্টি ঠিক সেই রকম নয়, এই বিশ্বের সৃষ্টিতে পরমশিব নিজের ইচ্ছার অনুরূপই বিশ্বের বিচিত্র উপাদান সৃষ্টি করেন, সৃষ্টি করেন তাঁর ইচ্ছার অভিঘাতে।

॥ নাদতত্ত্ব ও বিন্দুতত্ত্ব ॥

এরপর নাদতত্ত্ব ও বিন্দুতত্ত্ব। বাচ্য বা শব্দরূপে বর্ণ, মন্ত্র ও পদ এবং বাচ্য বা অর্থরূপে কলা, তত্ত্ব ও ভুবনের সৃষ্টি হয়। 'বর্ণ' দু-রকমের,—অমায়ীয় ও মায়ীয়। মায়ীয় বর্ণগুলি কিন্তু অমায়ীয় (মায়াহীন) বর্ণ থেকে সৃষ্টি হয়। মায়াহীন (অমায়ীয়) বর্ণগুলি পরিশুদ্ধ, স্বাভাবিক, সীমাবিহীন (ভেদহীন) ও অনন্ত। অমায়ীয় বর্ণগুলি বাচকশক্তির অন্তর্নিহিত বস্তু,—যেমন অগ্নিতে দাহিকাশক্তি থাকে অগ্নিরই মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে। (২) কলা পাঁচটি—নিবৃত্তিকলা, প্রতিষ্ঠাকলা, বিদ্যাকলা শান্তাকলা ও শান্তাতীতা-কলা। (৩) ভুবন সংখ্যাতীত-কলা। আবার অনেকের মতে ভুবন মাত্র ২২৪টি। এখানে কাশ্মীরীয়-প্রত্যভিজ্ঞা-মতবাদ শাঙ্কর-

অদ্বৈতবাদ থেকে বেশ-কিছু পৃথক, কেননা মহার্থামঞ্জরীতে মহেশ্বরানন্দ একটু কটাক্ষ ক'রে বলেছেন যে, শাঙ্করবেদান্তে নিষ্ক্রিয়-কূটস্থ-ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করা যায় না কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞামতে পরমশিব-পরমেশ্বর সর্বদাই পঞ্চকৃত্যকারী, সুতরাং ক্রিয়াশীল, নিষ্ক্রিয় ও কূটস্থ নন। শাঙ্করবেদান্ত ও প্রত্যভিজ্ঞামতের মধ্যে পার্থক্য এখানেই : একটি—শুদ্ধ-অদ্বৈত ও অন্যটি শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈত।

॥ বন্ধনতত্ত্ব ও মুক্তিতত্ত্ব ॥

কাশ্মীরীয়-শৈবসিদ্ধান্তে বন্ধন ও মুক্তি স্বীকার করা হয়েছে। কাশ্মীরীয়-শৈবসিদ্ধান্তে বন্ধন আনব-মলের জন্য এবং জীব এখানে নিজের পৃথকসত্তার কথা মনে করে এবং স্বীকার করে মায়ার জন্য। সুতরাং আনব-মলের অপসারণে পরম-জ্ঞানশক্তির বিকাশ হয়। আর 'মুক্তি' অর্থে নিজের বিশুদ্ধ-স্বরূপের প্রত্যভিজ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা।

'অহং প্রত্যবমর্শো যো বিমর্শাত্মাপি বাগ্বপুঃ।
নাসৌ বিকল্পঃ, স হ্যুক্তো দ্বয়াপেক্ষী বিনিশ্চয়ঃ ॥'

আচার্য অভিনবগুপ্ত তন্ত্রালোকে এ'সম্বন্ধে বলেছেন—

"মোক্ষো হি নাম নৈবান্যঃ স্বরূপপ্রথনং হি তৎ'।

কাশ্মীরীয়-প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্র শক্তিপাত বা অনুগ্রহ (কৃপা—Grace) এবং আণবোপায়, সম্ভবোপায় ও অনুপায় এই তিন রকমের 'উপায়' বলতে আনবরূপ বন্ধের পারে যাওয়ার পদ্ধতি (means and method) স্বীকার করে। তবে অনুগ্রহ বা Grace এই সকলের পিছনেই থাকে। তাছাড়া প্রত্যভিজ্ঞা-মতবাদ পঞ্চক্রিয়া ও বিকল্প ক্ষয়রূপ অভ্যাস স্বীকার করে। পরমশিবের যে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, বিলয় ও অনুগ্রহ এই পাঁচটি ক্রিয়া সর্বদাই জীবের উপর ক্রিয়াশীল থাকে। তবে আচ্ছন্নজ্ঞানের ক্রমবিকাশের (বা প্রকাশের) সঙ্গে সঙ্গে জীব তার স্বাধীন-স্বতন্ত্র স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। জীবের মধ্যে কার্ম, মায়ীয় ও আনব-মল—এই তিনটি ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয় এবং বিজ্ঞানালোকের বিকাশে মন্ত্র, মন্ত্রেশ্বর, মন্ত্রমহেশ্বর ও শিবপ্রমাতায় জীব প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করে। তখন জীবের ভাব বা স্বভাব কিরূপ হয় সে-সম্বন্ধে মহার্থমঞ্জরীকার বলেছেন—

'স্বতন্ত্রঃ স্বচ্ছাত্মা স্ফুরতি সততং চেতসি শিবঃ।
পরাশক্তিশ্চেয়ং করণসরণিপ্রান্তমুদিতা।

তদা ভোগৈকাত্মা স্ফুরতি চ সমস্তং জগদিদম্।
ন জানে কুত্রায়ং ধ্বনিরনুপতত্যেৎ সংসৃতিরিতি ॥'

তখন সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ বিশুদ্ধ-অহমৃজ্ঞানের অফুরন্ত দিব্য-আলোকে আলোকিত হয় এবং বিশ্বের অস্তিত্ব তখন অহম্-জ্ঞানের আলোকেই উদ্ভাসিত হয়।

কাশ্মীরীয়-তন্ত্র প্রধান তিনভাগে বা শ্রেণীতে বিভক্ত,—প্রত্যভিজ্ঞা, স্পন্দ ও ক্রম। কাশ্মীরীয়-শৈবতন্ত্র 'শক্তিতন্ত্র' নামেও প্রচলিত। ক্রম-তান্ত্রিকসাধনা অনেকের মতে কামরূপে কামাখ্যাদেবীর পূজা ও ভাবতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত,—যেমন গৌড়বঙ্গ-দেশীয়-তন্ত্র কামাখ্যাদেবীর পূজা ও আচার প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত এবং কামরূপ-কামাক্ষ্যা-প্রভাবিত বাঙলার তন্ত্রসাধনা বামাচার বা বীরাচার (পঞ্চতত্ত্বের আচার) নামে বিখ্যাত। তবে রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মৃতিকার ও রঘুনাথ তর্কবাগীশ তাঁর 'আগমতত্ত্ববিলাস' তন্ত্রগ্রন্থে পঞ্চতত্ত্বসেবিত বামাচার বা বীরাচারে কারণকে নিষিদ্ধ করেছেন। *Two Schools of the Tantrik Worshippers in Bengal*-নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন : **"Both Sarvānanda and Purnānanda the two celebrated *Viras* of Bengal.. ... drew their inspiration from Kāmākhyā."** কামরূপ বা আসামের দেবী কামাখ্যার পূজা ও সাধনরীতিই প্রকৃতপক্ষে গৌড়ে ও রাঢ়দেশে অর্থাৎ বাঙলাদেশের তন্ত্রে বামাচার কিছুটা প্রবর্তন করেন,—যদিও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও স্মার্ত-রঘুনন্দনের মধ্যে সে বিষয়ে মতভেদ ছিল। রঘুনাথ তর্কবাগীশ তাঁর 'আগমতত্ত্ববিলাস'-গ্রন্থে ঠিক পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার-সাধনকে সমর্থন করেন নি।

চতুর্থ অধ্যায়

।। মাতৃকাতত্ত্ব, মন্ত্র ও মন্ত্রসাধনা ।।

।। এক ।।

মাতৃকা বর্ণ ও মন্ত্রের সৃষ্টিকারিণী মাতা, অর্থাৎ মাতৃস্বরূপিণী।[১] মাতৃকা থেকেই অকারাদি স্বরবর্ণ ও ক-কারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং পঞ্চাশৎ বর্ণের সমাবেশে বিচিত্র মন্ত্রের সৃষ্টি হয়। এ'জন্য বর্ণ ও মন্ত্রের কারণ ও আধার হোল মাতৃকা। মাতৃকা ও বর্ণ বিশ্বসৃষ্টির কারণ। অথবা বলা যায়, বর্ণমালাত্মক-মাতৃকা।

এই প্রসঙ্গে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মাতৃকা, বর্ণ ও মন্ত্রের সৃষ্টি-সম্পর্কে আলোচনার সময়ে শব্দ থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কথা এবং বেদান্তে শব্দাপরোক্ষ-বাদের কথাও এসে পড়ে, কেননা শব্দ বর্ণ ও ভাষার সম্পর্করহিত নয়। আচার্য অপ্পয়দীক্ষিত তাঁর 'সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ'-গ্রন্থে শব্দাপরোক্ষবাদের বিশদ-বিচার করেছেন। আর শব্দই বিশ্বসৃষ্টির কারণ ও শব্দব্রহ্মবাদ-সম্পর্কে ভাষ্যকার পতঞ্জলি মহাভাষ্যে এবং ভর্তৃহরি 'বাক্যপদীয়'-গ্রন্থে আলোচনা করেছেন,—যদিও আচার্য শঙ্কর ও পরবর্তী অদ্বৈতাচার্যরা অদ্বৈতবেদান্তে শব্দব্রহ্মবাদ খণ্ডন করেছেন। তাছাড়া অ-উ-ম-চন্দ্রকলা ও বিন্দুরূপী ওঙ্কার বা প্রণব তথা পবিত্র শব্দ থেকে বিশ্বসৃষ্টি, পালন ও প্রলয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অমাকলারূপিণী অব্যক্ত বা অব্যাকৃত-প্রকৃতি ও বিন্দুরূপ-ব্রহ্ম-প্রসঙ্গকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু আমরা জানি যে, তন্ত্র ও তন্ত্রে মাতৃকা ও মন্ত্র প্রভৃতি সাধনার ক্ষেত্রে ও প্রসঙ্গে শব্দব্রহ্মবাদ ও শব্দাপরোক্ষবাদ আলোচনার বিষয় নয়।

মাতৃকা—(১) কেবল, (২) বিন্দুসংযুক্ত, (৩) বিসর্গসংযুক্ত ও (৪) বিন্দু-বিসর্গ-ভেদে প্রধানত চার রকমের। (১) অ-কার থেকে ল-কার পর্যন্ত বিন্দুযুক্ত মাতৃকা এবং এর নাম 'সর্বজ্ঞতাকরী-বিদ্যা'। ললিতাসহস্রনামে বলা হয়েছে—'মাতৃকা বর্ণরূপিণী' (১৬৭ শ্লোক)। স্বচ্ছন্দতন্ত্রে বলা হয়েছে—'ন বিদ্যা মাতৃকাপরা',—অর্থাৎ মাতৃকাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এই মাতৃকা বর্ণমালারূপিণী,—যে বর্ণমালা প্রকাশ করে বিদ্যার স্বরূপ ও মহিমা। মাতৃরূপিণী তাই মাতৃকা। তন্ত্রসারে,

১। মন্ত্র বর্ণসমষ্টির প্রকাশ এবং বর্ণ মাতৃকা থেকে সৃষ্ট,—'মন্ত্রমাতা মাতৃকা'।

মাতৃকাবিলাসতন্ত্রে, পরশুরামকল্পসূত্রে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে, মন্ত্রবিধানে, পরাত্রিংশিকায়, মাতৃকানিঘণ্টু, সৌভাগ্যভাস্কর, তন্ত্রালোক, কামধেনুতন্ত্র, প্রভৃতি। তবে কামধেনুতন্ত্রেই বিশেষভাবে বর্ণরূপ, স্বরূপ, অভিরূপ, মহিমা, কলা, দেবতা, শক্তি, ঋষি ও ছন্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া আছে। বহির্মাতৃকা ও অন্তরমাতৃকা-ভেদে মাতৃকা পুনরায় দু'রকম। বাগ্‌দেবতার অঙ্গ বা দেহ বর্ণময়,—'বর্ণময়ী বাগ্‌দেবতা'। কামধেনুতন্ত্রের ১০-ম পটলে বর্ণ অনুযায়ী বাগ্‌দেবতার অঙ্গ এবং অঙ্গানুযায়ী স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পরিচয় দেওয়া আছে। এ'কথা বলার উদ্দেশ্য যে, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলি বাগ্‌দেবতারই[২] অঙ্গ, সুতরাং তারা পবিত্র ও মহিমাসূচক। মালিনীবিজয়োত্তরতন্ত্রে মাতৃকা থেকে সৃষ্ট বা প্রকাশিত স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে মালিনীবর্ণক্রমে ভাগ ক'রে সাজানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে : "ভগবতী মালিনী, মুখ্য-শাক্তরূপধারিণী"। মালিনী দেবী ভগবতী এবং দেবী ভগবতী সাধককে সিদ্ধিরূপ মোক্ষ বা মুক্তি দান করেন। মালিনীবিজয়োত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে : "মলতে বিশ্বং স্বরূপে ধত্তে, মালয়তি অন্তঃকরোতি কৃৎকর্মিতি চ মালিনীতিব্যপদিশ্যতে। ভিন্নযোনিত্বাদেব চ অস্যাঃ বীজযোনীনাং বিসংস্থুলত্বাৎ . '' প্রভৃতি। পরাত্রিংশিকায় ঐ একই কথা বলা হয়েছে : "অনুত্তং-মালিনী হি ভগবতী মুখ্যং শাক্তং রূপং বীজযোনিসংঘট্টেন সমস্ত-কামদুধম্"। তন্ত্রশাস্ত্রে ও তন্ত্রসাধনায় মাতৃকারূপিণী দেবী ভগবতী থেকে সকল বর্ণ ও বর্ণাত্মক মন্ত্র বা বীজমন্ত্রের বিকাশ হয়েছে। তন্ত্রসাধনায় মন্ত্র, যন্ত্র প্রভৃতি প্রয়োগ থাকলেও মন্ত্র তথা বীজমন্ত্রই তন্ত্রসাধনার প্রাণ ও আধার। বীজমন্ত্র দেবতার ও মহাশক্তিময়ী বিভিন্ন দেবীর স্বরূপ বা স্বরূপের দ্যোতক ;—অর্থাৎ বীজমন্ত্রই বিভিন্ন দেবতার ও দেবীর স্বরূপের তথা স্বরূপসত্তার ও মহিমার জ্ঞাপক ; সুতরাং বীজমন্ত্রের সাধনায় দেবতা ও দেবী-সাধনার সার্থকতাই সিদ্ধ হয়।

॥ দুই ॥

॥ বর্ণ ও মাতৃকা ॥

কালী নির্গুণা, আবার সগুণা। সগুণা,—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনটি গুণকে নিয়ে। কালী মহাপ্রকৃতি ও মহাশক্তি। কালী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—জীবজগৎ প্রকাশ করেন।

২। বাগ্‌দেবতা বা বাগ্দেবীর দেহ ও সত্তা বর্ণময়,—'বর্ণময়ী দেবী'। তন্ত্রে আছে 'বিদ্যুৎজিহ্বা দেবী', দেবী বিদ্যুৎ বা অগ্নি বা আলোকময়।

কালীর গলায় মুণ্ডমালা বর্ণেরই প্রতীক,—বর্ণমালা। কালী সৃষ্টি করেন, পালন করেন, আবার ধ্বংস করেন। সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন -

'আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুমূলে রে মন,
চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥'—প্রভৃতি

এই কালী-কল্পতরু কে ? তন্ত্রসাহিত্য বলে যে, মহাতত্ত্বময়ী ত্রিগুণাত্মিকা কালী বিশ্বের সর্বজনের ও সর্বকালের রহস্যময়ী দেবী ও মাতৃকা। তিনি সচ্চিদানন্দময়ী জননী। তিনি ব্রহ্মস্বরূপিণী, আবার ব্রহ্মরূপী পরমশিবের লীলাচঞ্চলা নিত্য-সঙ্গিনী। তন্ত্রে শিব ও শক্তির সমন্বিত রূপই অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্য। তিনি সগুণা নির্গুণা, আবার সগুণ-নির্গুণের অতীতা। তিনি সাকার, নিরাকার, আবার সাকার ও নিরাকারের অতীতা বিশুদ্ধ-চিৎসত্তা।

তন্ত্রে কৈবল্যরূপিণী কালীর মূর্তি নানান্ রকমভাবে কল্পনা করা হয়েছে : (১) সদাশিব ও মহাকাল দুই শিবের মধ্যে সদাশিব-শিবের উপরে দেবী আসীনা,—"বিপরীতরতাতুরা' ; (২) একমাত্র মহাকাল-শিবের উপর আসীনা দেবীমূর্তি, আবার (৩) শায়িত মহাকালের উপর দণ্ডায়মানা, কখনও দক্ষিণপদ (দক্ষিণাকালী), কখনও বামপদ (বামাকালী) সম্মুখে প্রসারিত। গলায় মুণ্ডমালা —পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণের প্রতীক বা প্রতিকৃতি। তিনি দিগ্বসনা,—সর্বদিকময়ী সর্বপরিব্যাপ্তা বিশ্বরূপিণী তিনি, সুতরাং তাঁর আবরণরূপ সীমারেখার আর প্রয়োজন নাই। বিচিত্র রূপে ও বিচিত্র নামে মহাকালী হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি ধর্মে নিজেকে প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ-তন্ত্রসাধনা সমান্তরালভাবেই হিন্দু-সাধক ও বজ্রযানী, কাল-চক্রযানী প্রভৃতি বৌদ্ধ-সাধকদের মধ্যে প্রচলিত। কালী, মহাকালী, করালী দুর্গা অপরাজিতা, কাত্যায়নী, মহিষমর্দিনী, ভৈরবী, তারা, ষোড়শী প্রভৃতি হিন্দু-দেবীদের নিয়ে, আবার নীলসরস্বতী, তারা, অপরাজিতা, মারীচি, পর্ণশবরী, প্রজ্ঞাপারমিতা, বা প্রজ্ঞা, উপায় প্রভৃতি বৌদ্ধদেবীদের নিয়ে মাতৃসাধনা সার্থক। দেবী কখনও দ্বিভুজা, ষড়্ভুজা, দশভুজা এবং ষোড়শ ও অষ্টাদশভুজা, কখনও শতভুজা ও সহস্রভুজা। তাছাড়া দুর্গা ও কালী এ দুটী মাতৃমূর্তির মধ্যে বিচিত্র বিকাশের প্রচলন ছিল : যেমন দুর্গা,—বনদুর্গা, জয়দুর্গা, বিন্ধ্যবাসিনী-দুর্গা, অগ্নিদুর্গা, হরসিদ্ধি-দুর্গা, ক্ষেমঙ্করী-দুর্গা, রিপুমারী-দুর্গা, পর্ণশবরী-দুর্গা প্রভৃতি এবং কালী,— সিদ্ধকালী, দক্ষিণাকালী, বামাকালী, শ্মশানকালী, গুহ্যকালী প্রভৃতি। তাছাড়া হিন্দুতন্ত্রে তারামূর্তির প্রচলন থাকলেও বৌদ্ধতন্ত্রে তারাদেবীর রূপভেদের

অন্ত নাই,—যেমন মহাচীনতারা বা একজটা খদিরবানীতারা, জম্বুলীতারা, আর্যতারা, নীলতারা বা নীলা-সরস্বতী, মহাশ্রীতারা, বজ্রতারা, পীঠতারা, রাজশ্রীতারা প্রভৃতি।[৩] এ'সকল দেবী রূপভেদে ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু চরমপ্রাপ্তিতে সকল আচারে ও উপাসনায় এক ও অভিন্ন।

॥ কালী বর্ণময়ী ও তত্ত্বময় ॥

তন্ত্রে কালীকে বর্ণময়ী বলা হয়েছে। মাতৃকা থেকে বর্ণ,—'ব্যজ্যতে ইতি বর্ণঃ,'—যা প্রকাশ করে তাই বর্ণ। বর্ণ বিশ্বসৃষ্টি, বিশ্বতত্ত্ব ও সকল তত্ত্বের মর্মকথা প্রকাশ করে। সাধক শ্রীরামপ্রসাদ বলেছেন : 'কালী-পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী, (তুমি) বর্ণে বর্ণে নাম ধর'! 'অ' থেকে সকল স্বরবর্ণ এবং 'ক' থেকে 'ম'-পর্যন্ত সকল ব্যঞ্জনবর্ণ অক্ষররূপিণী কালী। মাতৃকাবর্ণই মুণ্ড ও মুণ্ডমালা। মাণ্ডূক্য-উপনিষদে অকার, উকার ও মকারের এবং চন্দ্রকলা ও বিন্দুর সমষ্টিকে ওঙ্কার বলা হয়েছে। ওঙ্কার পাদ ও মাত্রার দ্বারা বিভক্ত। অবশ্য এই বিভাগও কল্পিত। পাদ-বিভাগ ও মাত্রা-বিভাগ একই। অকার, উকার ও মকার-অক্ষরই তাদের আদিরূপ। এই রূপের বিনাশ নাই। গীতায় এই অক্ষরকে 'অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম',—পরব্রহ্ম-রূপে চিন্তা করা হয়েছে। অক্ষরমালা, বর্ণমালা ও মাতৃকাবর্ণমালা অ'-কার (স্বরবর্ণ) থেকে 'ম'-কার (ব্যঞ্জনবর্ণ)-পর্যন্ত বিস্তৃত। মাণ্ডূক্য-উপনিষদেও আচার্য গৌড়পাদ-বর্ণিত কারিকায় ওঙ্কারতত্ত্বের প্রথম পাদ বা প্রথম অক্ষরও 'অকার' ও শেষবর্ণ 'মকার' এবং মধ্যে সমতারক্ষক বর্ণ 'উকার'।[৪] ওঙ্কারের সর্বাত্মক রূপ তাই পঞ্চাশদ্বর্ণ,—যে বর্ণগুলিকে কালীর মুণ্ডমালারূপে কল্পনা করা হয়। ওঙ্কারের উপরের অর্ধচন্দ্রকলা প্রকৃতি ও প্রকৃতির আধার বিন্দু বা ব্রহ্ম।

কালী বর্ণময়ী বা মাতৃকারূপিণী সে'কথা বলেছি। কালীপ্রতিমায় দেখি, মহাশক্তিরূপিণী কালীর জিহ্বা প্রসারিত। এই জিহ্বা রহস্যময় বর্ণের প্রতীক-ছাড়া অন্য-কিছু নয়। সকল বর্ণই উচ্চারিত ও প্রকাশিত হয় জিহ্বার সাহায্যে। দন্ত্যবর্ণ, তালব্যবর্ণ, ওষ্ঠবর্ণ প্রভৃতি সকল-কিছু বর্ণ বাইরের জগতে প্রকাশ পায় জিহ্বার (জিহ্বা-সঞ্চালনের) সাহায্য নিয়ে। বাইরের জগতে প্রকাশিত বর্ণ বৈখরী-নাদেরই রূপভেদ। বৈখরী ব্যক্ত ও বাহ্য নাদ বা শব্দ এবং আন্তর-নাদ তিনটি,—পরা, পশ্যন্তি ও মধ্যমা। এই তিনটি আন্তরনাদ সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি',—

৩। এ সম্বন্ধে আমার 'তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা'-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৪। 'সর্বস্য প্রণবো হ্যাদির্মধ্যান্তস্তথৈব চ।' (১।২৭); 'সর্বব্যাপিনমোঙ্কারম্' (১।২৮)।

অমৃতলোকে তিনটি পাদ, (নাদের প্রকাশ),—নাভিতে, হৃদয়ে ও কণ্ঠে। একটি পাদ বৈখরী বাইরের জগতে মুখে অভিব্যক্ত।[৫] অথবা নাদের বহির্বিকাশ কালীর প্রসারিত জিহ্বা বর্ণাভিব্যক্তির প্রতীক বা প্রকাশক সে'কথা বলেছি। শক্তিরূপিণী কালী যে বর্ণময়ী এই তত্ত্বের প্রকাশক কালীর প্রসারিত জিহ্বা,– যা বর্ণসৃষ্টির সহায়ক যন্ত্র। অনেকে শিবের বুকে পা (চরণ) দিয়েছেন ব'লে লজ্জায় কালী জিহ্বা কেটেছেন এই অভিমত প্রকাশ করেন। মনে হয়, তাঁরা বর্ণাভিব্যক্তির রহস্যময় তত্ত্ব জানেন না। তত্ত্বময়ী কালীর এই তত্ত্ব বর্ণবিকাশ,—অকার-উকার-মকার ও চন্দ্রকলা এবং বিন্দুকে নিয়ে সার্থক। সমগ্র বিশ্বচরাচরই বিচিত্র বর্ণ ও শব্দের অভিব্যক্তি। বর্ণকে ও শব্দকে তাই পার্বতী ও পরমেশ্বর বা অর্ধনারীশ্বররূপে কল্পনা করা হয়েছে। শক্তিতত্ত্ব বা মহামায়াতত্ত্বের যথাযথ বিশ্লেষণে ও উপলব্ধিতে তাই বিশ্বরহস্যের সঙ্গে সঙ্গে জীবনরহস্যের সমাধান-সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বেদান্তে ওঙ্কার ও তন্ত্রে অবিচ্ছুরিত ও অখণ্ড নাদতনু-কুণ্ডলিনী একই পরমতত্ত্বের প্রকাশক।[৬]

॥ মাতৃকা ও বর্ণ ॥

এ'সম্বন্ধে পূর্বে বলেছি, পুনরায় বলি যে, মাতৃকা বর্ণ ও মন্ত্র। তন্ত্র বলে মাতৃকা বর্ণময়ী। মাতৃকা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-রূপ প্রাত, মধ্যাহ্ন ও সায়ং সূর্যেরই রূপ। মাতৃকা-সম্বন্ধে কামধেনু-তন্ত্রে বলা হয়েছে—

অকারাদি ক্ষকারান্ত মাতৃকাবীজরূপিণী।
বিসর্গশ্চৈব বিন্দুশ্চ দ্বিসান্ধিব্রহ্মবিগ্রহা ॥

এদের মধ্যে বিসর্গ বা অমাকলা-শক্তি এবং বিন্দু শিব। কোনও কোন ধর্ম-মতের প্রতীক চন্দ্র ও তার কোণে বিন্দু যা শিব-শক্তির প্রকাশক। সে'দিক থেকে তাঁরাও যে শক্তির উপাসক তাঁদের প্রতীক থেকে বোঝা যায়। মাণ্ডুক্য-উপনিষদে ও তন্ত্রশাস্ত্রে অ, উ, ম, নাদ (কলা) ও বিন্দুর সবিশেষ ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। মাণ্ডুক্য-উপনিষদের উপর শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

মাতৃকামণ্ডলের বর্ণযুক্ত 'মন্ত্র' বিনাশী বা মরণশীল বস্তু নয়,—অবিনশ্বর ও

৫। শিখদের গ্রন্থসাহেবেও এই বর্ণাভিব্যক্তির পরিচয় আছে।

৬। মুণ্ডমালা তন্ত্রে ৫০টি বর্ণের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমার 'বাণী ও বিচার'-গ্রন্থের প্রথম ভাগে পঞ্চাশৎ বর্ণের অনুযায়ী মহাশক্তি কালীর নামের উল্লেখ আছে—'তুমি বর্ণে বর্ণে রূপ ধর'।

নিত্য। এটি তর্ক ও বিচারের বিষয় নয়, বরং তর্কাতীত-উপলব্ধির বিষয় বা বস্তু। বিশ্বাসই এর প্রমাণ এবং শ্রদ্ধাই এর উপায়—এ'কথা বলেছেন পরশুরামকল্পসূত্রকার। তিনি বলেছেন : "গুরু-মন্ত্র-দেবতা-আত্মা-মন-পবনানাং ঐক্যানিষ্কলনাৎ অন্তরাত্ম-বিত্তিঃ" (১।১১)। কল্পসূত্রকারের অভিমত যে, মুক্তিই মানুষের একমাত্র কাম্য। এই মুক্তি শিবশক্তিসামরস্যানুভূতি। গুরু, মন্ত্র, দেবতা, জীবাত্মা, মন ও প্রাণবায়ুর একত্ব সাধন করলে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ হয়। পুনরায় কল্পসূত্রকার বলেছেন : "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং, তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং, তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাঃ......" (১।১২),—অর্থাৎ ব্রহ্মের রূপ আনন্দ ও সেই আনন্দ দেহের মধ্যেই অবস্থিত, পঞ্চ-মকার সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক। সুতরাং পঞ্চ-মকারের আন্তরার্থ অনুভব ক'রে তার দ্বারা সাধন করলে পঞ্চতত্ত্বের যথার্থ ধারণা জীবনে শাশ্বত আনন্দ লাভ হয়, অন্যথা বন্ধন।

এই আনন্দ-লাভের সার্থকতা কি ? পঞ্চ-মকার[৭] তো উপাদান ও উপায়। তাহলে আসল বস্তু বা লক্ষ্য কি ; যাকে অবলম্বন করলে সাধক বন্ধনমুক্তি লাভ করেন ? সিদ্ধসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় 'তন্ত্রতত্ত্ব'-গ্রন্থে লিখেছেন, তন্ত্র-সাধনায় দেবতা কালী বা মহাকালী অথবা গোপাল-কৃষ্ণ এক ও অভিন্ন—

মহাকালী মহাকালশ্চণকাকাররূপতঃ।
মায়য়াচ্ছাদিতাত্মানং তন্মধ্যে সমভাগতঃ ॥

মহাকালী ও মহাকাল অর্ধনারীশ্বরের মতো এক, অখণ্ড ও অদ্বিতীয় শিবশক্তিরূপে অবস্থিত। পরমাত্মাই মহারুদ্র, মহাবিষ্ণু ও মহাব্রহ্ম। মহাকাল ও কালী তাই অভিন্ন, এক ও অখণ্ড,—ব্রহ্মচৈতন্যের এপীঠ ও ওপীঠ।

॥ দীক্ষা ও অভিষেক ॥

শিবশক্তিসামরস্যের উপলব্ধি পেতে গেলে দীক্ষা ও অভিষেক প্রয়োজন। দীক্ষা অনেক রকম,—বৈদিকী, তান্ত্রিকী, বৈষ্ণবী ও বৌদ্ধ। দীক্ষা সাধনায় একটি অপরিহার্য অনুষ্ঠান, কারণ দীক্ষা ও অভিষেক[৮] ব্যতিরেকে কোন সাধনারই অধিকার লাভ ঘটে না। পরশুরামকল্পসূত্রের পরিশিষ্ট 'নিত্যোৎসব'-গ্রন্থে দীক্ষার আবশ্যকতা-সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

৭। পঞ্চ-মকার : মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা (কলাই ভাজা) ও মিথুন।

৮। অভিষেক বিভিন্ন রকমের—শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, সাম্রাজ্যাভিষেক, মহাসাম্রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি।

তাছাড়া দীক্ষা তিন রকম—শাম্ভবী, শাক্তী ও মান্ত্রী। কেননা দীক্ষা ও অভিষেক ছাড়া তন্ত্রসাধনায় কেউই অধিকার লাভ করেন না।

(১) শাম্ভবীদীক্ষায় গুরু কামেশ্বরী ও কামেশ্বরের রক্তবর্ণ ও শুক্লবর্ণ চরণদ্বয়ের বিন্যাস চিন্তা ক'রে তা থেকে ক্ষরিত অমৃতের দ্বারা শিষ্যের বাইরের ও ভিতরের মালিন্য (মল) দূর ক'রে দেন। এর নাম 'চরণবিন্যাসরূপ শাম্ভবীদীক্ষা'। শাম্ভবীদীক্ষা দান করেন সাধনসিদ্ধ জ্ঞানী গুরু। সাধারণ গুরু শাম্ভবীদীক্ষা দিতে পারেন না, অথবা সাধারণ শিষ্যও শাম্ভবীদীক্ষা-লাভের অধিকারী নয়। কামেশ্বরী বা ললিতা শ্রীবিদ্যারই অপর নাম। শ্রীবিদ্যার ভৈরব বা শিবের নাম কামেশ্বর। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত 'ললিতাসহস্রনাম'-গ্রন্থে শ্রীবিদ্যাসম্বন্ধে বলা হয়েছে—'শ্রীবিদ্যারাজবেদিনে',—অর্থাৎ শ্রীবিদ্যা বিদ্যারাজ। পণ্ডিত ভাস্কর-রায় 'সৌভাগ্যভাস্কর'-ভাষ্যে বলেছেন: "বিদ্যারাজঃ পঞ্চদশী তদ্বেদনং গুরুমুখাদুপদেশাঃ" (১।২৭।২৮), মূলে আছে—

শ্রীবিদ্যেব তু মন্ত্রাণাং তত্র কাদির্যথা পরা ॥
পুরাণ্যাং শ্রীপুরমিব শক্তীনাং ললিতা যথা।
শ্রীবিদ্যোপাসকানাং য যথা দেবী বরঃ শিবঃ ॥'

পণ্ডিত ভাস্কর-রায় ভাষ্যে লিখেছেন: "পুংদেবত্যা মন্ত্রাঃ স্ত্রীদেবত্যা বিদ্যা ইতি মন্ত্রবিদ্যায়োর্লক্ষণভেদোপাস্যা শিবশক্তিসামরস্যরূপত্বাদুভয়াত্মতেতি দ্যোতনায় মন্ত্রানাং মধ্যে বিদ্যেত্যুক্তম্ * * * 'পুংরূপং বা স্মরেদ্দেবি স্ত্রীরূপং বা বিচিন্তয়েৎ।' অথবা নিষ্কলং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণমিতি মাম্মমন্ত্রেঽপি স্ত্রীপুংসভেদেনভেদঃ। * * 'কাদিসংজ্ঞা ভবেদ্রূপা সা শক্তিঃ সর্বসিদ্ধয়ে' ইত্যাদি তত্রৈব দেবীপ্রতি শিববাক্যম্।" শ্রীশ্রীচণ্ডীর 'গুপ্তবতী'-টীকায় ভাস্কর-রায় দেবীর চৈতন্যময়ী রূপের পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীবিদ্যা ষোড়শী, ললিতা বা কামেশ্বরী। কামেশ্বরীদেবীর অপর নাম ত্রিপুরসুন্দরী[১]। শ্রীচক্রের অধিষ্ঠিতা ত্রিপুরসুন্দরীই 'শ্রীবিদ্যা' বা ললিতা। 'ললিতাসহস্রনাম-গ্রন্থে (১১।২৩৩-২৩৪) বলা হয়েছে—

'শ্রীচক্ররাজনিলয়া শ্রীমদ্ত্রিপুরসুন্দরী।
শ্রীশিবাশিবশক্ত্যৈক্যরূপিণী ললিতাম্বিকা ॥'

১। দেবী ত্রিপুরা—শ্রীবিদ্যা। ত্রিপুরার অন্য নাম সুন্দরী। ত্রিপুরা+সুন্দরী—ত্রিপুরসুন্দরী এই নামেও শ্রীবিদ্যা পরিচিতা।

পণ্ডিত ভাস্কর-রায় ভাষ্যে লিখেছেন : "ত্রিপুরস্য পরশিবস্য সুন্দরী ভার্য্যা। শ্রীমতী চ সা ত্রিপুরসুন্দরী চেতী তথা। অত্র ত্রিপুরাণি ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবশরীরাণি যস্মিন্ স ত্রিপুরঃ পরশিবঃ।" ত্রিপুরসুন্দরী পরমবৈষ্ণবী ও পরমশক্তিরূপিণী পরমেশ্বরী। কামেশ্বরী বা ত্রিপুরসুন্দরীর অন্য নাম ললিতা। ললিতার অর্থ ভাস্কর-রায় দিয়েছেন এ'ভাবে : "ললতেসৌ ললিতা ললিতা চ সাম্বিকা......"। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে : 'লোকানতীত্য ললতে ললিতা তেন সোচ্যতে'। এঁর ধ্যানেরও উল্লেখ করেছেন পণ্ডিত ভাস্কর-রায় বিভিন্ন পুরাণশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত ক'রে।

(২) শাম্ভবীদীক্ষার পর 'নিত্যোৎসব'-গ্রন্থে শাক্তীদীক্ষার বর্ণনা আছে। শাক্তীদীক্ষায় জ্ঞানবান গুরু শিষ্যের মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র-পর্যন্ত দীপ্ত ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতুল্য পরাসংবিদ্‌রূপা প্রকাশলহরী চিন্তা ক'রে কিরণজালের দ্বারা শিষ্যের পাপরূপ অজ্ঞানপাশ দগ্ধ (দূর) করেন। এর নাম শক্তিপ্রবেশরূপ শাক্তীদীক্ষা। এই দীক্ষায় গুরু নিজের ভিতর থেকে জাগ্রত ও প্রাণদীপ্ত শক্তি শিষ্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেন। সুতরাং আচার্য বা গুরু যদি জ্ঞানদীপ্ত হন তবেই তিনি শিষ্যের মধ্যে এই শক্তি সঞ্চার ক'রে জীবনজাগৃতি আনতে পারেন, অন্যথা নয়।

(৩) মান্ত্রীদীক্ষা আচারিক-অনুষ্ঠান। এতে ঘটস্থাপন, মণ্ডলনির্মাণ, মন্ত্ররচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান ক'রে যথাবিধি পূজা, হোমানুষ্ঠান ও শিষ্যকর্ণে বীজমন্ত্র দান করেন গুরু। আর-এক ধরণের দীক্ষা আছে,—বাগ্‌দীক্ষা। এতে মাত্র বীজমন্ত্রের উপদেশ আছে। এই দীক্ষা সাধারণত স্ত্রীলোকদের জন্য পূর্বে বিহিত ছিল। আজকাল এই ধরণের দীক্ষার প্রচলন নেই বল্লে চলে।[১০]

॥ নাদ ও বিন্দু ॥

মন্ত্রশাস্ত্রের মতে 'নাদ' সূক্ষ্মতম অব্যক্ত শব্দ এবং এটি ক্রিয়াশক্তির প্রথম অবস্থা। পরানাদ ও পরাবাকের সমষ্টি পরাশক্তি। পরাশক্তি মূলাধারবাসিনী চিতিরূপিণী কুণ্ডলিনীশক্তি। মূলাধারশক্তি ও সহস্রারশক্তি স্বরূপে এক ও সমপর্যায়ভুক্ত, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য : একটিতে মহাশক্তি থাকে সুপ্ত ও অপরটিতে মহাশক্তি থাকে চিদ্‌ঘনরূপে চিরজাগ্রত। শারদাতিলকতন্ত্রের টীকাকার পণ্ডিত রাঘবভট্টের মতে শব্দব্রহ্মই সর্বজীবাশ্রয়ী চৈতন্য ও প্রকৃতি। একেই বলা হয় ব্যাপকশক্তি কুণ্ডলিনী বা কুণ্ডলীরূপা কামকলা। সুতরাং নাদই বিন্দুর আকারে

১০। মতান্তরে আণবী, শাক্তেয়ী ও শাম্ভবী-ভেদে দীক্ষা তিন রকম। এ'সম্বন্ধে রুদ্রযামল, লঘুকল্পসূত্র, বরদাতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র, দীক্ষাপ্রকাশ প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

রূপায়িত হ'য়ে সম্পরিষক্তচৈতন্য-শিব ও শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। মন্ত্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে নাদ প্রথম অবস্থায় বিকাশোন্মুখী শক্তিরূপে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় বিন্দু বা শব্দব্রহ্মরূপে,—অর্থাৎ বিন্দু, নাদ ও বীজরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই ত্রিবিন্দুই আসলে কামকলা-কুণ্ডলিনীশক্তি। বাক্যরূপী নাদ বীজমন্ত্রের সাহায্যে সুপ্তা কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করে এবং এই জাগরণের নাম মন্ত্রচৈতন্য। আদিনাদ ওঙ্কার মহাবীজ, সুতরাং তার জাগরণে শব্দব্রহ্মচৈতন্যের প্রত্যক্ষ-অনুভূতি হয়। শারদাতিলকতন্ত্রে (১।১০৮-১১১) আছে—

সা প্রসূযতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিভুঃ।
শক্তিং ততো ধ্বনিস্তস্মান্নাদস্তস্মান্নিরোধিকা ॥—প্রভৃতি[১১]

॥ মন্ত্রের আধার বা প্রতিষ্ঠা বর্ণমালা ॥

মন্ত্রের আধার বা প্রতিষ্ঠা বর্ণমালা। বর্ণমালাই বর্ণমাতৃকা বা মাতৃকা,—মন্ত্রমাত। মাতৃকা বর্ণাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী নামেও অভিহিতা। আবার বিদ্যুজ্জিহ্বা সরস্বতী। বর্ণ প্রকাশ করে মাতৃকাকে। বর্ণময়ী সরস্বতী 'বোধদীপিকা',—অর্থাৎ বর্ণ'ই ভাব ও রূপের স্রষ্টা এবং তাদের থেকেই সিদ্ধবীজমন্ত্রের বোধ বা জ্ঞান হয়। হ্রীং, ক্রীং, ঐং, শ্রীং, ক্লীং প্রভৃতি বর্ণবীজ। বীজমন্ত্রের যথার্থ উচ্চারণে (intonation) ও ধ্যানে দেবতাদের বাস্তব রূপায়ণ ঘটে ও জ্ঞাননদৃষ্টিতে তাঁরা প্রত্যক্ষ হন। প্রথম অবস্থায় এ'র নাম দেবতাসিদ্ধি ও পরে এই থেকে জীবনসিদ্ধিরূপ অপরোক্ষজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয়। বীজের সঙ্গে যেমন বৃক্ষের, ফুল ও ফলের সম্বন্ধ, তেমনি ঐং, ক্লীং, হ্রীং, প্রভৃতি বীজমন্ত্রের সঙ্গে দেবতাতত্ত্ব ও দেবীতত্ত্বের সম্বন্ধ। বীজমন্ত্রকে প্রদীপ্ত তথা জাগ্রত করলে মন্ত্রচৈতন্যের প্রকাশ হয় ও মন্ত্রের সঙ্গে দেবতার মিলন হয়।

॥ নাম ও নামী ॥

বীজমন্ত্রের বিশ্লেষণ মন্ত্রের বর্ণজ্ঞানকে প্রকাশ করে। প্রতিটি বর্ণ'ই নাম এবং নামীরূপ দেবতা তার পিছনে থাকেন। নাম বা মন্ত্র জপ করার অর্থ নামী বা দেবতাকে আহ্বান করা। ঋষি পতঞ্জলী বলেছেন : 'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্'। যে মন্ত্র জপ করা হয় তার অর্থ বলতে জপে তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার রূপ চিন্তা করা। দেবতার রূপ, ভাব ও মহিমার সঙ্গে সাধককে পরিচিত করিয়ে দেওয়াই জপের আসল কাজ। হ্রীং—মায়াবীজ ও শক্তিবীজ। হ্রীং বা ক্রীং—দক্ষিনাকালীর বীজ, হুং—কূর্চবীজ,

১১। এই শ্লোকের উপর পণ্ডিত রাঘবভট্টের টীকা দ্রষ্টব্য।

রং—অগ্নিবীজ, ঐং—সরস্বতী, শিব, সূর্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের বীজ প্রভৃতি। বীজমন্ত্রের বীজগুলির বিশ্লেষণ করলে পাই: (১) মায়াবীজ হ্রীং=হ্-র্-ঈ-ম্, অর্থাৎ হ্-শিব +র্-শক্তি+ঈ—মহামায়া+ম—নাদ ও বিন্দু। দেবীগীতায় এ'গুলিকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, তুরীয় ও কারণাতীত প্রভৃতি তত্ত্বে ও অংশে ভাগ করা হয়েছে। পুনরায় দুর্গাবীজ—দুং=দ—দুর্গা+উ—রক্ষয়িত্রী+নাদ—বিশ্বজননী+বিন্দু—ঈশ্বর।[১২]

মন্ত্রাক্ষরই মাতৃকাবর্ণ। মাতৃকাবর্ণ ও মাতৃকাশক্তি এককথা। মাতৃকা-শক্তিই পরমেশ্বরী মহাশক্তি। মহাশক্তি স্বরূপে শিব, সদাশিব ও মহাকাল। কালী কাল বা মহাকালের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাছাড়া মাতৃকাবর্ণ ও মাতৃকাশক্তির রূপ সার্থক হয় নাদ, বিন্দু, বর্ণ, পদ ও বাক্য প্রভৃতিকে নিয়ে। আসলে প্রতিটি মাতৃকাবর্ণে বা অক্ষরেই শক্তি নিহিত। এই শক্তিমান অক্ষর পরাশব্দ এবং পরাশব্দই শব্দব্রহ্ম। শব্দব্রহ্মের বাহ্যরূপ ওঙ্কার,—যা অকার, উকার, মকার, বিন্দু, নাদ, শক্তি ও শান্ত এই সাতটি মাত্রাভেদকে নিয়ে সার্থক।[১৩] ওঙ্কারকে স্থূলশব্দের কারণ বলে, কেননা শব্দব্রহ্মরূপিণী কুণ্ডলিনী থেকে শক্তির বিকাশ, শক্তি থেকে ধ্বনি, ধ্বনি থেকে নাদ, নাদ থেকে নিরোধিকা, নিরোধিকা থেকে অর্ধেন্দু, অর্ধেন্দু থেকে পরা, পশ্যন্তী প্রভৃতি বাক্,—যাকে বলা যায় ধ্বনির বিকাশ। ঐ ধ্বনি স্থূলভাবে আত্মপ্রকাশ করে বৈখরী-অবস্থায় মুখে। এ'সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা গূঢ়ার্থদীপিকা, পদার্থাদর্শ, সৌভাগ্যভাস্কর প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

॥ মন্ত্র ও মাতৃকার সাধন ॥

মাতৃকার রূপের অপর নাম বর্ণমালা। বর্ণমালাই মুণ্ডমালারূপে দক্ষিণাকালী, বামাকালী, তারা ও অন্যান্য কালীর গলদেশে শোভমান। মুণ্ডমালার প্রতিটি নরমুণ্ড বর্ণেরই প্রকাশক। সাধক কমলাকান্ত গেয়েছেন: 'ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি'। বর্ণ বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে কারণাকারে, অর্থাৎ অব্যক্ত বা অব্যাকৃতরূপে প্রকৃতিগর্ভে লীন থাকে, সেজন্য স্থূলসৃষ্টির পূর্বে কারণাকারে মুণ্ডমালা বা বর্ণমালা থাকে। ডক্টর শিবশংকর অবস্থী তাঁর হিন্দীগ্রন্থ 'মাতৃকা ঔর মাতৃকায়োঁ কা রহস্য'-গ্রন্থে বিশদভাবে মাতৃকা ও বর্ণমালার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

---

১২। প্রতিটি মন্ত্রেই প্রণব, বীজমন্ত্র, দেবতার নাম ও কীলক প্রভৃতি সংযুক্ত থাকে। মোটকথা ইষ্টমন্ত্রে ওই সকলের সমাবেশ থাকেই।

১৩। আবার অ+উ+ম+চন্দ্রকলা+বিন্দু=ওঙ্কার। চন্দ্রকলা বা মহাপ্রকৃতি শক্তি+বিন্দু=ব্রহ্ম, সুতরাং ওঙ্কারে ৫টি অক্ষর বা বীজমন্ত্র থাকে।

মাতৃকার মোটামুটি চারটি রূপ : (১) কেবল, অর্থাৎ বিন্দু-বিসর্গরহিত, (২) বিন্দুযুক্ত, (৩) বিসর্গযুক্ত, (৪) বিন্দু ও বিসর্গযুক্ত। বিন্দু ও বিসর্গযুক্ত মাতৃকাবর্ণই মন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। তন্ত্রসার ও পরশুরামকল্পসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে মাতৃকার বিচিত্র রূপের পরিচয় দেওয়া আছে। দেবতা ও দেবীপূজায় অনুলোম, বিলোম, সংহার প্রভৃতি মাতৃকাবর্ণের ব্যবহার আছে। পূজার সময়ে শরীরের সকল অঙ্গে মাতৃকাবর্ণের ন্যাস করা হয়। পূজার সময়ে স্থূলশরীব যে মাতৃকারই বিকাশ—এই ন্যাস থেকে তা বুঝা যায়। 'সৌভাগ্যভাস্কর'-ভাষ্যে পণ্ডিত ভাস্কররায় মাতৃকা-সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তন্ত্রালোকে মাতৃকাকে দেবীরূপে কল্পনা ক'রে বলা হয়েছে,—শুদ্ধা-মহাবিদ্যা ও বাগেশ্বরী।

॥ দশমহাবিদ্যা ও তাঁদের তত্ত্ব ॥

(১) মহাবিদ্যা দেবীগণের তথা দশমহাবিদ্যা সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। কিন্তু দশমহাবিদ্যাব মধ্যে দেবী ছিন্নমস্তা রহস্যময়ীদেবী,—যাঁর সাধনায় সাধক জন্মমৃত্যুপ্রবাহের পারে পরাশান্তির অধিকারী হ'তে পারেন। সে'জন্য পূর্বে দশমহাবিদ্যা সম্বন্ধে কিছুটা বর্ণনা করলেও জীবনরহস্যের পারে উপনীত হওয়ার জন্য পুনরায় দেবী ছিন্নমস্তার এখানে আলোচনা করি।

তন্ত্রে ষট্‌চক্রসাধনার আলোচনা অবশ্য পবে বিশেষভাবে কবার চেষ্টা কববো, কিন্তু তাহলেও দেবী ছিন্নমস্তার আলোচনার সময়ে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না-নাড়ী-সংস্থানের কথা অবশ্যই স্মরণ করি। সুষুম্না মধ্যগা বা শরীরের মধ্যস্থানে সকল চক্র ভেদ ক'রে সহস্রারচক্রে উপনীত এবং মহাশক্তি কুণ্ডলিনী ঐ মধ্যগামিনী সুষুম্নার মধ্য দিয়েই ঊর্ধ্বগতি ও অজ্ঞাচক্রাদি ভেদ ক'রে সহস্রারে মিলিত হয়। ষট্‌চক্রসাধনায় যেমন সাধক বামে ইড়া ও দক্ষিণে পিঙ্গলাপথ পরিত্যাগ ক'বে সোজাসুজি সুষুম্নাপথে কুণ্ডলিনীকে পরিচালিত করেন এবং সহস্রারে পরমশিবের সঙ্গে কুণ্ডলিনীকে মিলিত ক'রে সামরস্যমুক্তি লাভ ও জন্মমৃত্যুপ্রবাহ সংসারচক্রকে অতিক্রম করেন, তেমনি মহাবিদ্যা-ছিন্নমস্তার সাধনায় ও ধ্যানে সুষুম্নাপথেই মনকে ও মনের সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তি-কুণ্ডলিনীকে পরিচালিত কবেন। ছিন্নমস্তাদেবী সুষুম্নারূপ মুক্তিপথেরই দিশারী। বামে ও দক্ষিণে ইড়ায় ও পিঙ্গলায প্রবাহিত রক্তধারা পানে উন্মাত্তা তাই ছিন্নমস্তাদেবীর দুই সংসাররূপ বন্ধনাভিলাসিনী ডাকিনী, কিন্তু দেবী নিজে মধ্যগামিনী সুষুম্নাবাহী রক্তধারাবূপ মুক্তির অভিলাষিনী, কারণ মুক্তিময়ী দেবীই ছিন্নমস্তা। ছিন্নমস্তা মুক্তিরূপ পরাজ্ঞানেরই স্বরূপিণী।

ষট্‌চক্র,—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা এবং সহস্রার সপ্তমচক্র পরমশিবরূপ শুদ্ধচৈতন্যের স্থান। সাধক মূলাধার থেকে কুণ্ডলিনী-শক্তিকে অনাহতচক্রের পরে বিশুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করলে সেই শক্তি ঊর্ধগামিনী হয়, আর নিম্নগামী হয় না। বিশুদ্ধচক্র এ'জন্য শক্তি বা মুক্তিদ্বাররূপে কল্পিত। তবে আজ্ঞাচক্রই যথার্থভাবে মুক্তিদ্বাররূপে কথিত। আজ্ঞাচক্র ও সহস্রারের মধ্যে একটি স্বচ্ছ ও পাত্‌লা আবরণ থাকে,—যেখান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগীরা বলেছেন সহস্রারের মাধুর্য দর্শন করা যায়। দেবী ছিন্নমস্তা বিশুদ্ধচক্রেই মস্তক ছিন্ন করেছেন, কেননা রুধির বা কুণ্ডলিনী সর্বদাই ঊর্ধগামিনী সুষুম্নাপথে। বিশুদ্ধচক্রে সুষুম্নার মুক্তিময় রুধির পান করেন মহামুক্তিময়ী দেবী ছিন্নমস্তাস্বয়ং, কারণ মুক্তিরই তিনি প্রতীক ও দিশারী। মুক্তিরই তিনি সত্তা ও স্বরূপ। ইড়ার (বামে) ও পিঙ্গলার (দক্ষিণে)[১৪] সংসারমুখী রুধির তাই দেবীর সহচারিনীরা পান করেন। সাধকের পক্ষেও তাই যে, মূলাধার থেকে অনাহত ভেদ ক'রে বিশুদ্ধচক্রে[১৫] উপনীত হ'য়ে কুণ্ডলিনীর স্থিতি বা প্রতিষ্ঠা হ'লে ঊধর্গামী হ'য়ে আজ্ঞাচক্র ভেদ করে ও সহস্রার থেকে আজ্ঞার অন্তর্বর্তী ক্ষুদ্র চক্রগুলিকে ভেদ ক'রে সহস্রারে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হয় এবং তখনই চৈতন্যময়ী কুণ্ডলিনী-শক্তির সঙ্গে পরমশিবের মিলন হয়। এরই নাম সামরস্যানুভূতি।

(২) ছিন্নমস্তার ধ্যান ও রূপচিন্তার তাই একটি গভীর তত্ত্ব নিহিত বা লুকানো আছে সে'কথা বলেছি। এই রহস্য বা তত্ত্বের উদঘাটন ও উপলব্ধি করলে সাধক জন্ম-মৃত্যুর পারে উপনীত হন ও মুক্তিলাভ করেন। কামকলারূপিণী কুণ্ডলিনীশক্তি অধোগামী হ'লে জন্ম-মৃত্যুর চক্র চল্‌তেই থাকে। দেবী ছিন্নমস্তার পাদপীঠ রচিত

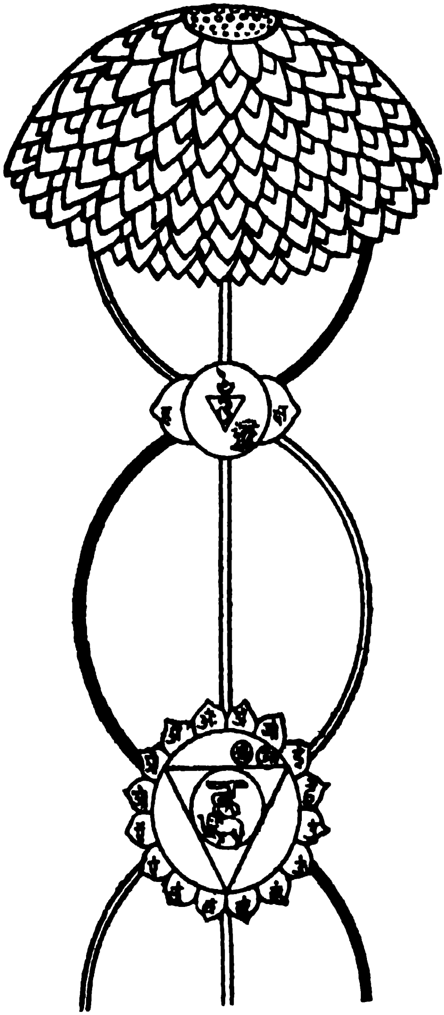
১৪। "মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্রসূর্যাগ্নিরূপা"। ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে আছে:— "বামগা যা ইড়া শুক্লা চন্দ্রস্বরূপিণী।"

১৫। বিশুদ্ধচক্র:—Sir John Woodroff তাঁর *Serpe t-Power*-গ্রন্থে বলেছেন: "In the *throat* is the Lotus, called the *Viśuadha*, whi h is pure and of a smoky purple hue. The *Viśuaaha* is possessed of sixteen petals".

এই বিশুদ্ধচক্র থেকে আজ্ঞাচক্রে সহজেই যাওয়া যায়। ঊর্ধগতিই হয় জাগ্রত মহাশক্তি-কুণ্ডলিনীর। আজ্ঞাচক্র মুক্তিদ্বার বিশেষ। আজ্ঞার পর সহস্রারচক্র পরমশিবের স্থান। দেবী ছিন্নমস্তা গলদেশে অবস্থিত বিশুদ্ধচক্রেই ছিন্ন করেছেন তাঁর মস্তক। দেবী ছিন্নমস্তাকে সে'জন্য *'The Syn.bol of Evert, anquil Mukti'* বলা যায়। এই বিশুদ্ধচক্র থেকে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না ঊর্ধগা এই তিনটি নাড়ীর রুধিরধারার উৎপাত, কিন্তু ডাকিনীরা ইড়া ও পিঙ্গলার ও দেবী সুষুম্নার রুধির পান করেন।



দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবী ছিন্নমস্তার দুই দিকে ইড়া ও পিঙ্গলার রক্ত পান করছে দুই যোগিনী ও মধ্যে সুষুম্নার রক্ত পান করছেন মুক্তিময়ী দেবী ছিন্নমস্তা।



(৭) সহস্রারচক্র

(সহস্রার ও আজ্ঞাচক্রের মধ্যবর্তী স্থানে আরও কতকগুলি পুষ্পচক্র আছে)

(৬)

(৫) বিশুদ্ধচক্র

মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তার প্রকাশক বা নির্দেশক বিশুদ্ধচক্র।

হয়েছে স্ত্রী ও পুরুষের মিথুনসত্তার উপর। দক্ষিণাকালীর ধ্যানে যেমন আছে : 'মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্',—তেমনি দেবী মহাকাল-শিবের উপর বীরাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে বিপরীতরতাতুরা, তথা দেবী ছিন্নমস্তার পীঠাসন রচিত 'বিপরীতরতাশক্তৌ'। পুরুষের উপর স্ত্রীশক্তির স্থিতির অর্থ জন্ম-মৃত্যু-নিরোধিনী শক্তি জাগ্রতা ও ঊর্ধ্বগামিনী। তখন শক্তি কুণ্ডলিনী মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র ভেদ ক'রে সহস্রারচক্রে চিরজাগ্রত চিন্ময়-শিবের সঙ্গে সম্পরিসক্ত বা মিলিত হন। এই মিলনরূপ শিবশক্তিসামরস্যের অনুভূতি লাভ করাই তন্ত্রসাধনার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা।

(৩) ছিন্নমস্তা 'মহাঘোরাং দংষ্ট্রাকরালবদনাং' ও 'কপালকর্তৃকাহস্তাং ভীমাম্' হ'লেও প্রসন্নাং ও বরদাম্। দেবী খড়্গের দ্বারা নিজ মুণ্ড ছিন্ন ক'রে সুষুম্নায় প্রবাহিত ঊর্ধ্বগামী রুধিরধারা পান করছেন। রুধিরধারা বিচ্ছুরিত কামকলাশক্তি এবং পান করার অর্থ মস্তকে সহস্রারে পরমশিবের সঙ্গে শক্তির মিলনসাধন ও শাশ্বত আনন্দ-ভোগ। বামে ও দক্ষিণে প্রবাহিতা রুধিরধারা ইড়া ও পিঙ্গলা। ঐ রক্তধারাদুটি পান করছে দেবীর ভোগকামীনীরা। ইড়া ও পিঙ্গলায় শক্তি প্রবাহিত হ'লে জন্মমৃত্যুপাশ ছিন্ন হয় না, সাধক বাসনার সংসারেই বারবার যাতায়াত করতে থাকে। জন্ম-মৃত্যুচক্রের গতি রুদ্ধ বা বন্ধ হয় শক্তি (কুণ্ডলিনী) যদি সুষুম্নাপথে পরিচালিত হ'য়ে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হন। মধ্যে সুষুম্নাপথে প্রবাহিতা ক্ষরিত রক্তধারা দেবী পান করেন। মধ্যগামিনী রক্তধারা শিবশক্তিসামরস্যরূপ অমৃতধারা। মূলাধারশক্তি কুণ্ডলিনী প্রদীপ্তা ও জাগ্রতা হ'য়ে সহস্রারে পরমশিবের সঙ্গে তখন মিলিত হয়।

(৪) স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ দেবী কালীকার প্রসঙ্গে 'মহারাজের কথা'-গ্রন্থে ছিন্ন মস্তার কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন : "ছিন্নমস্তা নিজের মাথা নিজে কেটে নিজেই রক্তপান করছে, অথচ পেট নেই। এ'সব mystery (রহস্য) বোঝে কে ?" কথাটা ঠিকই, তবে পেটে বা উদরে রক্ত যাওয়ার কোন সার্থকতা নাই, কেননা রক্তধারা—বিশেষ ক'রে সুষুম্নায় (মধ্যস্থানে) প্রবাহিত রক্তধারা কামকলা-কুণ্ডলিনীর জাগৃতি ও গতি, সুতরাং তা ঊর্ধ্বগামী অমৃতধারা। ঐ কামকলা-কুণ্ডলিনী মূলাধার থেকে উঠে আবার যদি উদরে যায় তবে মূলাধারে তার ফিরে আসার ফলে জন্মমৃত্যুচক্রের অবসান হয় না। তাই রক্তধারা তথা কামকলাশক্তি বিশুদ্ধচক্র ভেদ ক'রে ক্রমে আজ্ঞাচক্রে ও পরে আজ্ঞাচক্র ভেদ ক'রে সহস্রারে পরম-শিবের সঙ্গে মিলিত হয়। দেবী ছিন্নমস্তার স্কন্ধ বিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধচক্র ও আজ্ঞাচক্রের মধ্যবর্তী স্থানে। সুতরাং মহাশক্তি কুণ্ডলিনী বিশুদ্ধচক্র ত্যাগ করলে আর অধোগামী

হয় না, ক্রমে তা উর্ধ্বে আজ্ঞাচক্রের দিকেই ধাবিত হয় সহস্রারে শিবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। দেবী ছিন্নমস্তার গলদেশ থেকে উর্ধ্বে ক্ষরিত মধ্যস্থানের রক্তধারাকে দেবী তাই পান করেন আজ্ঞাচক্র ভেদ ক'রে সহস্রারপদ্মে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। এই মিলনেই মুক্তি ও সংসারচক্রের অবসান হয়। ছিন্নমস্তার মূর্তি তাই মুক্তিরূপ শিবশক্তিসামরস্য-লাভেরই দিশারী বা প্রতীক। এই তত্ত্ব, রহস্যময় সাধারণগম্য নয়।

(৫) দেবী ছিন্নমস্তা মুক্তিকামী শক্তিসাধকদের কাছে তার জ্বলন্ত আদর্শবিশেষ। ছিন্নমস্তামূর্তি শিক্ষা দেয়, শক্তিসাধনায় শক্তিসাধকরা মূলাধারে কামকলা-শক্তিকে জাগ্রত ও প্রদীপ্ত ক'রে সুষুম্নাপথে তাকে বিভিন্ন চক্রের (**levels of consciousness**) মধ্য দিয়ে মস্তকে প্রস্ফুটিত-সহস্রারপদ্মবাসী শিবের সঙ্গে মিলিত করা। এই মিলনের নাম শিবশক্তিসামরস্য। এই সামরস্যের উপলব্ধিই শক্তিসাধকের জীবনের চরমলক্ষ্য সে'কথা বলেছি। বেদান্তে একেই বলে অদ্বিতীয়-ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি ও অজ্ঞানের আবরণভঙ্গ।

(৬) তান্ত্রিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধনরহস্যের দিক থেকে দেবী ছিন্নমস্তার অর্থ ও তত্ত্ব হয়তো এ' থেকে একটু ভিন্ন, কিন্তু প্রত্যেক ধর্মের বা ধর্মমতের ভিতর যেমন মতভেদ, আচারভেদ ও সম্প্রদায়ভেদ থাকা স্বাভাবিক, তেমনি গৌড়ীয়, কাশ্মীরীয়-ত্রিক ও দ্রাবিড়ী বা কেরলীয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে আচারাদিভেদে সাধনা ভিন্ন ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বৈষ্ণবাদি-সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। শৈবেরা শৈব ও শাক্ত এবং বৈষ্ণবেরা বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য এই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাছাড়া বিরাগমতন্ত্রে শৈবেরা সামান্যশৈব, পূর্বশৈব, শুদ্ধশৈব ও মিশ্রশৈব-সম্প্রদায়ে বিভক্ত। পুনরায় বাম, পাশুপাত, সোম, লাঙ্গল, ভৈরব, কাপাল বা কাপালিক ও নাকুল প্রভৃতি গৌণ-সম্প্রদায়েও তারা বিভক্ত। তান্ত্রিক কাপালিকদের দু'টি শ্রেণীঃ একটি, বৈষ্ণব বা শৈব ও অপরটি, তান্ত্রিক। কাপালিকরা সাধারণত নরকপালে মাংসাদি খাদ্য ব্যবহার করেন এবং দেবীশক্তি তাঁদের আরাধ্যা হলেও বিচিত্র রকমের যোগসিদ্ধাই তাঁরা কামনা করেন।

॥ কাদি প্রভৃতি সম্প্রদায় ও মতবাদ ॥

শক্তিসাধনা বা তন্ত্রসাধনায় কাদি, হাদি ও ক-হাদি এই তিনটি সম্প্রদায় বা মতবাদের প্রচলন আছে। এই সকল মতবাদী তান্ত্রিকসাধকদের সাধারণভাবে কুলধর্মী 'কৌল' বলে। 'কুল'-শব্দে কালী বা শক্তি ও 'অকুল'-শব্দে শিব। 'কৌল'-

শব্দটি অবশ্য বহু অর্থের বোধক বা দ্যোতক। নির্বাণতন্ত্রে কৌলদের বিচিত্র আচার ও অনুষ্ঠানের এবং দেবতা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কৌল বা কৌলিক-তন্ত্রসাধকরা প্রধানত পূর্বকৌল, উত্তরকৌল, দিগম্বর ও ক্ষপণক এই চারভাগে বিভক্ত। তাঁরা বসনাদি পরেন না,—দিগম্বর এবং শিব ও শক্তির সঙ্গে নিজেদের একাত্ম চিন্তা করেন। এঁরা বামাচারী। তবে বৌদ্ধ-বামাচারীরা তারাদেবীর উপাসক। এঁরা দেবীকালিকার পূজা করেন না।

॥ তন্ত্রে দু'টি কুল ॥

তন্ত্রসাধনায় দুটি বিশেষ কুল বা সম্প্রদায়ের প্রচলন আছে। এই দুটি কুল : (১) কালীকুল, (২) শ্রীকুল। বাঙলাদেশে কালীকুলের ও দক্ষিণ-ভারতে শ্রীকুলের প্রচলন।

(১) **কালীকুলের** শক্তিসাধকরা সাধারণত অদ্বৈতবাদী। তাঁরা বলেন, সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবী ব্রহ্মস্বরূপিণী ও তাঁর মায়া বিবর্ত, পরিণামী নয়। তাঁদের মতে, চিন্ময়ী দেবী,—'বিশুদ্ধা পরাচিন্ময়ী স্বপ্রকাশামৃতানন্দরূপা জগদ্ব্যাপিকা চ'। তাছাড়া কালীকুলের সাধকরা মনে করেন যে, শিবশক্তিতত্ত্ব গুণাতীত, নির্দ্বন্দ্ব ও একমাত্র বোধস্বরূপ বা উপলব্ধিগম্য,–'ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা'। মহাকাল-সংহিতায় এ'কথাই বলা হয়েছে। তাছাড়া কালীকুলের শক্তিসাধকরা মনে করেন যে, জীবের অদৃষ্টজন্য ব্রহ্মে তাদাত্ম্যস্বরূপীভূতা মায়ার বিকাশ বা আবির্ভাব। সেই মায়া অদ্বৈতবেদান্তমতের মতো আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিদুটির সাহায্যে বিবর্ত সৃষ্টি করে। আবার ব্রহ্মস্বরূপা বা ব্রহ্মময়ী মহাশক্তিতে তাদাত্ম্যস্বরূপীভূতা মায়াকে তাঁরা প্রধানা বা মূলাপ্রকৃতিরূপেও স্বীকার করেন। নির্বাণমুক্তি ও জীবন্মুক্তি তাঁরা স্বীকার করেন এবং এই মুক্তি শিবশক্তিসামরস্যানুভূতিতে সার্থক হয়।

(২) **শ্রীকুলের** শক্তিসাধকরা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা প্রত্যভিজ্ঞাদ্বৈতবাদী। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠের এঁরা অনুসারী। শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন এবং 'শিবার্কমণিদীপিকা' নামে পণ্ডিত অপ্পয়দীক্ষিত শ্রীকণ্ঠভাষ্যের উপর বিশদ ভাষ্য রচনা করেছেন। ভাষ্য, টীকা প্রভৃতিতে শিবভট্টারককে এক ও অখণ্ড ব লে স্বীকার করলেও শ্রীকণ্ঠ রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈতই তাঁর ভাষ্যে প্রতিপন্ন করেছেন। শ্রীকুলের সাধকরা শিবের সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব স্বীকার করেন।

শ্রীকুলের সাধকরা যখন প্রত্যভিজ্ঞাদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করেন, তখন তাঁরা শিব বা শিব-ব্রহ্মের সৎ ও চিৎ-প্রকাশত্বও স্বীকার করেন। শক্তি বিমর্শ বা বিমর্শিনী,

—অর্থাৎ অনাদি, অব্যয় ও অদ্বিতীয় শিবের স্বতঃসিদ্ধা স্পন্দস্বরূপা। এই বিমর্শশক্তিই বৈষ্ণবদের অভিন্নস্বরূপা হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধার সমতুল্যা। শিব এঁদের মতে পরমানন্দ ও মায়াগর্ভ এবং মায়া বা বিমর্শশক্তিই আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের সমষ্টি। নির্বিকল্প-অবস্থায় শিব ও শক্তি চণকাকারে এক ও অদ্বিতীয়ভাবে থাকেন এবং তখনই সাধক শিব-শক্তির সামরস্যজনিত সুখ ও আনন্দ উপলব্ধি ক'রে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূজানুষ্ঠানের সময়ে (১) শ্রীকুলের সাধকগণ প্রথমে গুরু ও গুরুশক্তির অর্চনা করেন, আর (২) বিষ্ণুক্রান্তার সকলেই কালীকুল-অনুসারে পূজাগত অনুষ্ঠান করেন।

॥ উত্তর-ভারতে তন্ত্রে তিনটি ধারা ও তারাদেবী ॥

তন্ত্রসাধনার আসলে তিনটি ধারা বা সম্প্রদায়ঃ (১) গৌড়ীবঙ্গীয়, (২) কাশ্মিরীয় ও (৩) দ্রাবিড়ীয়। এদের আলোচনা পূর্বে সংক্ষেপে করেছি। বাঙলাদেশে (এমন কি পূর্বের বৃহত্তরবঙ্গে তথা বিহার, আসাম, বাঙলা ও উৎকলে) দেবী কালিকা বা দক্ষিণাকালিকা এবং দশমহাবিদ্যার উপাসনা ও সাধনার প্রচলন ছিল এবং এখনও আছে। দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবী তারা দশমহাবিদ্যারই অন্যতমা দেবী। বিভিন্ন তন্ত্রে তারাদেবীর রূপ, বীজ, মন্ত্র, যন্ত্র ও পূজা কল্পনা করা হয়েছে। বৌদ্ধতন্ত্রে দেবী তারার রূপভেদ অনেক।[১৩] পূর্বেই বর্ণনা করেছি তারাদেবীর ধ্যান—

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ ॥—প্রভৃতি

ভিন্ন ভিন্ন বীজাক্ষর-অনুসারে তারাদেবীর রূপকল্পনা ভিন্ন ভিন্ন রকমের। যেমন, পঞ্চাক্ষরী একজটা বা নীলসরস্বতী, ত্র্যক্ষরী উগ্রতারা বা মহানীলসরস্বতী প্রভৃতি। দেবী তারা-সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক হীরানন্দ শাস্ত্রী *The Origin and Cult of Tara*-গ্রন্থে লিখেছেন, দেবী তারা ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ এই উভয় ধর্মেই শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিতা। দেবী তারার প্রধান তিনটি রূপ,—একজটা, নীলসরস্বতী ও উগ্রা,—যদিও দেবী তারার আরও অনেক রূপের ও নামের প্রচলন আছে। প্রধানভাবে দেবী তারার তিনটি রূপ ও নাম হলেও স্বরূপত তিনি এক ও অদ্বিতীয়া, —'একৈব হি মহাদেবী নামমাত্রং ত্রিধা ভবেৎ'। অগ্নিপুরাণে দেবী তারা অক্ষোভ্যা ও

১৩। তারাদেবী সম্পর্কে অবশ্য পূর্বেও আলোচনা করেছি সংক্ষেপে।

সর্বজ্ঞা দুই 'যোগিনী' নামে পরিচিতা। ব্রাহ্মণ্যধর্মে দেবী তারা পরমসিদ্ধিদায়িনী,—নৈব তারাসমা কচিদ্দেবতা সিদ্ধিদায়িনী'। মাননীয় কৃষ্ণশাস্ত্রীর মতে, কাঞ্চীভরমে প্রতিষ্ঠিতা কামাক্ষীদেবী নাকি বৌদ্ধতারাদেবীরই রূপভেদ বা অভিন্নরূপ। দাক্ষিণাত্যে তারাদেবীর বিশেষ পূজার প্রচলন নাই। পণ্ডিত হেমেন্দ্র 'অভিধান-চিন্তামণি-গ্রন্থে জৈনদেবীরূপে তারাকে শ্রদ্ধার আসন দিয়েছেন,—যদিও জৈন-সম্প্রদায় ঠিকভাবে তারাদেবীকে মুখ্যদেবতারূপে গ্রহণ করেন নি।

॥ বিভিন্ন রূপে দেবী কালিকা ॥

দেবী কালিকার প্রধানত দুটি রূপঃ (১) দক্ষিণাকালী ও (২) বামাকালী। তাছাড়া শ্যামাকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী প্রভৃতির পূজারও বাঙলাদেশে প্রচলন আছে সে'কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। দেবীর রূপভেদে সাধনার ধারা এবং উপচার ও আঙ্গিক প্রক্রিয়াদিতেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। তন্ত্রসাধক দীক্ষিত হওয়া ছাড়াও সাধনায় অধিকার লাভের জন্য অভিষিক্ত হন। অভিষেক যেমন শাক্ত্যাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, রাজ্যাভিষেক, সাম্রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি। সাধারণত পূর্ণাভিষেকেই সকল রকম শক্তিপ্রতিমার পূজায় অধিকার আসে। পূর্ণাভিষেকের পূর্বে শাক্ত্যাভিষেকের বিধি আছে। পুরশ্চরণাদির পর শাক্ত্যাভিষেক থেকে পূর্ণাভিষেকের অধিকার লাভের বিধিব্যবস্থা আছে। আবার শাক্ত্যাভিষেক ব্যতীতই আচার্য সাধককে পূর্ণাভিষেক দিতে পারেন। শাক্ত্যাভিষেক লাভ ক'রে সিদ্ধকালীর পূজা-অর্চনা ও বিধিমত সাধনা করেন সাধকগণ। পূর্ণাভিষেক লাভ করার পর দেবী দক্ষিণাকালীর সাধনায় সাধক অধিকার (যোগ্যতা) লাভ করেন। তখন তিনি পাদুকামন্ত্রলাভের অধিকার পান। সম্প্রদায়ভেদে ও আচারভেদে অনেক সময়ে পাদুকামন্ত্রে বর্ণভেদ দেখা যায়। পাদুকামন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন হ'লে এক সম্প্রদায়ের চক্রানুষ্ঠানে অপর সম্প্রদায়ের সাধকের প্রবেশাধিকার থাকে না। পূর্ণাভিষিক্তপক্ষে পাদুকামন্ত্রের প্রতিদিন জপ করা অবশ্যকর্তব্য। পাদুকামন্ত্রে শিব শক্তির বর্ণবীজ 'হেসৌ' এবং 'হ স ক্ষ ম ল ব র য়ূঙ্' প্রভৃতি বর্ণের সমাবেশ থাকে। বিদগ্ধ তন্ত্রসিদ্ধসাধক জগন্মোহন তর্কালঙ্কার-লিখিত 'রহস্যপূজা' দ্রষ্টব্য। চক্রানুষ্ঠান হয় অভিষিক্ত সাধকদের নিয়ে এবং সেই চক্রের চক্রেশ্বর হন দেবীর যিনি পূজা করেন তিনি। তিনিই প্রকৃতপক্ষে চক্রেশ্বর—চক্রে অংশগ্রহণকারী সাধক বা 'বীর'-গণকে তিনি পরিচালনা করেন। পাত্র-পরিবেশন-অনুষ্ঠানে 'শক্তি' হন গুরু বা আচার্য, অন্যথা ইষ্টদেবীই শক্তি। চক্রানুষ্ঠানে সাধনার আরম্ভ হয় ধ্যান, জপ, স্তোত্র

প্রভৃতিকে নিয়ে। শ্রীগুরুর ও ইষ্টদেবীর পূজা তত্ত্বদৃষ্টিতে সম্পন্ন হয়।

দশমহাবিদ্যার সাধনা শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে ক্রমোচ্চস্তরবিশেষ। দশমহাবিদ্যার সকল দেবীর সাধনা বিহিত থাকলেও একমাত্র দক্ষিণাকালিকার ধ্যানেও জীবন-সিদ্ধি লাভ হয়। শ্যামাকালী দক্ষিণাকালীর নামান্তর বলা যেতে পারে। দক্ষিণাকালী বরদা ও কল্যাণী। গৃহবাসী ও বনবাসী—গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয় শ্রেণীর সাধকরাই দক্ষিণাকালীর সাধনা করতে পারেন। কিন্তু বামাকালী সংসারবন্ধননাশিনী, এ'জন্য এ'কমাত্র সন্ন্যাসীর পক্ষে বামাকালীর পূজা ও সাধনা বিধেয়। দক্ষিণাকালীর দক্ষিণপদ সম্মুখে (শিব বা মহাকালের বুকে) ন্যস্ত, আর বামাকালীর বামপদ সম্মুখে বিস্তৃত। ধ্যানমন্ত্র দক্ষিণা ও বামার একটু ভিন্ন। দক্ষিণার একাক্ষরী বীজমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ।

॥ দেবী কালীর রূপভেদের বর্ণনা ॥

দক্ষিণাকালীর ও শিবের মূর্তিতে বর্তমানে বহু পরিবর্তন দেখা যায়। বর্তমানকালে শ্যামা বা কালীমূর্তি অনেকটা ভদ্ররুচিসম্পন্ন। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণা-কালী শিবের তথা মহাকালের উপর উপবিষ্ট থাকেন ও মহাকাল-শিবের নীচে সদাশিব শায়িত থাকেন। দেবী 'বিপরীতরতাতুরা'। দেবী সাধককে জন্ম-মৃত্যুচক্র থেকে নির্মুক্ত করার জন্যই বিপরীতরতাতুরা। সর্বনিম্নের নিষ্ক্রিয় সদাশিব-শিব কূটস্থ-ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতীক। সদাশিবের উপর নিষ্ক্রিয় মহাকাল-শিব সৃষ্টির উন্মুখী সগুণ-ব্রহ্ম—যিনি অদ্বৈতবেদান্তে মায়াধীশ ঈশ্বর এবং তন্ত্রে লীলাচঞ্চলা-নৃত্যশীলা-মহাশক্তি কালী। মহাকালের রূপান্তর মহাকালী। সকল কর্মচাঞ্চল্যরূপ সৃষ্টির বীজই মহাকাল-শিব। সদাশিব মহাকালেরও পরে। সদাশিব সর্বাতীত। অব্যক্ত বা অব্যাকৃত-মহাকালের ব্যক্ত বা ব্যাকৃত রূপ দেবী কালী। কালী ও শিব সে'জন্য একটি টাকার এ'পীঠ ও ও'পীঠ। অর্থাৎ একই শিব. —কখনও সৃষ্টিরূপিণী কালী, আবার কখনও সৃষ্টির অতীত মহাকাল ও সদাশিব। বর্তমানে শিবাদ্বৈতের ভাবকে রক্ষা করেই একটি মাত্র শিব মহাকালের উপর শক্তির নৃত্যবিলাস। শিবের বুকে পা রাখার তত্ত্ব ও রহস্য হলো দেবী কালিকা মহাকাল-শিব-ছাড়া অন্য-কেউ নন—এই তত্ত্বের প্রকাশক। কিন্তু সম্পর্ক উভয়ের মধ্যে অবিনাভাবের বা অদ্বৈতের। শিবশক্তিতত্ত্বই ব্রহ্মতত্ত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বানুভূতির অদ্বৈতানুভূতিও ঐ এক ও অদ্বৈত তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত: 'যিনি শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম', 'বেদান্তে যাকে শক্তি বা কালী বলে কয়, তাঁকেই আমি ব্রহ্ম বলে

কই. কালী চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব, আবার আরো কত কি'। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দিব্যানুভূতি সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ, বিশ্বগত-বিশ্বোত্তীর্ণ এই পরমসত্য ও পরমতত্ত্বকে মিলনসূত্রে গ্রথিত করেছে এবং বিচিত্র মতভেদের ও মতবাদের জগতে এক পরম-বিস্ময়কর সহাসমন্বয়ের সত্য আবিষ্কার করেছে।

॥ রহস্যপূজার বিধি ॥

অনভিষিক্ত সাধকপক্ষে দক্ষিণাকালীর পূজা সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু অভিষিক্তপক্ষে দক্ষিণাকালীর পূজায় 'রহস্যপূজা'-র বিধি আছে। 'রহস্যপূজা'-র অনুষ্ঠান একমাত্র পূর্ণাভিষিক্ত বা সাম্রাজ্যাদি অন্যান্য অভিষিক্ত সাধকই করতে পারেন। রহস্যপূজার প্রারম্ভে কামিনীদেবীর পূজার বিধি আছে। শ্রীকামিনীদেবী দেবী দুর্গা বা দেবী কালিকা। আবার দাক্ষিণাত্যে দেবী সুন্দরী (কামিনী), ত্রিপুরা, শ্রীবিদ্যা, ললিতা, কামেশ্বরী। দেবী কামিনীর ধ্যান : 'সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং রক্তবর্ণাং চতুর্ভুজাম্' প্রভৃতি। পূজার পূর্বে ভূতশুদ্ধির উদ্দেশ্যে দেবী মাতৃকাকে বর্ণরূপে সাধকের সর্বাঙ্গে আবাহন করা হয়। ভূতশুদ্ধির বিধি সকল পূজাতেই থাকে। সর্ববর্ণ বা বর্ণবীজরূপিণী দেবী মাতৃকার পূজা, আবাহন ও সাধনাই মহাশক্তির সাধনা। দেবীপূজায় বাণ-লিঙ্গরূপী শিবপূজার বিধি আছে। এর রহস্যকথা এই যে, শিব-ছাড়া শক্তি নাই এবং শক্তি-ছাড়া শিব নাই, শিব ও শক্তির অবিনাভাব-সম্বন্ধ চণকাকারে। 'চণক' অর্থে ছোলাকলাই। একটি ছোলার মধ্যে দুটি অংশ একই সঙ্গে থাকে। দু'টি অংশকে (পজেটিভ ও নেগেটিভ) নিয়েই যেমন চণকের সম্পূর্ণতা বা অখণ্ডতা, তেমনি শিব ও শক্তিকে নিয়েই অদ্বিতীয়ত্ব। শিব ও শক্তির অখণ্ড রূপকে নিয়েই শিবাদ্বৈতবাদের বা শক্তিবিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের সার্থকতা। পূর্ব-ভারতে শৈবধর্মের মর্মকথাও তাই। গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্যের-প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদের সমীক্ষা একটু ভিন্ন রকমের। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বানুভূতির আলোক শুদ্ধাদ্বৈত বা কেবলাদ্বৈতবাদের মর্মকথার অন্তর্দেশ স্পর্শ করে। কিন্তু সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি বাঙলার শক্তিসাধকদের অনুভূতি শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদেরই অনুসারী, ঠিক অদ্বৈত নয়।

॥ বাঙলাদেশে মহাবিদ্যা বা শক্তিপূজা ॥

বাঙলাদেশে শক্তিপূজায় বিজয়াশোধন, শ্রীযন্ত্রলিখন ও যন্ত্রের অর্চনার বিধি আছে। দেবীপূজায় সুধাকলসস্থাপন, আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর ধ্যান ও পূজা এবং মাংস,

মৎস্য, মুদ্রা ও সুধাদি পঞ্চতত্ত্বের-শুদ্ধিকরণের উপযোগিতা আছে। পঞ্চ-মকারকে মন্ত্রে ও দিব্যদৃষ্টিতে পরিশুদ্ধ করার রীতি আছে। ঐগুলি পূজার উপকরণ বা উপচার মাত্র, তাদের প্রয়োগবাহুল্যের কোন সার্থকতা নাই। পরশুরামকল্পসূত্রে, নিত্যোৎসবে, কৌলোপনিষদে পঞ্চ-মকার উপকরণমাত্র সাধনার এবং ঐগুলি কেবলমাত্র দেবীর উদ্দেশ্যেই অর্পিত হয়। সাধক তাদের কণামাত্র গ্রহণ করেন দেবীর প্রসাদরূপে, ভোগপরিতৃপ্তির জন্য নয়। দিব্যাচারের বা কুলাচারের সাধকগণ পঞ্চ-মকার (পঞ্চতত্ত্ব) দেবীকে উৎসর্গকালে দু'টি মকারের (মদ্য ও যোষিৎ) অনুকল্পরূপে পুষ্প বা জলমাত্র ব্যবহার করেন। শাস্ত্রে বিভিন্ন রকমের অনুকল্পের বিধি আছে। দেবীর প্রীতিসাধন ও তাঁর আশীর্বাদ লাভই সাধকের কাম্য, পার্থিব ভোগচরিতার্থ করা লক্ষ্য নয়,—এ'কথা কুলার্ণব, কল্পসূত্র প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্র একবাক্যে স্বীকার করে।

দেবীর বিশেষপূজায় আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর ধ্যান ও পূজার বিধি আছে সে'কথা পূর্বে বলেছি। আনন্দভৈরবের ধ্যানে আছে—

ওঁ সূর্যকোটিপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
অষ্টাদশভুজং দেবং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্ ॥—প্রভৃাত

ভৈরব ও ভৈরবী উভয়েরই আঠারোটি ক'রে হস্ত ও সেই সকল হস্তে বিভিন্ন প্রহরণ। তাছাড়া মুখও উভয়ের পাঁচটি ক'রে। এখানে ভৈরব ও ভৈরবী তত্ত্বদৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন,—যেমন শিব ও শক্তি আসলে অভিন্ন। তন্ত্রে শিব পঞ্চানন ও তাঁর পাঁচটি মুখ থেকে তন্ত্রশাস্ত্রাদির সৃষ্টি। পঞ্চানন-শিব-ছাড়া পঞ্চানন-ভৈরবও আছে। পঞ্চানন-শিবের সম্মুখে কোন পশুবলি দেওয়ার রীতি নাই, কিন্তু পঞ্চানন-ভৈরব মাংসাশী, সুতরাং তিনি পশুবলি গ্রহণ করেন। পঞ্চানন-ভৈরব পঞ্চানন-শিবের অনুচর।

এ'সম্বন্ধে পুনরায় বলি, কালীকল্পতরু-আদ্যাশক্তি বিশ্বপ্রকৃতি,—যিনি অব্যক্তা বা অব্যাকৃতা। এই অব্যাকৃত মহাপ্রকৃতিই শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহামায়া,—যিনি সত্ত্বরজস্তমোময়ী, যিনি বিশ্ব প্রসব করেন, পালন করেন, আবার যিনি বিশ্বকে গ্রাস ক'রে বিশুদ্ধ তত্ত্বস্বরূপে বিরাজমানা। প্রকৃতি বা মহাপ্রকৃতি রহস্যময়ী মহাশক্তি। এই রহস্যময়ীর গর্ভে যে কত-কিছু রত্ন লুকোনো আছে,—তা মানুষ কখনো আবিষ্কার করতে পারেনি। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সমস্তই রহস্যময়ী প্রকৃতির ঐশ্বর্য, সুতরাং প্রকৃতিরূপিণী মহামায়ার শরণাপন্ন হ'লে তিনি রহস্যের আবৃত দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেন ও মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য দান করেন।

॥ কালী কল্পতরু ॥

কালী কল্পতরু, কেননা তাঁর কাছে যে যা' প্রার্থনা করে তিনি তাকে তাই দান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "সেই গাছতলায় গেলে (ঈশ্বরের কাছে গেলে) চারি ফল কুড়ায়ে পাবে। অনায়াসে পাবে।" এই চারি ফল,—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ধর্মের সত্যকারের রূপ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। এই আত্মসত্তার জন্য আমরা 'আছি',—we exist। প্রকৃতপক্ষে আত্মা বা ব্রহ্মচৈতন্যই একমাত্র সত্তা, —যে সত্তার আলোকে বিশ্বের সকল-কিছু ধৃত ও আলোকিত,—'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। আবার ধর্ম অর্থে আচার-বিচার ও বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ,—রাজসূয়, অগ্নিহোত্রাদি। এই আচারগুলিও কর্মজীবনের পথে মানুষকে সাহায্য করে। তারা সাহায্য করে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর ক'রে জ্ঞান দান করার জন্য। আচার ও ক্রিয়ামূলক ধর্মানুষ্ঠানের পিছনে থাকে নিষ্ঠা ও বিশ্বাস। ঐ নিষ্ঠা ও বিশ্বাসই ক্রমে ঈশ্বরলাভের সম্ভাবনাকে সার্থকতার আলোকে চিরসমুজ্জ্বল করে। তাই নিষ্ঠাহীন আচার-বিচার অর্থহীন ও অসার্থক।

তারপর 'অর্থ'। পার্থিব অর্থ পরমার্থলাভের পথে অন্তরায়। সংসারে ভোগ-চরিতার্থের জন্য অর্থ বা ঐশ্বর্যের প্রয়োজন, কিন্তু ভোগের সহকারী অর্থআবার বন্ধনেরই কারণ ও মুক্তির প্রতিকূল। নিরাসক্তির আশীর্বাদ পেলে ভোগের অনুকূল অর্থ ত্যাগের পথকেও আলোকময় করে। তখন জীবনযাত্রার পথে আপন-পর এই দ্বৈতজ্ঞানের সীমারেখা মুছে যায়। তখন মানুষ উদারতার আলোকে বিশ্বকল্যাণ-সাধনের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করে। অর্থ হয় তখন পরমার্থ-লাভের পথে সহায়ক, প্রতিবন্ধক নয়।

'কাম' বলতে কামনা বা ভোগতৃষ্ণা। তৃষ্ণাই কাম বা কামনা, সংসারবন্ধনের কারণ। ভগবান বুদ্ধদেব তাই কঠোর তপস্যায় প্রথমে তন্হা বা তৃষ্ণাকে জয় করেছিলেন। তিনি তৃষ্ণা ও বিচিত্র বাসনাকে জয় করেছিলেন অপরূপভাবে, যেমন এখনও করেন সাধনশীল বিচারী সাধকেরা। তৃষ্ণাকে জয় করার সময়ে মৃত্যুর অভিন্ন মূর্তি 'মার' বা অপস্মার যে'ভাবে মায়াজাল বিস্তার ক'রে ধ্যানী-বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করেছিল, ঠিক সে-রকমই প্রলোভনের মায়াজাল বিস্তার করে সংসারের বাসনা-কামনা। প্রতিটি অধ্যাত্মজীবনকামী সাধকের সাধনকালে এ'ধরনের কাম বা মারের আবির্ভাব হয়।

কাম বা কামনার কল্যাণময় রূপও আছে,—যে রূপ ত্যাগ ও নিরাসক্তির আলোকোচ্ছ্বাস নিয়ে ঈশ্বরলাভের পথে সাধককে জীবনে প্রেরণা দেয়। যে কামনা

মুক্তির দিশারী, সেই কামনা বৈরাগ্যের অনাসক্তিযোগে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে মানুষকে বন্ধনমুক্ত করে।

॥ তন্ত্রে বীজমন্ত্র ও মন্ত্রসাধনা ॥

কোন অভিপ্রেত দেবতা অর্থাৎ ইষ্টদেবতার নামও যা, আর তার বীজ বা বীজমন্ত্রও তাই। ইষ্ট বা বীজমন্ত্রকেই নাম বলে,—যা নামী বা কোন দেবতার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন ক্রীং বা হ্রীং-বীজ নাম, আর নামী তাদের দেবতা দক্ষিণাকালী বা বামাকালী। ক্রীং-বীজ দেবী কালীকাকেই বুঝায়, কিন্তু হ্রীং-বীজে কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতিকে বুঝায়। তেমনি ঐং-বীজ দেবী সরস্বতীকে বুঝায়, আবার শিব বা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও বুঝায়। কোন দেবতার নির্দিষ্ট একটি মাত্র বীজ থাকে, আবার একই বীজ অনেক দেবতাকেও বুঝায়। বীজ কেন্দ্রীভূত শক্তি। বীজ কামকলা কুণ্ডলিনী। কুণ্ডলিনী অব্যক্তা বা concentrated Fnergv। কেন্দ্রীভূত বলেই শক্তি কুণ্ডলিনী। তাছাড়া বৈদিক বীজমন্ত্র ওঙ্কার বা প্রণব। ওঙ্কার বা প্রণব সকল দেবতার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। ওঙ্কার বা প্রণবের ব্যাপ্তি বিশ্বচরাচরকে নিয়ে, অ-উ-ম তথা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে নিয়ে। এই অ-উ-ম সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের প্রতীক। এরপর ওঙ্কারের কলা বা অমাকলারূপ অর্ধচন্দ্র,—যা বিশ্বপ্রকৃতির প্রতীক—সর্ববীজময়ী। কলার উপরে বিন্দু,—যা দেশ-কাল-কারণাতীত ব্রহ্ম ও বিশ্বব্যাপকচৈতন্য। ওঙ্কারের মধ্যে সকল দেব-দেবীর বীজমন্ত্রই নিহিত। এ'জন্য ওঙ্কারকে সর্বব্যাপক বলা হয়। ওঙ্কারে অ, উ, ম, চন্দ্রকলা-প্রকৃতি ও বিন্দু ৫টি বর্ণ। বীজের অপর নাম তাই মাতৃকা বা বর্ণ। কালীর গলায় মুণ্ডমালা মাতৃকামন্ত্রেরই মালা,—'ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি'। বীজ শক্তির অধিষ্ঠাতা দেবতাকে বুঝায়। দেবতা কিনা দ্যোতনশীল—'জ্যোতির্ময়ত্বাৎ দ্যোতনশীলত্বাৎ দেবতা'। জ্যোতির্ময় দেবতা সহস্র সহস্র সূর্য অপেক্ষাও দ্যুতিশীল। এই জ্যোতিঃ 'কোটি-সূর্যপ্রতীকাশম্' এবং 'চন্দ্রকোটিসুশীতলম্',—তাপ ও শৈত্য উভয়েরই মিলনভূমি বা balancing দেবতা। উভয়েরই মিলনভূমি ব'লে চেতন ও অচেতন সকল-কিছুর কেন্দ্র ও উৎস। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ভাষায় এই কেন্দ্রজ্যোতিকে 'নিউট্রাল-পয়েন্ট' বা সর্বকর্মাতীত অদ্বৈত ও সর্বকর্মাশ্রিত দ্বৈতভূমির সমতারক্ষক নিরপেক্ষ ও স্বাধীন 'বিন্দু' বলা যেতে পারে। তিনি তাঁর *Self-Knowledge*-গ্রন্থে Matter ও Spirit—জড় ও চৈতন্য বোঝাতে জড় ও চৈতন্য যেখানে (মধ্যকেন্দ্রে) মিলিত হয় তাকেই 'No man's land'-রূপ

নিরপেক্ষ বা neutral zone বা point (নিরপেক্ষ সত্তা) বলেছেন। নিরপেক্ষ সত্তা ব্রহ্মই জড় ও চৈতন্য—জীব ও ঈশ্বরের মিলনভূমি। এই ভূমিই ব্রহ্ম। বীজাত্মক বিন্দু বা ব্রহ্মকে তাই মহাশক্তির আধার. উৎস বা কারণ বলে। এ'কারণের নাম মহাকারণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'কারণের পর মহাকারণ'। এই মহাকারণ কিন্তু যথার্থভাবে কারণ নয়। কেন্দ্রগত ও সর্বাতীত বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হ'লে সাধকের মায়া বা অবিদ্যার নাশ হয়। এখানে অবিদ্যা ও মায়া এককথা। মায়ার নাশ বলতে মায়ার রূপান্তর বা মায়ার স্বরূপে প্রতিষ্ঠা। মন্ত্রতত্ত্বের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের কাছে এ'রহস্য ও তত্ত্ব অপরিচিত নয়। মননমাত্রেই ত্রাণ করে ব'লেই মন্ত্র। মন্ত্র ও দেবতা একার্থক—যেমন গুরু ও ইষ্ট একার্থক। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়"। বীজ একাক্ষরী, দ্ব্যক্ষরী, ত্র্যক্ষরী, একাদশাক্ষরী, দ্বাদশাক্ষরী প্রভৃতি। অক্ষরাত্মক-ব্যাপ্তি ও সত্তা এদের মধ্যে অধিক নয় কিন্তু শক্তি অসীম। ইচ্ছার অভিঘাতে অক্ষরময় মন্ত্র যখন প্রদীপ্ত ও জাগ্রত হয়, তখন মনের অবচেতনস্তরে জন্মজন্মান্তরের অসংখ্য সঞ্চিত কর্মের ও চিন্তার সংস্কার আলোকিত হয়। তখন অবিদ্যার নাশ হয় বীজাধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্বয়ং-জ্যোতিষ্মান অমলিন অম্লান আলোকে। এ' অবস্থাতেই মন্ত্রসাধক বন্ধন ও মুক্তির সমতারক্ষক সীমার অতীত হন ও উপলব্ধি করেন নিত্যে যিনি, লীলায় তিনিই একরসই তাদের স্বরূপ। নিত্য কারণ ও লীলাকার্য। নিত্য তরঙ্গহীন সমুদ্র। লীলা তরঙ্গমালা।

॥ শিবসংহিতার অভিমত ॥

শিবসংহিতা'-গ্রন্থে মন্ত্র ও মন্ত্রতত্ত্ব-সম্বন্ধে একটি রহস্যপূর্ণ সমাধান করা হয়েছে —যদিও সর্ববাদীসম্মত নয়। 'শিবসংহিতা'-র পঞ্চম পটলে (অধ্যায়ে) আছে—

'মূলাধারেঽস্তি যৎ পদ্মং চতুর্দলসমন্বিতম্।
তন্মধ্যে বাগ্ভবং বীজং বিস্ফুরন্তং তড়িৎপ্রভম্ ॥ ৫।২৪৪
হৃদয়ে কামবীজন্তু বন্ধুককুসুমপ্রভম্।
আজ্ঞারবিন্দে শক্ত্যাখ্যং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৫।২৪৫
বীজত্রয়মিদং গোপ্যং .. ..' ॥ ৫।২৪৬

মূলাধারে বাগ্ভব='ঐং' বীজ, হৃদয়ে অনাহতচক্রে রক্তবর্ণ কামবীজ=ক্লীং এবং আজ্ঞাচক্রে দ্বিদলপদ্মে শক্তিবীজ=সৌঃ। এই 'ঐং ক্লীং সৌঃ' তিনটি বীজ একান্ত রহস্যপূর্ণ ও গোপনীয়। এই বীজ-তিনটি 'ত্রিপুর-বালা-ভৈরবী'-মন্ত্র নামে

পরিচিত। তিনটি মন্ত্রের রহস্য এই : অবিচ্ছুরিত স্বরূপশক্তি কামকলা-কুণ্ডলিনী থেকে প্রথম নাদ-রূপে 'পরা' (নাভিদেশে)+দ্বিতীয় নাদ' পশ্যন্তী' (হৃদয়ে)+তৃতীয় নাদ 'মধ্যমা' (আজ্ঞাচক্রে, আবার অনেকের মতে কণ্ঠদেশে) অভিব্যক্ত। কাশ্মীর-ত্রিকতন্ত্রমতে ও বিশেষ ক'রে আচার্য অভিনবগুপ্তের অভিমতে পরা, পশ্যন্তী প্রভৃতির ব্যাখ্যায় রূপান্তর আছে। আবার 'বাক্যপদীয়'-গ্রন্থে আচার্য ভর্তৃহরির ব্যাখ্যা অন্যরকম বা ভিন্ন। কণ্ঠদেশে হৃদয়ে অবস্থিত ও বহির্দেশে স্থূল মন্ত্ররূপে মুখ দিয়ে উচ্চারিত 'বৈখরী'-নাদ। হৃদয়ের মধ্যে সূক্ষ্মতম + সূক্ষ্মতর + সূক্ষ্ম = পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা বাক্ বা নাদ = 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি',—দিবি বা হৃদয়াকাশে প্রকাশিত তিনটি পাদ বা শব্দরূপী মন্ত্রের বিকাশস্তর। 'বীজত্রয়মিদং গোপ্যম্',—এই তিনটি রহস্যময় বীজ সর্বদাই গোপনীয়, সাধারণ্যে প্রকাশযোগ্য নয়। প্রকাশযোগ্য হয় যখন ঐ তিনটি স্তরবাহী বাক্, নাদ বা মন্ত্র বৈখরী-বাক্‌রূপে বাহ্যজগতে স্থূলভাবে প্রকাশ পায়। সাধনসিদ্ধ সদ্‌গুরু—যিনি এই নাদ-তিনটির রহস্যকথা বা তত্ত্বকথা জানেন—তাঁর দ্বারা পরিচালিত হয়ে সাধক মন্ত্র তিনটির (ঐং ক্লীং সৌঃ) সাধনার ও ধ্যানের রহস্য ভেদ করেন। 'সৌঃ'—শক্তি বা গুরুবীজ। গুরুগম্য এই মন্ত্রসাধনা। তবে সকলের পক্ষে করণীয়ও নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়"। শক্ত মাটি অবচেতন-মন। অবচেতন-মনকে সাইকো-অ্যানালিস্টরা Unconsciousness ও Subconsciousness বলেন। আসলে unconseiousness বা subconsciousness-এর অপর নাম কামকলা বা কুণ্ডলিনী। অবচেতন, চেতন ও পরচেতন—subconsciousness, consciousness, and superconcionsness সুপ্ত শক্তি। অবচেতন-মন বিশাল সমুদ্রবিশেষ—বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। 'It is the vast field or vacant',—বলেছেন স্বামী অভেদানন্দ। এখানে জন্মজন্মান্তরের অসংখ্য-অগণিত মানসিক ও বাহ্যিক কর্ম-সংস্কার বীজাকারে সুপ্ত থাকে। এই মন বা বীজ আবার চেতন-মনে কিছু কিছু প্রকাশ পায়। একে বলে উদ্বুদ্ধ-সংস্কার। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর *Doctrine of Karma*-গ্রন্থে যেখানে কর্মদর্শনের আলোচনা করেছেন সেখানে অবচেতন-মনের ব্যাপ্তি ও গতি-সম্বন্ধে বলেছেন : "...for we are learning through the investigations of science that the unconscious (or subconscious) mind extends over a much larger area than the conscious mind." এ'ধরনের কথাই

বলেছেন স্বামী অভেদানন্দ *True Psychology*-গ্রন্থে : "the subconscious বা unconscious mind is the vast field"। অবচেতন-মনের বিস্তৃত সীমা ও ব্যাপ্তি অতিক্রম করা দুঃসাধ্য, কিন্তু আত্মজ্ঞানের সুদূরভেদী আলোক অবচেতন-মনের সুবিস্তৃত ব্যাপ্তিকেও ভেদ করে, সঞ্চিত-উদ্‌বুদ্ধ-অসংখ্য-সংস্কারকে আলোকিত করে এবং এ ভাবে সাধককে মুক্তিপথের রহস্য ভেদ করতে সাহায্য করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়"। মনের অবচেতন-স্তরও সসীম,—অজ্ঞানের সীমায় আবদ্ধ। মাটি বা ভূমি বিদীর্ণ ও আলোকময় হয় ভূমারূপী ব্রহ্মচৈতন্যের সর্বভেদী আলোকে। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর *True Psychology*-গ্রন্থে বলেছেন,—হাজার বছরের নিবিড় অন্ধকার ব্রহ্ম-চৈতন্যের একটিমাত্র রশ্মিতে আলোকস্নাত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "কি রকম জানো, যেমন হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর, আলো এলে অন্ধকার পালিয়ে যায়" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃষ্ঠাঃ ১০৩)। মুক্তির আলোকে প্লাবিত হ'লে কামিনী কাঞ্চনে আসক্তির অন্ধকারে মন আর ম্লান হয় না। এই জ্যোতির্ময় প্লাবনকে সম্ভাবনাময় ও সচল করতে গেলে মন ঈশ্বরাভিমুখী হওয়া চাই। ঈশ্বরের পাদপদ্মে মনকে সমর্পণ করলে ঈশ্বরময় হ'য়ে ঈশ্বরে মন সর্বদাই মগ্ন থাকে। ঈশ্বরের প্রতি মন রাখার নামই মনের জাগরণ। মনের এই জাগরণ-অবস্থার নাম 'চৈতন্য'। তখন মনের সকল সংশয় দূর হয়, হৃদয়গ্রন্থিস্বরূপ অজ্ঞান-অন্ধকার বিনষ্ট হয় ও স্বার্থযুক্ত সকল-কর্মের অবসান ঘটে। এই অবস্থার নামই মুক্তি বা ব্রহ্মনির্বাণ। বৌদ্ধ-নির্বাণ ও বেদান্তের ব্রহ্ম-নির্বাণ স্বরূপে এক ও অভিন্ন। বৌদ্ধ নির্বাণ তাই শূন্য বা extinction নয়। নির্বাণ অর্থে রূপান্তরিত চিন্ময়-সত্তা (Suchness বা Thatness। গীতায় তাই শ্রীকৃষ্ণ কয়েকবার 'ব্রহ্মনির্বানমৃচ্ছতি' বলেছেন। নির্বাণ ও 'অস্তীত্যেব উপলব্ধব্যম্'—সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ অখণ্ড অস্তিসত্তা।

॥ মন্ত্রতত্ত্ব ও মন্ত্রসাধনা ॥

যার মনন বা চিন্তা থেকে শিবস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান (উপলব্ধি) হয় ও জ্ঞান হয় যে, ব্রহ্মাণ্ডসত্তা ও ব্রহ্মসত্তা এক ও অভেদ, তার নাম অভেদ, তার নাম 'মন্ত্র'। 'মন্'—সংসারবন্ধন থেকে পরিত্রাণ ক'রে 'ত্র'—সমষ্টিতে ধর্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্বর্গের আমন্ত্রণ বা প্রাপ্তি যা থেকে হয়, তাই 'মন্ত্র'। অর্থাৎ যার মনন্' বা চিন্তনমাত্রে ত্রাণ' হয় বস্তুতে সংসারবন্ধন বা অবিদ্যা দূরীভূত হয়, তাকে মন্ত্র বলে। শ্রদ্ধেয় শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব-কৃত 'তন্ত্রতত্ত্ব'-গ্রন্থে আছে : "মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্বরূপ দু' রকম :

(১) বাচকশক্তি ও (২) বাচ্যশক্তি। সাধকের উপাসনায় বাচকশক্তি জাগ্রত হ'লে তবেই বাচ্যশক্তির স্বরূপ প্রকাশিত হয়, আর মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা দেবী যে রকমভাবেই মূর্তিমান বা মূর্তিমতী হোক না কেন, সকলেই মূলাধারবিলাসিনী কুণ্ডলিনীর অঙ্গবিভূতি বা স্বরূপ ছাড়া অন্য-কিছু নয়। অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত পঞ্চাশটি মাতৃকাবর্ণ[১৭] এবং দেবী সরস্বতীর অক্ষমালা ও করালী কালীর মুণ্ডমালা। সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন 'কালী পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী, তুমি বর্ণে বর্ণে নাম ধর'। পঞ্চাশদ্বর্ণ থেকেই নবকোটি মহামন্ত্রের আবির্ভাব বা সৃষ্টি হয়। সিদ্ধসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব বলেছেন, গুরু শিষ্যের হৃদয়ে যে বীজমন্ত্র রোপন করেন তারই অঙ্কুরোদ্গম করে নামঘটিত মন্ত্র।

পরশুরামকল্পসূত্রে আছে: 'বর্ণাত্মিকা নিত্যাঃ শব্দাঃ' (১৭)। 'নিত্য শব্দ' অর্থে নিত্য মন্ত্র বা দেবতার বীজমন্ত্র। মন্ত্র নিত্যশব্দ স্ফোট বা প্রণবের মতো অক্ষয়,—যা অবিনাশী। ভাষ্য সেতুবন্ধে ভাস্কররায় বলেছেন: 'অসমাপ্ত-কলুষাঃ শুদ্ধাস্তু সপ্তকোটি মহামন্ত্রাঃ। ন চ তেষাং জড়ত্বমিতি শঙ্কা।' বায়ু ও বস্তুর সংঘাত থেকে শব্দের সৃষ্টি হয়। নৈয়ায়িকরা বলেন যে, শব্দ আকাশের গুণ,—'শব্দগুণমাকাশম্', সে'জন্য শব্দ অনিত্য ও ধ্বংসশীল। কিন্তু ভাস্কররায় শব্দ অনিত্য এই শঙ্কা দূর ক'রে বলেছেন, স্ফোটের মতো মন্ত্র শব্দ এবং তা নিত্য ও অবিনাশী। এই শব্দের নাম শব্দব্রহ্ম। মন্ত্র বাচক অর্থে সগুণ-ব্রহ্ম মহাকাল ও বাচ্য অর্থে নির্গুণ-ব্রহ্ম সদাশিব। ঋষি পতঞ্জলি মহাভাষ্যে কারণ-শব্দকে নিত্যস্ফোট ও শব্দব্রহ্ম বলেছেন। আচার্য ভর্তৃহরিও শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেছেন। পরশুরামকল্পসূত্রে তাই বলা হয়েছে: 'নিত্যাঃ শব্দাঃ'। এই নিত্য শব্দ মন্ত্রের অচিন্ত্যশক্তিরূপে কল্পিত। কল্পসূত্রকার বলেছেন: 'মন্ত্রাণামচিন্ত্যশক্তিতা' (১৮)। মন্ত্রের যে অচিন্ত্যশক্তি তার জাগরণের নাম মন্ত্রচৈতন্য, অর্থাৎ মন্ত্রই চৈতন্যরূপে প্রকাশ পায়। মন্ত্রচৈতন্যের আর-এক নাম মন্ত্রজাগৃতি।

কামধেনুতন্ত্রে অকার থেকে ক্ষকার (অ—ক্ষ) পর্যন্ত বর্ণগুলির স্বভাব, গুণ, মহিমা ও স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে বর্ণ বা শব্দগুলির তাত্ত্বিকরূপ সাধকের ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত হয়। এ'গুলি কেবলই উচ্চারণসাপেক্ষ নয়, তাদের অর্থচিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানসাপেক্ষ। অক্ষরের বা বর্ণের রূপ ও

১৭। 'মাতৃকা' অর্থে বিশ্বমাতা দেবী কামকলা বা কুণ্ডলিনী। মাতৃকাশক্তি থেকে বিচিত্র বর্ণের সৃষ্টি, সে'জন্য মাতৃকা জননী বা বিশ্বজননী। অবশ্য মাতৃকাসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবো প'রে।

তত্ত্বানুভূতিই শক্তিসাধনায় কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করে। কুণ্ডলিনীশক্তি ত্রিসার্ধ-বলয়াকারে সাধারণত নিদ্রিতা। শক্তিময়ী মাতৃকাবর্ণবীজের দ্বারা সেই কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত ক'রে চক্রে চক্রে অর্থাৎ মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠানে, স্বাধিষ্ঠান থেকে মণিপুরে, মণিপুর থেকে অনাহতে, অনাহত থেকে বিশুদ্ধে, বিশুদ্ধ থেকে আজ্ঞায় ও আজ্ঞাচক্র থেকে সহস্রদলপদ্মে উন্নয়ন করতে হয়, তবেই শিবশক্তিসামরস্য সুখ ও আনন্দের অনুভূতি লাভ সম্ভব হয়। এই চক্র বা পদ্মগুলির প্রতিটি পাপড়ীতে মাতৃকাবর্ণমালা নিহিত। ঐ সকল বর্ণমালা বিচিত্র বর্ণ ও দ্যুতিযুক্ত। সাধক ইড়া ও পিঙ্গলা-নাড়ীর প্রবাহ রুদ্ধ ক'রে সুষুম্নার মধ্য দিয়ে জাগ্রতা কুণ্ডলিনীকে ঊর্ধ্বে চালিত করেন (দেবী ছিন্নমস্তার মূর্তি দেখুন)। তখন শক্তিপ্রবাহ এক-একটি চক্র বা পদ্ম ভেদ ও অতিক্রম ক'রে পদ্মের পাপড়ীগুলিকে অধোমুখী বা নিম্নমুখী করে, কেননা সাধারণত চক্র বা পদ্মগুলির পাপড়ী ঊর্ধমুখে থাকে। এ'ভাবে সহস্রারকমলে জাগ্রত পরাসম্বিদ্‌রূপ শিব-ভট্টারকের সঙ্গে কামকলাশক্তি কুণ্ডলিনী সম্পরিষক্ত হয় এবং তখনই সেই সম্পরিষক্ত মহাবিন্দু থেকে অমৃতধারার ক্ষরণ হয় ও শিবশক্তির রূপ দর্শন ক'রে সাধক সংসারপাশ থেকে মুক্তি লাভ করেন। তন্ত্রে বর্ণবীজসাধনা বা মন্ত্রসাধনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই তাই। কামকলাবিলাসতন্ত্রে মাতৃকাশক্তিরূপিণী কুণ্ডলিনীর জাগরণের প্রক্রিয়া দেওয়া আছে। তবে এই ক্রিয়ার সাহায্যের জন্য সাধনসিদ্ধ গুরুর একান্ত আবশ্যক।

'শিবসংহিতা'-গ্রন্থের ৫ম পটলে ১৭৭-১৮৮ শ্লোকে শিবশক্তির সামরস্যানুভূতির রহস্যসম্ন কথার ইঙ্গিত দেওয়া আছে। বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে এই রহস্যময় তত্ত্বকে আরো বিশদ ও পরিস্কার ক'রে বুঝানো হয়েছে। তন্ত্রতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, আজ্ঞাচক্রের উপরে 'মনশ্চক্র' নামে একটি গুপ্তচক্র আছে। এই গুপ্তচক্র কারু মতে গুরুচক্র, আবার কারুর মতে মনশ্চক্র। এই গুপ্ত-মনশ্চক্রের ছ'টি দল (ষড়্‌দল)। এই ছটি দলে শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, আঘ্রানোপলব্ধি, রসোপযোগ ও স্বপ্ন এই ছ'টি বৃত্তি থাকে। তন্ত্রে সাধারণত ষট্‌চক্রের পরিচয় আছে, কিন্তু মনশ্চক্রের উল্লেখ প্রায় দেখা যায় না, অথবা মনশ্চক্রকে আজ্ঞাচক্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই মনশ্চক্রই গুপ্তচক্র,—যা ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরিভাগে অবস্থিত। ব্রহ্মরন্ধ্রের কিছু উপরে সোমচক্র,—যা চন্দ্রমণ্ডল নামে অভিহিত। সোমচক্র ষোড়শদলাবিশিষ্ট। এই দলগুলির নাম কৃপা, মৃদুতা, ধৈর্য, বৈরাগ্য, ধৃতি, সম্মৎ, হাস্য, রোমাঞ্চ, বিনয়, ধ্যান, সুস্থিরতা, গাম্ভীর্য, উদ্যম, অক্ষোভ, ঔদার্য ও একাগ্রতা। এ'গুলি উপলব্ধি বা অনুভূতিবিশেষ। সুষুম্নার মধ্যে যে ছিদ্রপথ,—তার নাম ব্রহ্মপথ। এই ব্রহ্মপথের রূপ ত্রিকোণ। এর

ঊর্ধে অ-ক-থ তিনটি রেখা কল্পিত। এই অ-ক-থ-যুক্ত ত্রিকোণকেই কামকলা বা যোনিমণ্ডল বলে। এই ত্রিকোণ-রূপ ব্রহ্মপথে অবস্থিত সোমচক্র বা চন্দ্রমণ্ডল। ষট্‌চক্রভেদের সময়ে এই সোমচক্র বা চন্দ্রমণ্ডল ভেদ করেন সাধক। শিবসংহিতায় হংসপীঠকে সোমচক্রের অন্তর্গত বলা হয়েছে। সোমচক্রের উপরে নিরালম্বপুরী। নিরালম্বপুরীতে সাধক ঈশ্বরকে (শিবকে) সাক্ষাৎকার করেন। নিরালম্বপুরীর উপরিভাগে দীপশিখাসদৃশ জ্যোতির্ময় প্রণবের (অ-উ-ম) প্রকাশ। এই প্রণবের উপরে শ্বেতবর্ণ 'নাদ'। নাদের উপরিভাগে 'বিন্দু'। বিন্দুর উপরে অধোমুখ সহস্র-দলকমল এবং তার নিম্নে দ্বাদশদল একটি পদ্ম। এই পদ্ম শ্বেতবর্ণ। এই পদ্মের কর্ণিকাতে বিদ্যুৎসদৃশ অ-ক-থ ত্রিকোণমণ্ডল বা ত্রিকোণ।[১৮] এই ত্রিকোণের মধ্যস্থলই সুষুম্নার শেষসীমা। এই শেষসীমার উপরে বিচিত্রবর্ণশোভিত সহস্রদল-কমল। এই কমলের উপরেই পরমশিবের অধিষ্ঠান। কুণ্ডলিনীশক্তিকে প্রদীপ্ত ও জাগ্রত ক'রে ঐ পরমশিবের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। পরমশিব আকাশরূপী পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই অজ্ঞানতিমিরে স্বয়ংপ্রকাশ-সূর্য। এই সূর্যস্থানই কুলস্থান, আবার অকুলস্থান।

॥ গুরুপাদুকা ও তার তত্ত্ব ॥

মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রথমে দ্বাদশদলপদ্ম ও তার উপরে সহস্রদলপদ্ম। ঐ সহস্রারের মধ্যদেশে সুধাসাগর, মণিদ্বীপ, মণিপীঠ ত্রিকোণ অ-ক-থাদি-রেখা ও তার মধ্যে নাদবিন্দু। এই নাদবিন্দুর উপরে হংসপীঠ বা পরমহংসপীঠ। এই হংসপীঠেই আসীন 'গুরুপাদুকা'। গুরুপাদুকা বলতে সকল গুরুরই স্থান। গুরু অর্থে প্রকৃতপক্ষে পরমশিব। এই পাদুকা বা পীঠাসনেই গুরুর চিন্তা বা ধ্যান করতে হয়। গুরু, পরমগুরু ও পরমেষ্ঠিগুরু। পরমেষ্ঠিগুরুই শিবশক্তিসমন্বিত 'হংস',—হং (শিব) + সঃ (শক্তি),—'হংকারঃ শিবরূপেণ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে'। 'হংস' বা পরমহংস শিব ও শক্তির সমন্বিত রূপ',—'শিবশক্তিসামরস্য'। গুরুপাদুকা বা পরমশুদ্ধ গুরুপীঠে বিরাজিত শ্রীগুরু পরমশিব বা শিবশক্তিরূপ।[১৯]

গুরুপাদুকা নাদ-বিন্দু-রূপ পীঠের উপর যে হংস (হং + সঃ):সেই হংসে বা হংস-পীঠের উপর প্রতিষ্ঠিত আসন। সুতরাং গুরুপাদুকার অর্থ পরাশিব বা পরমশিবরূপী

১৮। অ-ক-থাদি রেখাযুক্ত হ-ল-ক্ষ-মণ্ডলীর নাম 'কামকলা'। অ-ক-থাদি রেখাযুক্ত এই ত্রিকোণ বামাবর্তে রচিত হয়। এই কামকলাই হংস বা শিব।

১৯। তন্ত্রের সাধনায় 'গুরুপাদুকা' ও বেদান্তের সাধনায় 'প্রেষমন্ত্র' প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। প্রেষমন্ত্র ও গুরুপাদুকা উভয়েই ধ্যান ও অনুভূতির রূপ, কেবল পাঠ নয়।

শ্রীগুরুর পাদুকা বা পীঠস্থান।[২০] সুতরাং বুঝা যায় যে 'পাদুকা' অর্থে আসন বা পীঠভূমি—যেখানে জ্ঞানময় গুরু (শ্রীগুরু = পরমশিব) সর্বদাই আসীন বা অধিষ্ঠিত। যে হংসের উপর জ্ঞানময় গুরুর আসন বা পীঠ স্থাপিত, সেই হংসের শরীর জ্ঞানময়, পক্ষ দুটি আগম ও নিগম, চরণযুগল শিব + শক্তি (অবিনাভাবে), চঞ্চুপুট প্রণব এবং নেত্র ও কণ্ঠ কামকলা (মহাশক্তি)। এ'গুলি সাধকের কল্পনা এবং এই কল্পনাই পরিশেষে বাস্তবে পরিণত হয়। পাদুকা বীজমন্ত্রে গঠিত ও অনুভূতিমূলক।

শক্তিসাধনায় ও বিশেষ ক'রে অর্ধকালীমতের সাধনায় গুরুপাদুকায় সাজানো থাকে দু'টি শ্রেণীতে ১২টি ক'রে বীজমন্ত্র ('two twelve-syllabled mantras')। এজন্যই গুরুপাদুকা মন্ত্রময় বা মন্ত্রময়ী। গুরুপাদুকায় আরোহণ ও অবরোহণ দুটি শক্তির মিলন ঘটে। আরোহণ-শক্তি বা তত্ত্ব 'উন্মনী',—যা ঊর্ধ্বগতি-সম্পন্ন শক্তিপ্রবাহ ও পরমশিবের (হং) দিকে প্রসারিত এবং অবরোহণশক্তি 'সমনী',—পরাপ্রকৃতি মহাশক্তির (সঃ) দিকে প্রসারিত। এই উন্মনী ও সমনীই ঊর্ধ্ব ও অধোমুখী দু'টি ত্রিকোণরূপ প্রতীক সৃষ্টি করেছে শিব (হং) ও শক্তিকে (সঃ) বুঝানোর জন্য। হং + সঃ এই শিব-শক্তির সামরস্য বা মিলন-রূপ। গুরুপাদুকাও ঐ উন্মনী ও সমনী—ঊর্ধ্বমুখী ও অধোমুখী ত্রিকোণদুটির সম্মিলিত রূপ সামরস্য—

'সামরস্য বপুরিষ্যতে পরা পাদুকা পরমশিবোন্মনোঃ গুরোঃ' ॥

গুরুপাদুকা গুরুর তথা পরমশিবের আসন বা পীঠ—যার রূপ সূচিত হয় ষট্‌-কোণরূপ প্রতীকের সাহায্যে। সহস্রারকমলে পরমেষ্ঠিগুরুরূপ শিবশক্তির সামরস্য। সামরস্য-বলতে সমরস বা একরস=চৈতন্যমাত্র। শিব ও শক্তি (হং এবং সঃ) সাধারণত ভিন্ন ব লে মনে হয়, কিন্তু পুরুষতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব (হং) এবং প্রকৃতিতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব (সঃ) অবিনাভাবসম্বন্ধে এক ও অখণ্ড এবং এটিই তন্ত্রের অদ্বৈত। কিন্তু অদ্বৈত-বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্ব ও অদ্বৈতদৃষ্টি এ'থেকে ভিন্ন।

সাধারণত আজ্ঞাচক্রে শ্বেতবর্ণ (শুদ্ধতত্ত্ব) শ্রীগুরুকে ধ্যান করাব জন্য বলা হয়, কিন্তু শ্রীগুরু বা পরমতত্ত্ব পরমশিব আজ্ঞাচক্রেরও উপরে নাদবিন্দুর ঊর্ধ্বপীঠ বা হংসপীঠ এবং সেই হংসপীঠে সদাশিব নির্গুণ-শিব সর্বদা আসীন। তাছাড়া শিবসংহিতায় (৫।১৪৮-১৪৯) আছে—

'আজ্ঞাপদ্মমিদং প্রোক্তং যত্র প্রোক্তো মহেশ্বরঃ।
পীঠত্রয়ং ততশ্চোর্ধ্বং নিরুক্তং যোগচিন্তকৈঃ।
তদ্বিন্দুনাদশক্ত্যাখ্যো ভালপদ্মে ব্যবস্থিতঃ।'

২০। 'হংসপীঠোপরি নাদবিন্দুমধ্যস্থ মণিপীঠোর্ধ-ত্রিকোণে গুরোধিবাসঃ।' এটিই গুরুস্থান।

আজ্ঞাচক্রে মহেশ্বর তথা মহাকাল থাকেন। ঐ আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধে তিনটি পীঠ (আসন) কল্পনা করেন যোগীরা। ঐ তিনটি পীঠের (আসনের) নাম বিন্দুপীঠ, নাদপীঠ ও শক্তিপীঠ। এই তিনটি পীঠ কপালদেশে পদ্মের উপর অবস্থিত। কিন্তু গুরুপাদুকা নাদ ও বিন্দুপীঠের উপরে যে হংসপীঠ,—তার উপর প্রতিষ্ঠিত সে'কথা পূর্বে বলেছি। এই গুরুপাদুকারূপ গুরুর বা শ্রীগুরুপীঠের প্রতীক ষট্‌কোণ বা ষড়্‌দলযুক্ত জ্যোতির্ময় পদ্ম। অনেকে ষড়্‌দলের পরিবর্তে দ্বাদশদল (৬ × ২ = ১২)-পদ্মে শ্রীগুরুর আসন বা পীঠ কল্পনা করেন। অবশ্য শ্বেতবর্ণ নাদ, তার উপর বিন্দু ও বিন্দুর উপর যোগীরা অধোমুখ সহস্রদল-কমলের নীচে একটি ঊর্ধমুখ দ্বাদশদল-পদ্মও কল্পনা করেন। কিন্তু আসলে উন্মনী—শিব এবং সমনী—শক্তি = প্রতীক দুটি ত্রিকোণ—একটি ত্রিকোণ ঊর্ধমুখী (শিব বা পুরুষ) ও অপরটি অধোমুখী (শক্তি বা প্রকৃতি) = ষট্‌কোণ। সেজন্য গুরুপাদুকা বা শ্রীগুরুর পীঠাসন সামরস্যরূপ শিব-শক্তিরই (চনকাকারে) সম্মিলিত সমরস-অখণ্ডরূপ।[২১] তন্ত্রে শ্রীগুরু শক্তিসহকৃত শিব (শিবশক্তিসামরস্য) এবং বেদান্তে তিনি বিশুদ্ধজ্ঞান-রূপী চৈতন্য (হংস অর্থাৎ পরমহংস)। এখানে ত্যাগপন্থী সন্ন্যাসীদের পরমহংস-গায়ত্রী স্মরণ করতে বলি। হংস অর্থাৎ পরমহংসই সত্যকারের শ্রীগুরু এবং তিনিই ইষ্ট বা ইষ্টদেবতা। যোগী তান্ত্রিক বেদান্তী ভক্তিসাধক সকলের পক্ষেই গুরুতত্ত্বের অভিন্নরূপ ইষ্টতত্ত্বের অনুধ্যান একান্ত উপযোগী।

॥ মমঃ গোপীনাথ কবিরাজ গুরুপাদুকা-সম্বন্ধে ॥

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এই গুরুপাদুকাতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেছেন: "In the *Yogic sādhanā* of certain Tāntric schools especially those affiliated to the *ardhakāli* line, we are told that the two twelve-syllabled *mantras* (= হ স খ ফ্রেং, হ স ক্ষ ম ল ব র যূং + স হ খ ফ্রেং, স হ ক্ষ ম ল ব র যীং = ১২), constitute the complete *Pādukā-mantra.*[22] Sri Gurudeva represents *Unmani*

২১। 'অহং-ইদং'-এর সমভাব। অহং = মহেশ্বর ও ইদং = বিন্দুশক্তি এবং 'অহং-ইদং'-তত্ত্বই ঈশ্বরতত্ত্ব = পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্ব।

২২। (a) Added with ঐং হ্রীং শ্রীং in the beginning and হ্সৌঃ সহৌঃ in the end. Some are inclined to add ঐং after ঐং হ্রীং শ্রীং, but it will be ঐং হ্রীং শ্রীং and not ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং।

and *Samani* aspects of the Absolute respectively. The former suggests the upward motion in the direction of the Supreme *Purusha* (হ্) with the Supreme *Prakriti* (স). The latter suggests that the Supreme *Purusha* (স) which descends from the glance (ঈক্ষণ) of *Para-Brahman* or *Unmani* Śiva floods with Delight, the *Supreme Purusha* (হ্) in the course of its descent. These symbolize in the undivided (অখণ্ড) Absolute Consciousness (চিৎ) both the upward and downward movements of the Divine. Behind *Unmani* and *Samani*, there is only one single Essence, for *Purusha* and *Prakriti* are ultimately one and the same *Brahman*, and are symbolized by the triangle with its vertex upwards and the other by the triangle with its vertex downwards. The familiar *shatkoṇa* (ষট্‌কোণ) as an interlaced figure signifies the union which is represented (they say) by the twelve petalled lotus above the pericarp of the সহস্রদলপদ্ম। In fact, the conception of *Guru-pādukā* is its highest expression in the conception of Sāmarasya (সামরস্য) *par excellence*. It is said,

‘স্বপ্রকাশ শিবমূর্তিরেকিকা
তদ্‌বিমর্শ তনুরেকিকা তয়োঃ।
সামরস্যবপুরিষ্যতে পরা
পাদুকা পরশিবাত্মনো গুরোঃ ॥’’

তন্ত্রালোচনার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, সোমপুরী প্রভৃতি বৌদ্ধ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিয়মিতভাবে তন্ত্রশাস্ত্র পড়ানো হোত।

(b) আনন্দভৈরব-শিব এবং আনন্দভৈরবী-শক্তি। একজন আনন্দভৈরবের সঙ্গে যুক্ত হবে হ স ক্ষ ম ল ব র যূং=৮টি বীজাক্ষর এবং আনন্দভৈরবীর সঙ্গে যুক্ত হবে স হ ক্ষ ম ল ব র যীং=৮টি বীজাক্ষর। এই আটটি বীজাক্ষর শিব-শক্তি অনুসারে পাদুকামন্ত্রেও থাকবে। ‘হ স ক্ষ’ শিবপক্ষে এবং ‘স হ ক্ষ’...শক্তিপক্ষে ব্যবহৃত (হ=শিব এবং স=শক্তি)।

সম্প্রদায়ভেদে গুরুপাদুকার সামান্য অক্ষরভেদ পাওয়া যায়। তন্ত্রসাধনায় পূর্ণাভিষিক্ত যাঁরা তাঁদের পক্ষেই পাদুকা বিহিত।

ডঃ সঙ্কালিয়া তাঁর 'নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়'-গ্রন্থে বিশেষভাবে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। অতীশ-দীপঙ্কর (শ্রীজ্ঞান) ছিলেন মগধে বিক্রমশীলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সুপণ্ডিত অধ্যাপক। তিব্বত থেকে পণ্ডিত ও সাধক জয়শীল (Tshul-Khrims rgyal-ba) ভারতে পদার্পণ ক'রে মগধে বিক্রমশীলা-বিহারে কিছুদিন ছিলেন এবং দীপঙ্করকে তিব্বতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সাধক জয়শীল বলেছেন, ওদন্তপুরী-বিশ্ববিদ্যালয়ে তিপ্পান্ন জন পণ্ডিত বৌদ্ধভিক্ষু অধ্যাপনা করতেন এবং বিক্রমশীলায় ছিলেন প্রায় একশত বৌদ্ধভিক্ষু-অধ্যাপক। বৌদ্ধ-তন্ত্রশাস্ত্রে ও তন্ত্রাচারে তাঁরা বিশেষ-অভিজ্ঞ ছিলেন। অতীশ দীপঙ্কর বা দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান তিব্বতে তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রসাধনা প্রচার করেন। তাঁর প্রচারিত সাধনাগুলি ছিল যোগভিত্তিক। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 'কাশ্মীর ও তিব্বত'-গ্রন্থে তিব্বতের বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মসাধনার আলোচনায় তন্ত্রাচারের উল্লেখ করেছেন। তিব্বতে তন্ত্রসাধকরা বৌদ্ধ-বজ্রযানমতে সাধনা করতেন এবং শ্রীজ্ঞান-অতীশের পরেও তিব্বতে তন্ত্রাচার ও তন্ত্রসাধনার প্রচলন বহুদিন ধরে বর্তমান ছিল এবং এখনও আছে।[২৩]

॥ লামা তারানাথের অভিমত ॥

ঐতিহাসিক লামা তারানাথের মতে, তন্ত্রধর্ম ও তন্ত্রসাধনা বহুপূর্ব থেকে বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যদের সমাজে প্রচলিত ছিল এবং আচার্য অসঙ্গ ও আচার্য ধর্মকীর্তির সময়ে বৌদ্ধতন্ত্রের সাধনপ্রণালী বিশেষভাবে গোপন করা হয়েছিল। তাছাড়া সরহপাদ, নাগার্জুন, লুইপাদ, পদ্মবজ্র, অনঙ্গবজ্র এবং পরিশেষে রাজা ইন্দ্রভূতিই তন্ত্রাচার ও

২৩। (ক) মাননীয় ইভান্স-ওয়েন্জ *Tibetan Yoga and Secret Doctrines* (1907)-গ্রন্থে তিব্বতে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের ধর্মপ্রচারপ্রসঙ্গে লিখেছেন: "Dipankara (Sri-jnana), as given in our text, is the Indian name of Atisha, the first Great Reformer of Lamaism, who was born in Bengal, of the royal family of Gour, in A. D. 980, and arrived in Tibet in 1038. Having been a professor of philosophy in the Vikramashila Monastery of Magadha, he brought with him to Tibet much fresh learning, chiefly relating Yoga and Tāntricism". (p. 99)

(খ) তিব্বতীয় যোগী মেলারেপাও লয় বা কুণ্ডলিনীযোগ শিক্ষা করেছিলেন ভারতীয় তন্ত্র থেকে। মোটকথা তিব্বতীয়-তন্ত্রের উৎস ছিল ভারতীয় তন্ত্র,—যদিও কিছু কিছু মন্ত্র তিব্বতী ভাষায় বিকৃত বা পরিবর্তিত দেখা যায়।

তন্ত্রসাধনাকে প্রকাশ্যভাবে সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ ও প্রচার করেন। আচার্য পদ্মবজ্র-লিখিত 'গুহ্যসিদ্ধি'-গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' বজ্রযানসম্প্রদায়ের বৌদ্ধ-তন্ত্রসাধনার একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। রাজা ইন্দ্রভূতি 'জ্ঞানসিদ্ধি'-গ্রন্থে গুহ্যসমাজের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন। কথিত আছে, বৌদ্ধতন্ত্রবাদকে সাধকসমাজে সুপরিচিত করার জন্য সর্বতথাগত কায়বাক্‌চিত্ত সিদ্ধেরা গুহ্যসমাজতন্ত্রের মতবাদ ও সাধন-প্রণালী একটি বৌদ্ধ-অধিবেশনে উপস্থাপন ও প্রচার করেছিলেন। আবার অনেক মনীষীর অভিমত যে, ভগবান তথাগত-বুদ্ধের জীবদ্দশায়ই তন্ত্রের মূলসূত্রগুলি লেখা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর অধিকাংশ শিষ্যেরা সে'গুলি গ্রহণ করেন নি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিরুদ্ধাচরণও করেছিলেন,—যার জন্য দ্বিতীয় মহাধিবেশনে স্থবিরগণ মহাসাঙ্ঘিকদের অনেককে ধর্মসংঘ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। শোনা যায়, অনেক বৌদ্ধস্থবির ঐ সকল তন্ত্রাচারের মূলসূত্রের উপর বিশ্বাসী ছিলেন ও তাঁরা ঐ সকল তন্ত্রাচার গোপনে সাধনও করতেন। তাছাড়া বৌদ্ধতন্ত্রের আদিম-মূলসূত্রগুলি সংগীতির আকারে লিপিবদ্ধ ও রক্ষিত ছিল। সুতরাং দেখা যায়, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ এই উভয় যুগেই তন্ত্রসাধনার ধারা বিশেষভাবে ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

তাছাড়া তন্ত্রসাধনার বিস্তৃতি এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বত্রই যে ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই 'পীঠনির্ণয়' বা 'মহাপীঠনিরূপণম্'-গ্রন্থে। 'মহাপীঠনিরূপণম্'-গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য তন্ত্রে, পুরাণে ও এমন কি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-কাব্যেও একান্নটি, কিংবা একশত-আটটি শক্তিপীঠের উল্লেখ আছে। প্রচলিত পৌরাণিকী কাহিনী যে, আর্যগোষ্ঠীপতি দক্ষপ্রজাপতি একটি যজ্ঞ করেছিলেন, কিন্তু সতী-ছাড়া অনার্যবিবেচিত শিবকে দক্ষ-প্রজাপতি সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ জানান নি,—যার জন্য দক্ষতনয়া দেবী উমা দুঃখে ও ক্ষোভে দেহত্যাগ করেন ও শিব সতীর প্রাণহীন দেহকে স্কন্ধে নিয়ে ভারতের চতুর্দিকে ভ্রমণ করতে থাকলে নারায়ণ সুদর্শনচক্রে সেই সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করেন। বহু অংশে ঐ খণ্ডিত সতীদেহ ভারতের যে' যে' স্থানে পতিত হয়েছিল সেই সেই স্থান দেবীতীর্থে পরিণত হয়েছিল। মহাভারতের দ্বাদশ অধ্যায়ে ২৮২-৮৩ শ্লোকগুলি ছাড়া ব্রহ্ম, পদ্ম, মৎস্য, কূর্ম, ব্রহ্মাণ্ড, কালিকা প্রভৃতি পুরাণে এবং দেবীভাগবতে এই দক্ষযজ্ঞের কাহিনী এবং দেবীপীঠের কথা উল্লেখ আছে। কোন কোন পণ্ডিত পুরাণে ও বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্যে উল্লিখিত এই কাহিনীটিকে মাধ্যন্দিনশাখা শতপথব্রাহ্মণে ও তাণ্ড্যব্রাহ্মণে উল্লিখিত প্রজাপতি-অনুষ্ঠিত একটি যজ্ঞকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করেন।

॥ হেবজ্রতন্ত্রের প্রমাণ ॥

খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকে রচিত হেবজ্রতন্ত্রেও চারটি বৌদ্ধশক্তিপীঠের উল্লেখ আছে। হেবজ্রতন্ত্রের রচয়িতা আচার্য পদ্মবজ্র ছিলেন রাজা গোপালের পুত্র ও অনঙ্গবজ্রের গুরু। হেবজ্রতন্ত্রে জলন্ধর, উড্ডীয়মান, পূর্ণাগিরি ও কামরূপ এই চারটি শক্তিপীঠের উল্লেখ দেখি। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার বলেন, ঠিক একই ভাবে কালিকা-পুরাণে (64·43-45) ও যোগিনীতন্ত্রে উল্লিখিত হয়েছেঃ ওড্র (যেখানে দেবী কাত্যায়নী ও ভৈরব জগন্নাথ), জালশৈল (যেখানে দেবী চণ্ডী ও ভৈরব মহাদেব);[২৪] পূর্ণ বা পূর্ণশৈল (যেখানে দেবী পূর্ণেশ্বরী ও ভৈরব মহানাথ) এবং কামরূপ (যেখানে দেবী কামেশ্বরী ও ভৈরব কামেশ্বর)—এই চারটি শক্তিপীঠের কথা। অবশ্য শক্তিপীঠগুলির নামে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। এদের মধ্যে আসামে কামাখ্যাপীঠ ও দেবী কামাখ্যার নাম সর্বজনপরিচিত। তাছাড়া কামরূপ বা আসাম ছিল তন্ত্রসাধনার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। প্রবাদ যে, কাঙুর ও কামাখ্যা (কামরূপ ও কামাখ্যা) তান্ত্রিক মারণ-উচাটন, বশীকরণ' প্রভৃতি সম্মোহনবিদ্যার জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। শোনা যায়, কামাখ্যায় কামাখ্যাদেবীর নিকট নরবলিও দেওয়া হোত তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গরূপে। বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রে দেখা যায়, গান্ধার (কান্দাহার), উড্ডীয়ান, জলন্ধর ও কাশ্মীর (সারদাপীঠ) ছিল তন্ত্রসাধনার প্রশস্ত পীঠ। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙ্ কাশ্মীর প্রভৃতি শক্তিপীঠগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। শোনা যায়, উড্ডীয়ানে বৌদ্ধদেবী মারীচী, কুরুকুল্লা (হিন্দুদেবী কালী), দেবতা লোকেশ্বর, উর্ধ্বপাদ বজ্রবারাহীদেবী প্রভৃতি পূজিতা হতেন। উড্ডীয়ানের অধিপতি ইন্দ্রভূতি ছিলেন প্রখ্যাত তন্ত্রসাধক। 'জ্ঞানসিদ্ধি' নামে একটি তন্ত্রগ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। বৌদ্ধযোগাচারমতের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য পদ্মসম্ভবের তিনি গুরু ছিলেন। তাছাড়া মহারাজ ইন্দ্রভূতির ভগিনী লক্ষ্মীঙ্করা ছিলেন বিখ্যাত তন্ত্রসাধিকা। তিনি 'অদ্বয়সিদ্ধি' নামে একটি বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। তন্ত্রসাধক পদ্মসম্ভব তন্ত্রধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন ৭৮০-৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে।[২৫] বজ্রযানী বৌদ্ধেরা তন্ত্রসাধনা করতেন এবং খ্রীষ্টীয় ১০ম শতকে রচিত চর্যাগীতি ও বজ্রগীতিগুলি তার নিদর্শন। চর্যা ও বজ্রগীতিগুলিতে গোপন সাধনের ইঙ্গিত দেওয়া আছে এবং বৌদ্ধ-সাধকরা অভিপ্রায়িক সন্ধ্যাভাষায়

২৪। ওড্র ও জালশৈলের প্রকৃত নাম উড্ডীয়ান ও জলন্ধর।
২৫। Vide *Sādhanamālā*, 'Introcuction', p. XXI.

কথাবার্তা বলতেন। এই বৌদ্ধগীতিগুলিই পরে সহজিয়া-সাধনায় প্রেরণা দান করে।

॥ মহাশক্তি কালী ও কুণ্ডলিনী ॥

এখানে বলা প্রয়োজন যে তন্ত্রসাধনায় মন্ত্রজপে মন্ত্রচিন্তাই প্রধান এবং মন্ত্রই দেবতাস্বরূপ। তন্ত্রসাধনায় যন্ত্র, মন্ত্র, তন্ত্র প্রভৃতির চিন্তায় ও প্রয়োগে আদ্যাশক্তি-রূপিণী কালীর অভিন্ন রূপ কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হন। তন্ত্রাচারে বাগ্‌ভেদ, পর-পুরুষ, অপর-পুরুষ, অপর-কাল, মাতৃকাতত্ত্ব ও মাতৃকাবর্ণ, মন্ত্রস্বরূপ ও তার প্রকারভেদ প্রভৃতির নির্দেশ ও উপদেশ থাকলেও মন্ত্রসিদ্ধির পর মন্ত্রতত্ত্বদর্শনে শিবশক্তির সমরসভাব উপলব্ধি করানোই তন্ত্রসাধনার সার্থকতা। তাছাড়া তন্ত্রশাস্ত্রে নির্দিষ্ট অহন্তারূপ মহাবিন্দুতে অবস্থিত সিত, শোণ ও মিশ্র এই তিনটি বিন্দুর প্রসঙ্গ আছে। 'অহং' শব্দের অ-কার অনুত্তরশিবের ও হ-কার এবং বিসর্গ শক্তির বোধক। শিব ও শক্তি অনুলোম-বিলোমে হেসৌ ও সেহৌ নামে পরিচিত। হেসৌ = হ + স = হংস বা শিবশক্তি = পরমহংস। বেদান্তে 'হংস' বলতে পরমাত্মা বা ব্রহ্মচৈতন্য, আবার ওঙ্কারে কলা ও বিন্দু (˙) শক্তি ও শিবের বোধক। অগ্নিষোমাত্মক বিমর্শশক্তি ও তদুভয়াত্মক কাম (কামনা) থেকেই বিন্দুসমষ্টির সৃষ্টি এবং ঐ বিন্দুসমষ্টিই কামকলা, ললিতা বা ত্রিপুরসুন্দরী নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে কামকলাই কুণ্ডলিনীশক্তি। মূলাধারে প্রসুপ্তা কামকলা এবং আজ্ঞাচক্রের উপরে সোমকলা বা চন্দ্রকলা অবস্থিত সে'কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। চন্দ্রকলা বলতে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রকৃতি বা মহাপ্রকৃতি। সোমকলাকে পূর্ণাহন্তা বা পরামাতৃকাশক্তি বলে। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির সমষ্টিরূপই বিমর্শশক্তি। এই বিমর্শশক্তিই কামকলা। কামকলা বা কুণ্ডলিনী মূলাধারে নিদ্রিতা এবং তাঁর জাগরণেই মন্ত্রসিদ্ধি, তন্ত্রসিদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে জীবনসিদ্ধি সাধিত হয়। মন্ত্রসিদ্ধিতে মন্ত্র ও দেবতার অভেদ জ্ঞান হয়। এরই নাম জীবনসিদ্ধি ও সাধনসিদ্ধি। তন্ত্রসাধনা জীবনসিদ্ধিরূপ মুক্তি বা শিবশক্তির সামরস্যজ্ঞানের উপলব্ধি। পার্থিবসিদ্ধি-রূপ অষ্টসিদ্ধি-লাভে নাম-যশাদি লাভ হয়। তন্ত্রসাধনায় তাই আত্মোৎসর্গের ব্রত ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হয়। প্রতিজ্ঞা করতে হয়— "মান চাই না, যশ চাই না, পার্থিব ঐশ্বর্য চাই না, চাই কেবল মাতৃমূর্তির রহস্যভেদ, মাতৃমূর্তি ও যন্ত্রের ঐক্যতা এবং শিব ও শক্তির অভিন্নতাসাধন। এই অভিন্নতার বা অভেদের জ্ঞান হয় সকল ভেদ বা দ্বৈতজ্ঞানকে বিসর্জন দিলে। তাই বেদান্তবাদীরা ছিলেন ব্রহ্মসম্বন্ধে যথার্থ-

জ্ঞানী। যথার্থজ্ঞান হয় ভেদ ও অভেদ,—দ্বৈত ও অদ্বৈতের পারে। এই সম্বন্ধে আচার্য শঙ্কর প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন—'দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্'। কিন্তু তন্ত্রাদ্বৈতবাদ শিব ও শক্তির অবিনাভাব-সামরস্য স্বীকার করে,—যাতে শক্তি শিবে কারণাকারে একীভাব-সম্পন্ন হয়। এই অবিনাভাবাদ্বৈতবাদ বা শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই নামান্তর—একথা অপ্পয়দীক্ষিত বলেছেন তাঁর শিবার্কমণিদীপিকায়। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্করও 'প্রপঞ্চসারতন্ত্র' রচনা করেছেন তন্ত্রতত্ত্বের আলোচনাপ্রসঙ্গে এবং তার ভাষ্য রচনা করেছেন বিবরণপ্রস্থান-প্রতিষ্ঠাপক পদ্মপাদাচার্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বসমন্বয়ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই বিশ্বাস তিনি লাভ করেছিলেন সকল ধর্মমতের সাধনায় ও অখণ্ডতত্ত্বের অনুভূতিতে। সেজন্য শ্রীরমেকৃষ্ণদেব সাধনার প্রথম দিকে তন্ত্রসাধনায় আত্মনিয়োগ করলেও কেবল তন্ত্রমতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, পরন্তু সকল ধর্মমতের সাধনা ও উপলব্ধি সমন্বয়সাধন ক'রে সেই উদার ও অসাম্প্রদায়িক ধর্মমতকে প্রচার করেছিলেন।

॥ তন্ত্রসাধনা আচার ও অনুষ্ঠানমূলক ॥

তন্ত্রসাধনা অনুষ্ঠান বা ক্রিয়ামূলক। তন্ত্রসাধনা রূপাশ্রয়ী ও ভাবাশ্রয়ী। তন্ত্র-সাধনায় ছত্রিশটি তত্ত্বের সঙ্গে সাধকের পরিচয় লাভ করা দরকার। পরশুরাম-কল্পসূত্রে (১।২) আছে—'ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বানি বিশ্বম্'। শিব, শক্তি, সদাশিব, বিদ্যা, মায়া, অবিদ্যা, কলা, রাগ, কাল, নিয়তি, জীব বা পুরুষ, প্রকৃতি, মন প্রভৃতি ছত্রিশটি তত্ত্ব।[২৩] (১) শিবতত্ত্বে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপিণী শক্তির পরিচয় দেওয়া আছে। ইচ্ছাশক্তিরূপ উপাধিযুক্ত শিব বা সদাশিবই শিবতত্ত্ব, (২) শক্তিতত্ত্ব সৃষ্টির ইচ্ছারূপা শক্তি, (৩) এই ভাবে বিশ্বচরাচরের সঙ্গে যে শক্তি অভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট তার নাম 'সদাশিবতত্ত্ব'। বাকী তত্ত্বগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে শক্তি অর্থাৎ বিমর্শশক্তির কার্য ও প্রকাশ-অনুযায়ী।

॥ তত্ত্ব-সম্পর্কে সাধক রামপ্রসাদ ॥

এবার রামপ্রসাদের 'ডুব দেরে মন কালী ব'লে'-গানটির যথার্থ রহস্য ও তত্ত্ব কি সেই সম্বন্ধে কিছুটা অনুশীলন করি। পূর্বে এ' সম্বন্ধে সামান্যভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সাধক রামপ্রসাদ ছিলেন সিদ্ধসাধক। সাধনায় সিদ্ধিলাভের

২৩। তত্ত্ব-সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করেছি, তবে তত্ত্বের সংখ্যাভেদ ও অর্থভেদ আছে।

উদ্দেশ্যে তত্ত্বপূর্ণ এই গানটি তিনি রচনা করেন গানের সঙ্গে সঙ্গে নিবিড়ভাবে এর ভাব, চিন্তা বা ধ্যান করার জন্য। সাধক রামপ্রসাদের গানটির পুনরাবৃত্তি ক'রে বলি—

ডুব দে রে মন কালী বলে,
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি, দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুলকুণ্ডলিনীর কুলে॥—প্রভৃতি[২৭]

গানটি রচনা করেছেন সাধক রামপ্রসাদ পরিপূর্ণ অধ্যাত্মসাধনার ইঙ্গিত দিয়ে। গানটির মধ্যে যথার্থ তথ্য ও পূর্ণভাবে নিহিত তত্ত্ব আছে। গানটির সাধারণ অর্থ : কালীর পবিত্র নাম নিয়ে হৃদি-রত্নাকর বা হৃদয়-সমুদ্রে ডুব দাও। সমুদ্রের জল গভীর, তার সীমা নির্দেশ করা কঠিন। সমুদ্রকে রত্নাকর বলে, কেননা সমুদ্রের অতল-তলে বহু মণিমাণিক্য (ধন-রত্ন) ছড়ানো আছে, সন্ধানী ডুবুরীরা সমুদ্রের গভীর জলে ডুব দিয়ে যেমন তার তলদেশে বিস্তীর্ণ মণিমাণিক্য তুলে নিয়ে আসে ও অগাধ ধন-রত্নের অধিকারী হয়, তেমনি হৃদয়রূপ সমুদ্রের তলদেশে অসংখ্য মণিমাণিক্য আছে, আর মণিমাণিক্য আছে ব'লেই হৃদয়সমুদ্রকে 'রত্নাকর' বলে। সাধক রামপ্রসাদ এই রহস্যময় হৃদয়-রত্নাকরের গূঢ়তত্ত্ব জানেন এবং জানেন যে, দু'চার ডুবে ধন বা মণিমাণিক্য পাওয়া যায় না। তাই হৃদি-রত্নাকরের তলদেশের গভীরে ডুব দিতে হয় বারবার অসীম ধৈর্য্য সহকারে, তবেই 'রত্ন' পাওয়া যায়। অথবা যদি দু চার ডুব দিয়ে রত্ন না মেলে তবে এটা সিদ্ধান্ত নয় যে, রত্নাকর শূন্য বা মণিমাণিক্য রত্নাকরে নেই। তাই কল্যাণী কুলরূপিণী কালীর নাম নিয়ে একদমে রত্নাকরের গভীর দেশে (তলায়) যেতে হয়, তবেই রত্ন মেলে ও জীবন সার্থক হয়। তখন জীবনসিদ্ধ সাধক দর্শন করেন 'কালী পদ্মবনে হংস-সনে হংসীরূপে করে রমণ'। হংসী কুণ্ডলিনীশক্তি কালী ও হংস পরমশিব,—যিনি সহস্রার-রূপ পদ্মের বনে মিথুনাকারে অথচ অখণ্ড-রূপে মিলিত। শিবশক্তির এই

২৭। (ক) কুল+কুণ্ডলিনী। কুল—কালী,—অর্থাৎ দেবী কালিকার সৃষ্টির উৎস কুণ্ডলিনীশক্তি,—যে শক্তি মহাশক্তি বিশ্বপ্রকৃতিরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-পালন করেন।

(খ) কালীমূর্তিতে কুণ্ডলনী-মহাশক্তির (ব্যষ্টি) ও বিশ্বব্যাপিনী মহাপ্রকৃতির (সমষ্টি) পূর্ণপ্রকাশ বা প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি।

অখণ্ড রূপই সমরস-অমৃতধারা। এই অমৃতধারায় স্নাত হওয়ার নামই মুক্তি। এটি রূপকের কথা, আসলে শিবই শক্তি ও শক্তিই শিব—এই শিবশক্তির অবিনাভাব-রূপানুভূতিই শাক্তদর্শনে মুক্তির দিশারী। সাধক রামপ্রসাদ এই তত্ত্বদর্শনের দিশারী ছিলেন।

সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন এই গানের তত্ত্ব আরও গভীর। তাই তিনি কালীর নাম নিয়ে সাধনা করতে বলেছেন হৃদয়সমুদ্রে নিহিত অমূল্য রত্ন আত্মজ্ঞান বা শিবতত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য। শিব ও শক্তি শক্তিসাধনার দুটি প্রধান রত্ন বা তত্ত্ব। শক্তি বা কালী ক্রিয়াময়ী চঞ্চলা, আবার প্রকাশময় অকুল-শিব সর্বক্রিয়াবিহীন নিশ্চঞ্চল চৈতন্যরূপী ঈশ্বর। শিবের সচঞ্চল রূপ বা মূর্তিই নৃত্যশীলা কালী। নৃত্যশীলা কালী তাই নটরাজ শিব। তিনি যখন স্বরূপে নিশ্চঞ্চল বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে থাকেন তখন নৃত্যবিহীন নটরাজ, কিন্তু যখন নৃত্য করেন তখন তিনি নৃত্য বা সৃষ্টিরূপ মূর্তি ধারণ করেন। নৃত্যশীল নটরাজ ও নৃত্যশীলা কালীর মধ্যে তাই পার্থক্য বিশেষ-কিছু নাই, তবে কালীর পদতলে শান্ত-ধীর-নিশ্চঞ্চল নির্গুণ-শিব কেন শায়িত—তার রহস্য এই যে, শক্তি শিব ছাড়া অন্য কিছু-নয়। কালী তাই শান্ত-বুদ্ধ-শিবেরই সচঞ্চল সৃষ্টিময়ী রূপ। নটরাজের পদতলে শায়িত পাপ বা মৃত্যুরূপ অপস্মার। নটরাজ তাঁকে দলিত ও মথিত ক'রে পাপজয়ী ও মৃত্যুঞ্জয়ী। নটরাজের হস্তে প্রজ্জ্বলিত জ্ঞান ও জীবনের অগ্নিজাল, কিন্তু কালীর এক হস্তে সর্বপাপ ও দৈন্যনাশী খড়্গ ও অপর হস্তে অভয়মুদ্রা। কালী মৃত্যুকে দমন বা নাশ ক'রে শরণাগতকে আশীর্বাদ ও কল্যাণময় নবজীবন দান করেন। নটরাজ শিবও তাই।

সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন :—'ডুব দে রে মন কালী ব'লে'। ডুব দেওয়ার নামই নিবিড় সাধনা (অধ্যাত্মসাধনা বা শক্তিসাধনা)। সাধনার সূচনা বা আরম্ভ শক্তিরূপিণী কালীকে নিয়ে। কালীই তত্ত্ব-সাধনা এবং সিদ্ধি শিবস্বরূপ,—অর্থাৎ শিবশক্তি-সামরস্যসাধন শক্তিসাধনার গূঢ়রহস্য। সৃষ্টি থেকে তাই সৃষ্টির পরপারে অচঞ্চল ও শান্ত-স্থির-মুক্তিরহস্যে উপনীত হতে হয়। কালীকে স্মরণ বা সহায় ক'রে তাই শক্তিসাধনার পারে শিব-ব্রহ্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়। এইজন্য একনিষ্ঠভাবে সাধনার প্রয়োজন। হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ধীরে ধীরে তাই নেমে যেতে হয় শান্তি, মুক্তি বা শিবরূপের যথার্থ আস্বাদন লাভের জন্য। তন্ত্রে শিবস্বরূপতা বা শিবসত্তা শক্তিকে ছেড়ে নয়, শক্তির কারণরূপকে নিয়েই শিবকারণের অভিন্ন মিলন। এই মিলন দুটি পৃথক বস্তুর বা তত্ত্বের একত্র

মিলণকে নিয়ে নয়, এই মিলন তাদাত্ম্য অর্থাৎ চনকাকারে দু'টিতে মিলে এক ও অভিন্ন। অখণ্ডতার মধ্যে দুটি চৈতন্যের সত্তা একরূপে বা অখণ্ডরূপে থাকে। শাক্তদর্শনের আসল কথাই তাই যে, শিবই সৃষ্টিরূপে শক্তি। শক্তি যখন অচঞ্চল ও অবিচ্ছুরিতরূপে স্থির তখন শিব। সুতরাং শিব ও শক্তি এক ও অভিন্ন,—যেমন সাপ কখনও চলে, আবার কখনও চলে না, স্থির থাকে। শিব ও শক্তি যে এক, সৃষ্টিকারী ও সৃষ্টিরূপ যে এক ও অভিন্ন—এই তত্ত্বই বুঝিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাপের উদাহরণ দিয়ে। এই তত্ত্বই রত্ন ও মহামণি-মাণিক্য,—যাকে পেলে জীবনে সব পাওয়া হয়, বা সব পাওয়াব নিবৃত্তি হয়।

সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন : 'তুমি, দম-সামর্থ্যে একডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে', অর্থাৎ কুণ্ডলিনীব মূলে। সাধকেব ভাব হচ্ছে-হবে এই ম্যাদাটে ও মন্থর হ লে হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন,—জীবনে 'হচ্ছে-হবে' এই ধীর-মন্থর-অনড ও ম্যাদাটে-ভাব ভাল নয়। সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন 'আয মা সাধন সমরে দেখি মা হাবে কি পুত্র হারে'। এখানে 'বণং দেহি' বা চ্যালেঞ্জের ভাব,—সাধনার প্রচেষ্টা। মোটকথা একনিষ্ঠ সাধনা চাই। সাধনার মন্ত্র হবে তখন 'সংকল্প-সাধন কিংবা শরীর-পতন',—যেমন গোতমবুদ্ধ নিবঞ্জনানদীব তীরে বোধিদ্রুমমূলে বসে সাধনার পূর্বে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং, ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ জাতু'…। একেই দম-সামর্থ্যে বা একদমের (একনিষ্ঠ) সাধনা বলে। সাধনায় রোক থাকা চাই। সিদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত লেগে থাকা চাই। রামপ্রসাদ 'একদমে কুল-কুণ্ডলিনীর কুলে' উপনীত হ'তে বলেছেন। কুলই কালী। তাই কুল, কালী ও কুণ্ডলিনী-শক্তি এক ও অভিন্ন। 'কুলকুণ্ডলিনী'-র কুল বলতে কম্পন বা সৃষ্টিরূপহীন কামকলা। কুণ্ডলিনী মহাশক্তি প্রকৃতির ব্যষ্টি-রূপ।

॥ কুণ্ডলিনীর দু'টি রূপ ॥

মহাশক্তি কুণ্ডলিনীর দু'টি রূপ,—একটি, অবিচ্ছুরিত-অখণ্ড-পরিশুদ্ধরূপ ও অপরটি, বিচ্ছুরিত খণ্ডরূপ পরা, পশ্যন্তি প্রভৃতি। প্রকৃতির খণ্ডরূপ তিনটি,—পরা পশ্যন্তী ও মধ্যমা। পরা খণ্ডরূপে মহাকালযুক্ত-সৃষ্টিরূপা ও নৃত্যশীলা কালী। এটিই বিচ্ছুরিত শক্তি,—পরা। অ-পরা বিশুদ্ধ কুণ্ডলিনীর অবিচ্ছুরিত রূপ। এই রূপের নাম 'সদা-শিব'—নিগুর্ণ-অচঞ্চল-অবিচ্ছুরিত শিব ও শক্তি দু'টিতে মিলে চণকাকারে অখণ্ডরূপ। বিচ্ছুরিত শক্তি তিনটি—পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা। এই তিনটি রূপেই গুহাবাসী (হৃদয়গুহাবাসী) নিত্য এবং অনিত্য রূপ বৈখবী,—কণ্ঠাহত স্থূলশব্দ, পার্থিব ধ্বনি।

সাধক রামপ্রসাদ কিন্তু কুণ্ডলিনীর কুলে যেতে বলেছেন,—কেননা সেখানে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত থামতে নিষেধ করেছেন। পূর্বেই বলেছি, কুণ্ডলিনীর কুল দু'টি—একটি অবিচ্ছুরিত-অকূল-সদাশিব ও অপরটি বিচ্ছুরিত মহাকাল বা মহাকালযুক্ত নৃত্যলীলাময়ী শক্তি কালী। সাধক রামপ্রসাদ সদাশিবের-কুলে বিশুদ্ধ শিবকোটিতে উপনীত হয়ে সর্বস্পন্দনহীন একমাত্র চিতিরূপা (চৈতন্য) শিবস্বরূপকে লাভ ও উপলব্ধি করতে বলেছেন। শবরূপ সদাশিব নির্গুণ-শিব ও মহাকাল সগুণ-শিব। সগুণে যথার্থ (সমষ্টি) মুক্তি বা শান্তিলাভ হয় না, কেননা তখনও সৃষ্টির স্পন্দন বা কামনা-বাসনার স্পন্দনরূপে শক্তি-বিচ্ছুরণের কার্য চলে, কার্যের বিরাম হয় নির্গুণে বা সদাশিবস্বরূপে। তাই সাধককে কুলকুণ্ডলিনী বা কালীরূপা-শক্তিকে অতিক্রম ক'রে যথার্থ 'কুল' সদাশিব-'ব্রহ্মে' অমৃতস্বরূপে ও জ্ঞানরূপ অকুলে ('অকুলস্থা-মৃতাকারে' ও শুদ্ধ-জ্ঞানকলেবরে') উপনীত হ'তে বলেছেন রামপ্রসাদ। কুণ্ডলিনী-সম্বন্ধে পরে বিশেষভাবে আলোচনা করবো। নির্গুণ-সদাশিবই 'সমরস' বা মুক্তিরূপ একরস, —যাকে বেদান্তের সাধনায় অদ্বৈতানুভূতি বলা যায়। ঐ অনুভূতি লাভের জন্যই সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন,—'দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুল-কুণ্ডলিনীর কুলে'।

'কুণ্ডলিনী-কালীর কুলে' যেতে সুপ্তা-আধারশক্তির জাগরণ চাই। এই জাগরণ ও শক্তির উদ্বোধন এককথা। তবে সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন, শক্তির জাগরণের পথে বাধা-প্রতিবন্ধক অনেক, অথচ সেইগুলিকে অতিক্রম করতে বা কাটিয়ে যেতে হবে সিদ্ধিলাভের জন্য। বাধা-বিপত্তিগুলির উল্লেখ ক'রে সাধক রামপ্রসাদ পুনরায় বলেছেন—

কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে
আহার-লোভে সদাই চলে,
তুমি, বিবেক-হলদি গায় মেখে যাও
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।[২৮]

কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ-মাৎসর্য—এই প্রধান ছ'টি কুম্ভীর। কুম্ভীর অত্যন্ত হিংস্র জন্তু, আর কামাদি ছয়রিপুও অত্যন্ত হিংস্র। হিংসা করে বলেই হিংস্র। কামনা-বাসনার নাম আসক্তি, আর আসক্তির নামই মায়া বা অবিদ্যা। অবিদ্যা জ্ঞানকে আবৃত করে, জ্ঞান-লাভ থেকে বঞ্চিত করে মানুষকে, আর বঞ্চিত করে

২৮। এখানে সাধক রামপ্রসাদের কথা বা উদাহরণ দিয়েছি। তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রের দিশারী রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি শক্তিসাধকও।

বলেই শত্রু। হিংসা করার নাম বঞ্চিত করা। কাম ক্রোধাদি বিষয়ের চরিতার্থ হয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা, আবার বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই দশটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। পূর্বের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পরের পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলি পার্থিব জ্ঞানের সহায়ক ও দ্বারস্বরূপ। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করা যায় প্রাণায়াম-প্রক্রিয়ায় ও জ্ঞানবিচারে। কামাদি-বিষয়ে আসক্ত হয়েই মানুষ সংসারের ভোগ-সৌন্দর্যের জন্য পাগল হয়। এই পাগ্‌লামী অনিষ্টকর। আত্মদর্শনের পথে এরা বাধা সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষ এই রহস্য জানে, তবুও সংসারের আকর্ষণে সে অনিচ্ছা-সত্ত্বে কামাদি-বিষয়ে আসক্ত হয়। তাই বিবেক অর্থে কোন্‌টি সৎ ও কোন্‌টি অসৎ,—কোন্‌টি কল্যাণকর ও কোন্‌টি অকল্যাণকর এই ভেদজ্ঞান বিচারের কর্ম ও অবস্থা। শ্রীরামপ্রসাদ তাই বলেছেন: 'বিবেক-হল্‌দি গায় মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে'। বিবেক, বিচার ও সত্যজ্ঞানের পথ উন্মুক্ত ও জীবনের যথার্থ লক্ষ্য কী তার দিক্‌দর্শন করে। অধ্যাত্মজীবনে মুক্তির পথে তাই বিবেক-বিচার একান্ত প্রয়োজন, কেননা বিচারবিহীন মানুষ জীবনে উদ্দেশ্যহীন অন্ধ হয়। অন্ধ যথার্থ-পথের সন্ধান পায় না, তাই সে অযথার্থ ও অজ্ঞানের পথে ছুটে যায় ও জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও সংসারের বন্ধনযাতনা ভোগ করে। সেজন্য শ্রীরামপ্রসাদ সাধনসমুদ্রে সকল সাধককে ঝাঁপ দিতে বলেছেন। ম্যাদাটে-বুদ্ধি নয়, হচ্ছে-হব ভাব নয়, কুড়েমী নয়, এদের পরিবর্তে একান্ত যত্ন, আগ্রহ ও অধ্যবসায়রূপ সাধনের প্রয়োজন। যত্নই অভ্যাস সৃষ্টি করে,—'তত্র যত্নোঽভ্যাসঃ'। অভ্যাস, বিবেক ও বৈরাগ্য থাকলে কামক্রোধাদি রিপু বা শত্রু সংযত ও বশীভূত হয়, আর তখনই অধ্যাত্মসাধনা তন্ত্রতত্ত্ব সাধনা সফল হয়। মুক্তির একান্ত আকাঙ্ক্ষা ও আকুলতা থাক্‌লে তবেই মানুষ অবিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ কুণ্ডলিনীযোগ ও সামরস্যানুভূতি ॥

শাক্তদর্শন, শৈবদর্শন ও যোগদর্শন সাধারণতঃ ভিন্ন-ভিন্ন শাস্ত্ররূপে মনে হলেও ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে এদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্যসূত্রের বন্ধন দেখা যায়। যেমন, অদ্বৈতবেদান্ত ও পাতঞ্জলযোগদর্শন ভিন্ন-ভিন্ন দর্শনগ্রন্থরূপে প্রতীয়মান হলেও অদ্বৈতবেদান্তীরা চরমানুভূতির ক্ষেত্রে পাতঞ্জলযোগসাধনার সহযোগীতাকে স্বীকার করেন—গীতার গূঢ়ার্থদীপিকা'-ভাষ্যে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী এ'কথা বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। তাছাড়া তন্ত্রোক্ত কুলকুণ্ডলিনীযোগ-সাধনার ক্ষেত্রে পতঞ্জলীর পরবর্তী যোগ ও তন্ত্রসাহিত্যে ষট্‌চক্রসাধনার ধারা বা সাধনক্রমকে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। শিবসংহিতা, যোগতারাবলী এবং শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি প্রভৃতি যোগশাস্ত্রে ও তন্ত্রশাস্ত্রে যোগক্রিয়া ও তন্ত্রসাধনার পারস্পরিক মিলনের ও সহযোগীতার কথার সত্যতা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়।

শাক্তদর্শন ও শৈবদর্শন শক্তি ও শিবকে কেন্দ্র ক'রে তাদের দর্শনচিন্তা ও বিচারশৈলী সৃষ্টি করেছে। শাক্ত ও শৈব এই উভয় দর্শনচিন্তাকেই তাই আগম বলা যেতে পারে। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের অভিমত হোল : **"The Āgamas have their own theory as to the manner, in which supreme knowledge descends on earth-consciousness."** 'তন্ত্রালোক'-গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় জয়রথ বলেছেন, আগমতত্ত্বগুলি প্রকৃতপক্ষে পরাবাক্ (পরমানন্দ) থেকেই প্রকাশ পেয়েছে,—যদিও 'পশ্যন্তীবাক্ ও মধ্যমাবাকের প্রকাশ হয়েছে বৈখরীবাক্ পর্যন্ত। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে, এই সৃষ্টি অবরোহণক্রমে (order of descent) সার্থক হয়। পণ্ডিত ভাস্কররায় 'সেতুবন্ধ'-গ্রন্থে বিশেষভাবে এই সম্বন্ধে পরিচয় দিয়েছেন, আর দিয়েছে 'কামকলাবিলাস', 'যোগিনীহৃদয়দীপিকা' প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ পুনরায় বলেছেন : "শিবের দুইটি শক্তি",—একটি সমবায়িণীশক্তি ও অপরটি পরিগ্রহশক্তি। সমবায়িণীশক্তি চিদ্‌রূপা, অপরিণামিনী, নির্বিকার ও স্বাভাবিক। ইহারই নাম শক্তিতত্ত্ব। এই শক্তি শিবে নিত্য সমবেত থাকে। উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা তাদাত্ম্য নামে বর্ণিত হয়।

কিন্তু পরিগ্রহশক্তি অচেতন ও পরিবর্তনশীল। ইহারই নামান্তব বিন্দু। বিন্দুর শুদ্ধ ও অশুদ্ধ দুইটি রূপ আছে। সাধারণত শুদ্ধ-রূপটিকেই বিন্দু বা মহামায়া বলা হয়। অশুদ্ধ-রূপটির নাম মায়া। উভয়েই নিত্য। অশুদ্ধ-রূপটির উপাদান-কারণ মায়া, শুদ্ধরূপের উপাদান-কারণ মহামায়া—ইহাই বিশেষ। * * মহামায়ার সূক্ষ্ম বা দ্বিতীয় অবস্থার নাম মায়া * * কালাদি তত্ত্বসমূহের অবিভক্ত স্বরূপকেই মায়া বলে।" অদ্বৈতবেদান্তে মায়া বন্ধনের কারণ, তন্ত্রে মায়া বা মহামায়া মুক্তির কারণ এবং মায়া মহামায়ার অধীনে।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ শক্তিতান্ত্রিক-সংস্কৃতিকে তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করেছেন: (১) প্রাচীনকাল বৌদ্ধপূর্ব বলতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ। (২) মধ্যযুগ বা বৌদ্ধপূর্ব-খ্রীষ্টীয় ১২০০ শতক পর্যন্ত। (৩) বর্তমান কাল বলতে খ্রীষ্টীয় ১৩০০ শতক থেকে আজ-পর্যন্ত। আগমশাস্ত্র-গুলির মধ্যে অদ্বৈততত্ত্বের প্রকাশ বিশেষভাবে পাওয়া যায় এবং শৈব ও শাক্ততন্ত্র নামে তারা সাধারণত পরিচিত। প্রতিটি আগম চারটি পদে বিভক্ত। শক্তিতত্ত্বের ও সংস্কৃতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীবিদ্যা দক্ষিণদেশীয় তন্ত্রের অন্তর্গত। শ্রীবিদ্যা, ললিতা, ত্রিপুরসুন্দরী ও ষোড়শী একই দেবী। তাছাড়া আছে কালীকুল ও শ্রীকুলের কথা, যে'সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করেছি। কালীকুলের সাহিত্য অধিক না হলেও শক্তিসেবীদের মধ্যে তা বিশেষভাবে পরিচিত। তবে কালী ও শ্রী এই উভয় কুলের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়ভাবে পাওয়া যায়। ঐ দু'টি কুল বা সম্প্রদায় বিশেষভাবে অগস্ত্য পরশুরাম, দুর্বাসা, দত্তাত্রেয়, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

শারদাতিলকতন্ত্র শক্তিতত্ত্ববিকাশের পরিচয় দিয়ে বলেছে: (১) পরমেশ্বর, —যিনি সকল সচ্চিদানন্দবিভব (২) শক্তি, (৩) নাদ (পরা), (৪) বিন্দু (পরা), (৫) অপর-বিন্দু ও বীজ। (৬) নাদ প্রভৃতি শক্তিতত্ত্ব। প্রপঞ্চ-সারতন্ত্রের বক্তব্য পরানাদই শব্দব্রহ্ম। শক্তির নাম কুল এবং শিবের নাম অকুল। এই কুল ও অকুলের সমরসে মিলনই তন্ত্রের পরমতাৎপর্য।

॥ তন্ত্রে কুণ্ডলিনীশক্তি, তার চিন্তা, ধ্যান ও সাধনা ॥

তন্ত্রে বিভিন্ন জ্ঞানস্তরের বর্ণনা আছে। ঐ জ্ঞানস্তরগুলিসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ষট্‌চক্রনিরূপণ, শিবসংহিতা, শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে বিভিন্ন চক্রের ও চক্রসাধনার কথার উল্লেখ আছে। কুণ্ডলিনীর সাধনক্রম ও ধ্যানমন্ত্র বিভিন্ন তন্ত্রে ও যোগগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়।

॥ কুণ্ডলিনীর ধ্যান ॥

কুণ্ডলিনীর ধ্যান মাতৃকাভেদতন্ত্রে এ'রূপ : 'ওঁ প্রসুপ্তভুজগাকারাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গ-মাশ্রিতাম্। বিদ্যুৎ-কোটীপ্রভাং দেবিং বিচিত্রবসনান্বিতাম্ ॥ শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসাং সর্বদা কারণপ্রিয়াম্'। এই কুণ্ডলিনী-কালীর[১] চিন্তা ও কল্পনা বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে বিভিন্ন ভাবে করা হয়েছে। যেমন—(১) কামকলা-কুণ্ডলিনীশক্তি মূলাধারচক্রে প্রসুপ্তা ও পরে জাগ্রতা ও পরমশিবের সঙ্গে সামরস্যরূপ অমৃতে আপ্লুতা ; (২) কুণ্ডলিনী স্বয়ম্ভূ-শিবসংশ্লিষ্টা বা বেষ্টিতা। তিনি শ্যামারূপে বা কালীরূপে কল্পিতা। সৃষ্টিরূপা অথবা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াত্মিকা, আবার বিশ্বাতীতা ও জ্ঞানরূপা, পুনরায় জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ারূপা, (৩) কুণ্ডলিনী স্ফুরদ্বালার্কবর্ণা সত্ত্বরজস্তমোগুণান্বিতা, তড়িন্নিভা, মৃণালতন্তুকল্পা প্রসুপ্তভুজগাকারা সার্ধত্রিবলয়ের দ্বারা বেষ্টিতা প্রভৃতি (এ'সম্বন্ধে 'বিজ্ঞানভৈরব',—কাশ্মীরতন্ত্র গ্রন্থও দ্রঃ)

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের 'কুণ্ডলিনী'-সম্বন্ধে বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : "কুণ্ডলিনীর অপর নাম আধারশক্তি (Basic Energy),—যে আধার শক্তি যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় দিয়া সকল পদার্থের মূলসত্তারূপে বর্তমান রহিয়াছে। ..কুণ্ডলিনী যখন চৈতন্যময়ী হইয়া যায়, তখন জগতের সকল বস্তুই চৈতন্যময় রূপ ধারণ করে। সুতরাং যাহাকে কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলা হয় তাহা 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই শ্রুতিনির্দিষ্ট সর্বত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মময়তা-অনুভবের সাধনা, একই বস্তু।..."

॥ কুণ্ডলিনীই আধারশক্তি ॥

কুণ্ডলিনীশক্তিই মূল ও আধারশক্তি তথা **basic or foundational Energy**, —যে **Energy** থেকে শরীরের সকল ইন্দ্রিয় শক্তি সঞ্চয় বা আহরণ করে। সকল প্রাণীর ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সমস্ত ব্যবহার-আচরণ, মানসিক ও শারীরিক চেষ্টা প্রভৃতি আধারশক্তি-কুল-কুণ্ডলিনীরূপ শক্তিকেন্দ্র থেকেই পরিচালিত হয়। পাশ্চাত্যে ডাক্তার ফ্রয়েডও অন্যভাবে বলেছেন : **'All behaviour is motivated by an inner and unconscious principle, sexuality or *libido*'.** অধ্যাপক ম্যাকডুগাল বলেছেন : **'Freud's characterisation of driving force of all behaviour is, however, *libido* or sex-urge'** । অথবা অধ্যাপক ফ্রয়েডের

১। কুণ্ডলিনী বা কুলকুণ্ডলিনীরূপ মহাশক্তিই 'কালী'-রূপে জগতে অভিব্যক্ত।

অভিমতে, the *libido* or sex-urge is the ultımate driving factor of mental life'. তাছাড়া ফ্রয়েডের মতে আছে Ego-ideal or Super-Ego এবং এই Super-Ego-আসলে মানুষের প্রধান ও আন্তর-প্রকৃতি,—The Super-Ego, in a word, acc›unts for the higher nature in man. ডক্টর ফ্রয়েড বলেন যে, Super-Ego-ই আসলেEdipus-complex-এর উত্তরাধিকারী। সুতরাং ফ্রয়েডের মতে 'Ego is essentıally the representative of the external world or reality, whereas the Super-Ego, in contrast to it, is representative of the ıntenral world,—the Id'. কিন্তু জানি না, ডাক্তার ফ্রয়েড কেনই বা স্বীকার করেন যে, 'the extension of the sex-urge in every sphere of mind stands unrefuted.' ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রে কুণ্ডলিনীশক্তিকে 'কামকলা' বলা হয়েছে,—যে 'কামকলা' সকল প্রাণীর শারীরিক ও মানসিক সকল রকম শক্তিরই আধার ও প্রেরণাকেন্দ্র বা প্রাণকেন্দ্র। ডাঃ ফ্রয়েডের শিষ্য অধ্যাপক ইয়ুঙ্ (Prof. Jung) ঐ sex-urge-কে বলেছেন 'Divine Energy',—ভারতীয় দৃষ্টিতে যিনি মহাশক্তিরূপিণী। কুণ্ডলিনী অবজ্ঞেয়া (neglected) শক্তি নন, কুণ্ডলিনী পূজ্যা ও শ্রদ্ধেয়া মহাশক্তি।

''মূলবস্তুটি পরমসাম্যাবস্থারূপা। উপনিষৎ ইহার স্বরূপনির্দেশপ্রসঙ্গে 'পরমং সাম্যম্' এই পদই প্রয়োগ করিয়াছে। ইহাতে নামরূপ কল্পনা চলে না, ইহার চিন্তা নাই, বর্ণনা নাই, -'অবাঙ্‌মনসোগাচরম্'।...ইহা বিশ্বাত্মক (immanent) হইয়াও বিশ্বাতীত (transcendent)। ইহাই উপনিষদের পূর্ণ (the Absolute)।

'তটস্থ বিন্দু হইতে যে পূর্ণ মণ্ডলের বিকাশ হয়, তাহার নাম আজ্ঞাচক্র। তাহার ঊর্ধ্বেই সহস্রারচক্র।[২] মূলাধার বা সর্বনিম্ন চক্রই ঘোর-অন্ধকারের কেন্দ্রস্থল। মূলাধার বিন্দু হইতে বহির্গত হইলেই জীবকণা বা সুষুম্নাবাহী জীবরশ্মি স্থূলপঞ্চীকৃত ভূতময়-আবরণে বেষ্টিত হইয়া পড়ে।...মহাপ্রলয়ের সময়ে এই পঞ্চীকৃত স্তর স্বভাবের নিয়মে অপঞ্চীকৃত হইয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয় এবং বিশুদ্ধাদি চক্রে বিলীন হইয়া যায়।...বিশুদ্ধাদি পঞ্চবিন্দু হইতে রশ্মি বিকীর্ণ হয়,—ইহাই পঞ্চতন্মাত্রাচক্র।...পঞ্চীকরণকালে পঞ্চতন্মাত্রার মিশ্রণের তারতম্যনিবন্ধন অনন্ত-

২। আজ্ঞাচক্র ও সহস্রারচক্রের মধ্যে বজ্রা, চিত্রিণী, নিরালম্বপুরী প্রভৃতি আরও কয়েকটি সূক্ষ্ম চক্র কল্পিত হয়।

অসংখ্য স্থূলকণা অণু (বীজ) উৎপন্ন হয়। যে শক্তিপ্রবাহ প্রথমত জ্যোতিরূপে ও পরে নাদরূপে প্রকটিত হইয়াছিল তাহাই স্থূলস্তরে আসিয়া প্রাণরূপে প্রকাশিত হয়। পঞ্চ-পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদিবায়ু, প্রভৃতি এই প্রাণশক্তিরই বিকাশ।

"কুণ্ডলিনী চৈতন্যের সঙ্গে-সঙ্গে ইড়া-পিঙ্গলায় প্রবাহমান স্রোত সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া সুষুম্নাপথে প্রবেশ করে এবং সুষুম্নাপথে ও উর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে ক্রমশ আরও অধিকতর সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে জীবশক্তি বজ্রা ও চিত্রিণী-নাড়ী ভেদ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মনাড়ী অথবা আনন্দময়কোষে[৩] গমন করে। ইহাই ঐশ্বর্য-অবস্থা। আনন্দময়কোষেও যখন আর লক্ষ্য থাকে না, তখনই গুণাতীত পরম-সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে"।—বলেছেন মমঃ গোপীনাথ কবিরাজ।

॥ কুণ্ডলিনীর জাগরণ ॥

কুণ্ডলিনীশক্তি বা কুলকুণ্ডলিনী ও তার জাগরণ সম্বন্ধে তত্ত্বকথার এ'ভাবে পরিচয় দিয়েছেন বিদগ্ধ তন্ত্রতত্ত্ববিৎ সাধকগণ। কুণ্ডলিনী ও তার পরমতত্ত্বের সকল রহস্যই অবগত ছিলেন চৌষট্টিতন্ত্রের সাধনাভিজ্ঞা যোগেশ্বরী ভৈরবী-ব্রাহ্মণী!

৩। আনন্দময়কোষের স্থান আজ্ঞাচক্র। এই প্রসঙ্গে 'আনন্দময়-অভ্যাসাৎ...' প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রের উপর আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দ্রষ্টব্য। শঙ্করের ভাষ্যের সঙ্গে রামানুজ-নিম্বার্কাদি ভাষ্যকারদের মধ্যে সিদ্ধান্তের পার্থক্য আছে অর্থে রামানুজ আনন্দময় কোষকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎ-রূপ ব্রহ্মসাযুজ্যের স্থান বলেছেন, কিন্তু শঙ্কর আজ্ঞাচক্রস্থিত আনন্দময়কোষকে উন্নতক্ষেত্র বলেছেন। ব্রহ্মজ্ঞানেরই চরমক্ষেত্র বলেন নি।

শ্রদ্ধেয় জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর *Kashmir Saivism*-গ্রন্থে (শ্রীনগর, ১৯২৩, পৃ: ৫৪—৫৫) বিবর্তবাদ ও আভাসবাদ—এ'দুটির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে সুষ্ঠ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আভাসবাদ আভাস-পরমার্থবাদ ও স্বাতন্ত্র্যবাদ নামেও পরিচিত। 'স্পন্দসন্দোহ'-গ্রন্থে এর বিশেষ-পরিচয় দেওয়া আছে। তিনি বলেছেন: "With only this difference between them, the two processes of Abhasa and Vivarta may be said to be practically the same. They are really one and the same process in so far as they are a process only—without reference to the ultimate nature of what that process brings about i.e. of the 'appearances' constituting the universe (আভাসবাদ-সম্পর্কে *Kashmir Saivism*, পৃ: ৫৫—৫৬ দ্রষ্টব্য)। অধ্যাপক কে. সি. পাণ্ডেও তাঁর Abhinavagupta-গ্রন্থে আভাসবাদ প্রভৃতির আলোচনা করেছেন।

ভৈরবী-ব্রাহ্মণীর সহায়তায় কুণ্ডলিনীতত্ত্বের দুরূহ রহস্য জানা সম্ভব হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষেও। "জ্ঞানী আপনি খায় না, কুণ্ডলিনীতে আহুতি দেয়"—এই রহস্যময় ইঙ্গিত শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনায় অসাধারণ অভিজ্ঞতার ও সিদ্ধান্তের মর্মকথাই প্রকাশ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ উক্তির ('কুণ্ডলিনীতে আহুতি দেয়') তত্ত্বনিষ্ঠ কথার পরিচয় দিয়ে বলা যায় যে, কুণ্ডলিনীমুখে সকল-কিছু আহুতি দেওয়ার তন্ত্রনির্দিষ্ট বিধান বা তত্ত্বগত পদ্ধতি হ'ল : প্রথম পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্-পাণি-পদ-পায়ু-উপস্থ), পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু (প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান) এবং মন, বুদ্ধি (এর সঙ্গে চিত্ত ও অহংকার)—এই সতেরোটি (বা চিত্ত ও অহংকারকে নিয়ে ১৯ টি) অবয়ব বা উপাদান। এ' সকল অতিসূক্ষ্ম উপাদানের আধার অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম-শরীরে অধিষ্ঠিত জীবাত্মাকে যোগসাধনায় নিবাত-নিষ্কম্প-দীপকলিকার মতো চিন্তা ক'রে হৃদয় থেকে সুষুম্নাপথে আকর্ষণ করতে ও মূলচক্র-মূলাধারে মহাশক্তিময়ী কুলকুণ্ডলিনীতে লীন করা অর্থে আহুতি দিতে হয়। এই আহুতি শুধুই মূলাধারে নয়, মূলাধারের মতো স্বাধিষ্ঠানে, মণিপুরে, অনাহতে, বিশুদ্ধে, আজ্ঞায় এবং পরিশেষে মস্তকে সহস্রারপদ্মে পরমশিবে আহুতি দিতে হয়। এই আহুতি দেওয়ার অপর নাম উদ্দীপনা, জাগৃতি বা প্রদীপ্তি। প্রদীপ্তির অর্থ সুপ্তশক্তি-কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা। এক-একটি পদ্ম বা চক্র প্রদীপ্ত বা জাগ্রত হ'লে তার নিম্নমুখ (অধোমুখ) ঊর্ধ্বমুখ হয়। আজ্ঞাচক্র ভেদ ক'রে যখন সহস্রারচক্রের দিকে মহাশক্তি-কুণ্ডলিনীর গতি হয়, তখনই অন্তঃকরণবৃত্তিযুক্ত মনের বা চিত্তের লয় (বৃত্তিনাশ) হয় এবং কুণ্ডলিনী সহস্রারবাসী পরমজ্যোতিষ্মান মহাশিব বা পরমশিবের সঙ্গে একসত্তা অর্থে সমরস-সম্পন্ন হয়। এরই নাম সমাধি বা মুক্তি যোগসাধনায় ও তন্ত্রসাধনায়।

বেদান্তে জীব নিজের ব্রহ্মসত্তায় সমাসীন হ'লে,—অর্থাৎ জীব যখন সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করে যে, সে জীবসত্তা নয়, কিন্তু ব্রহ্মসত্তা,—'ব্রহ্মৈব নাপরঃ', তখনই তার জীবব্রহ্মে ভেদরূপ অজ্ঞান বা অবিদ্যা অপসারিত হয় (নাশ হয়), কিংবা অজ্ঞান জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। অজ্ঞানই ভ্রম বা ভুলজ্ঞান। এই ভ্রম বা ভুলজ্ঞান বিনষ্ট (অপসারিত) হয় অভ্রান্তস্বরূপ সত্যজ্ঞানের প্রকাশ হ'লে। সুতরাং 'কুণ্ডলিনীতে আহুতি দেয়' বলতে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় + পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় + পঞ্চপ্রাণ + মন ও বুদ্ধি—এই সতেরোটি অবয়বযুক্ত জীবকে (জীবাত্মাকে) পরমাত্মারূপী পরমশিবে (ব্রহ্মে) সমর্পণ বা আহুতি দেন সাধক। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ২৫-২৯ শ্লোকগুলিতে 'জুহ্বতি' বা 'আহুতি দেওয়া'-র কথা আছে,—'যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি' (৪।২৫), 'সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি' ও

'ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি (৪।২৬), 'জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে' (৪।২৭), 'প্রাণেষু জুহ্বতি' (৪।২৯)। 'অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে' (৪।২৯),—অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুকে যেমন আহুতি (জুহ্বতি) দেওয়া হয়, তেমনি জীবকে শিবে (জীবত্বকে শিবত্বে ব ব্রহ্মত্বে) তথা ব্রহ্মস্বরূপতায় আহুতি দেওয়া হয়। এই আহুতি দেওয়ার অর্থই সমরসসম্পন্ন করা, অথবা বিরূপ থেকে স্বরূপে, বা ভেদ থেকে অভেদ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করা। বাঙলার শাক্তসাধক রামপ্রসাদ কুণ্ডলিনীতে এই আহুতি দেওয়ার প্রসঙ্গে বলেছেন—

মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় যে আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মহামন্ত্র, দিবানিশি জপ করে॥
শয়নে প্রণামজ্ঞান, নিদ্রায় করো মাকে ধ্যান,
আহার করো মনে করো, আহুতি দেই শ্যামা-মারে॥

ঐ শ্যামা-মা কালীই কুল বা কুণ্ডলিনী,—যিনি সর্প, ভেক, পিপীলিকা প্রভৃতি গতিতে চক্র থেকে চক্রান্তরে উঠে বিভিন্ন জ্ঞানের অনুভূতি দেন সাধককে।

॥ শক্তিসাধনা ও শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ॥

সাধক পূর্ণানন্দনাথের 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি' বঙ্গদেশীয় তন্ত্রমালার অন্তর্গত হলেও ষোড়শীপূজাপ্রসঙ্গে একোনবিংশ অধ্যায়ে (পৃঃ ৭৩৯-৭৫২) ত্রিপুরার্ণবে কথিত ত্রিপুরসুন্দরী বা মহাত্রিপুরসুন্দরীর স্তোত্র ও কবচের বর্ণনা করা হয়েছে: 'অথ স্তোত্রং প্রবক্ষ্যামি ত্রিপুরার্ণব ঈরিতম্'। ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়ে ত্রিপুরাবিদ্যার স্বরূপবর্ণনায় পূর্ণানন্দনাথ বলেছেন—

'বিদ্যুদাক্ষীং পরাং নিত্যাং কালিকাং কালভাষিণাম্।
খড়্গমুণ্ডবিকটাস্যাং ব্যাঘ্রচর্মবিভূষিতাম্॥
রক্তমাল্যাম্বরধরাং ঘোররূপাং চতুর্ভুজাম্।
খড়্গশূলকপালঞ্চ বরদাং তীক্ষ্ণনাসিকাম্।
সিদ্ধ্যর্থং জীবয়েদ্দেবীং সর্ববিদ্যাসুজীবিনা॥'—প্রভৃতি।

পরশুরামকল্পসূত্রে বিভিন্ন ক্রম (পূজাক্রম) যেমন—শ্রীক্রম, ললিতাক্রম, শ্যামাক্রম, বারাহীক্রম, পরাক্রম, সর্বসাধারণক্রম প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কথা এই যে, শ্রীবিদ্যা, কামেশ্বরী, ললিতা বা ত্রিপুরসুন্দরী প্রভৃতি একই অভিন্না দেবী। বঙ্গদেশীয় তন্ত্রে বর্ণিত কালী, তারাদি দশমহাবিদ্যার সঙ্গে এর ঠিক সাদৃশ্য নাই।

শ্রদ্ধেয় জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর *Kāsmir Saivism*-গ্রন্থে (শ্রীনগর,

১৯২৪ পৃঃ ৫৪-৫৫ বিবর্তবাদ ও আভাসবাদ— এ'দুটি মতবাদের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন আভাসবাদ আভাস-পরমার্থবাদ ও স্বাতন্ত্র্যবাদ নামেও পরিচিত। 'স্পন্দসন্দোহ'-গ্রন্থে এর বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন : **'With only this difference between them the two processes of Ābhāsa and Vivarta may be said to be practicall*y* the same. They are really one and the same process in so far as they are a process only,— without reference to the ultimate nature of what that process brings about, i.e. of the 'appearances' constituting the universe"** আভাসবাদ-সম্পর্কে ***Kashmir Saivism,*** (পৃ: ৫৫—৫৬ দ্রষ্টব্য)। অধ্যাপক কে সি পাণ্ডেও তাঁর **Abhinavagupta**--গ্রন্থে আভাসবাদ প্রভৃতির আলোচনা করেছেন।

কাশ্মীরীয়-প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে স্বাতন্ত্র্যবাদই স্বীকৃত। এ'সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় বুদ্রাপ্পা ও জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উভয়েই তাঁদের *Kāshmir Śaivism*-গ্রন্থে বলেছেন : **"*Śvātantravāda* is the chief doctrine of the *pratyabhijñā* system. It means the doctrine of self-dependence or the sovereignty of Lord's will which is responsible for all manifestations. It holds that the ultimate reality, by its inherent *vimarśaśakti,* manifests all from itself, in itself and by itself. *Vimarśa* is spoken of as *svātantrya*** (স্বাতন্ত্র্য), **because its existence** (সত্তা) **does not depend upon anything else for its manifestation in any form and represents the principal power of the Lord Maheśvara"** ।

শিবসূত্রমতে স্বাতন্ত্র্যশক্তি চৈতন্যরূপিণী, কেননা এর মধ্যে একত্রীকরণ ও পৃথকীকরণ দু'রকম শক্তিই নিহিত। এই শক্তির অন্য নাম স্ফুরিত বা স্পন্দ। স্বাতন্ত্র্যশক্তিকে মহাশক্তি এবং পরাবাক্‌ও বলে।

'পরাশক্তি' ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াময়ী। পরাশক্তি পরমশিবেরই শক্তি ও বিকাশ। পরাশক্তিকে কামকলা বা কুণ্ডলিনীও বলে, কেননা কুণ্ডলিনীশক্তিও জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াময়ী। শক্তির বহির্মুখী বিচ্ছুরণ বা বিকাশ হলেই বিশ্ব সৃষ্টিহয়, আর কেন্দ্রমুখী বা অন্তরমুখী হ'লে ক্ষোভহীন সামঞ্জস্য (equilibrium)-রূপ হয়।

পরাশক্তি শিব-শক্তির সমন্বিত (দ্বন্দ্ব বা যুগল)-রূপ বলা যায়। শিব-শক্তির সম্মিলিত-রূপই ঈশ্বরের বিশুদ্ধ ও অনন্ত পরমজ্ঞান। এই সম্মিলিত শক্তি স্বচ্ছন্দরূপিণী। এই শিব-শক্তির যুগ্ম বা মিলিত রূপ থেকেই বিন্দু ও নাদের সৃষ্টি। নাদ থেকে মন্ত্রের বিকাশ হয় এবং মন্ত্র রূপায়িত হয় কুণ্ডলিনীশক্তির সাধনা ও অনুশীলন থেকে। কুণ্ডলিনীশক্তির সাধনায় ও অনুশীলনে ঐ শক্তি জাগ্রত হয়।

পরাশক্তি সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদে দু'রকম। স্থূলরূপে চেতন ও অচেতনাত্মক, বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি হয় এবং সূক্ষ্মরূপ জ্ঞানময় শিবস্বরূপ,—"সূক্ষ্মা চিন্মাত্ররূপিণী" পরা নিত্যোদীতা শান্তা ব্রহ্মসত্তাস্বরূপিণী'। অনন্ত শক্তিসম্পন্না পরাশক্তিও নাদরূপা শক্তি। এই নাদ থেকেই ব্যক্ত ও অব্যক্ত সকল অক্ষর বা বর্ণ বাক্য, পদ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। স্বর ও ব্যঞ্জন-ভেদে বর্ণ দু'রকম। তাছাড়া আছে অনুঃস্বর। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের অ' থেকে 'হ'-পর্যন্ত এবং অনুঃস্বরযুক্ত বর্ণসমষ্টিকে বলে 'অহম্'। 'অহম্-এর অপর নাম 'অনুত্তর-শিব'। অনুত্তর-শিব এবং প্রণবের চন্দ্রকলা বা কামকলাশিবে বিন্দু ও সর্বোত্তীর্ণ ব্রহ্ম এককথা। 'অ' থেকে 'ক্ষ' (অকার—হকার) বর্ণমালা বা নাদ পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী এই চারটি রূপে প্রকাশ পায়। এদের মধ্যে 'পরা' থেকে 'মধ্যমা' আন্তর বা গুহাবাসী এবং 'বৈখরী' স্থূল ও বহিঃপ্রকাশযুক্ত।

পূর্বে অনাহত-নাদ ও আহত-নাদ-পর্যায়ে আলোচনা করেছি। 'অ' প্রভৃতি স্বরবর্ণ শিবস্বরূপ এবং 'ক' থেকে 'ম' এবং 'হ' শক্তিস্বরূপা। এই শিব-শক্তির বা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে হয় বিশ্ববৈচিত্র্যের সৃষ্টি। শব্দ ও বাক্যের সার্থকতাও সম্পন্ন হয় স্বর ও ব্যঞ্জন-বর্ণদুটির সম্মিলিত রূপে। 'স্পন্দকারিকা' ও 'বিমর্শিনী'-র অভিমতে, পরাবাকই পরম্ ও চরম-বিকাশ। এই বিকাশকে বলে 'প্রকাশ-বিমর্শময়ী'। প্রকাশকে বলা হয় 'বাচ্য' এবং বিমর্শ 'বাচক'। সুতরাং সমগ্র বিশ্ববৈচিত্র্য বাচ্য-বাচক বা বাস্তব-বস্তু ও বাহ্যআন্তর-চিন্তা-সমষ্টির পরিণতি। বাচ্য-বাচক প্রকাশ-বিমর্শ এককথা।

অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টি এ'থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কেননা অদ্বৈতবেদান্তমতে ব্রহ্ম ও শক্তি -ব্রহ্ম ও মায়া এক নয়, মায়া মিথ্যাজ্ঞান বা মিথ্যাপ্রতীতি এবং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞান বা সত্যপ্রতীতি। বেদান্তে একই ব্রহ্মের দুই রূপ,—সত্য ও মিথ্যা [৪]

৪। ব্রহ্ম ও শক্তি কিংবা ব্রহ্ম ও মায়া আপাতত ও দৃষ্টত পৃথক সত্য-মিথ্যা-দৃষ্টি দুটি কোণ থেকে, কিন্তু ব্রহ্মকেই আমরা মায়া (মিথ্যাপ্রতীতি) বলি ভ্রমে, তাই ভ্রম চলে গিয়ে সত্যপ্রতীতির প্রকাশ হলেই ব্রহ্ম ও শক্তি এক ও অভিন্ন বলে জ্ঞান হয়।

মিথ্যা প্রতিভাস বা প্রতিবিম্ব, সুতরাং বিম্বই সত্য। অদ্বৈতবেদান্তে সত্য ও সত্তা এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু কাশ্মীর-শৈবদর্শনে বিম্ব সত্য এবং প্রতিবিম্বও সত্য। শিব ও বিমর্শ—ব্রহ্ম ও শক্তি বা মায়া এক ও অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রহ্ম ও শক্তিকে অভিন্ন বলেছেন কাশ্মীরীয়-শৈবদর্শনের বা বাঙালার তন্ত্রদৃষ্টিতে নয়, বলেছেন ব্রহ্ম যখন স্বরূপে থাকেন তখন তিনি অচঞ্চল ও কূটস্থ ব্রহ্ম, আর বিরূপ হ'লে শক্তি, —যেমন জল ও তার তরঙ্গ, অচল স্থির সাপ ও চলমান সাপ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি জলে বা সাপে, না-চলার ও চলার গতিতে নয়। সেজন্য তিনি উদাহরণ দিয়েছেন একটি টাকাবই এ'পীঠ এবং ও'পীঠ, বলেছেন, টাকা কিন্তু একটাই 'ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা'-গ্রন্থে আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন পরাবাক্ চিতিরূপা, আর বাচক সেই পরাবাকের স্থূল ও বাস্তব রূপ, অক্ষর, বর্ণ, বাক্য প্রভৃতি। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এক শক্তি কুণ্ডলিনী বা পরমশিবেরই[৫] চারটি প্রকাশ। কিন্তু কাশ্মীর-ত্রিকতন্ত্রে নাদের বা শব্দের এইচারটি প্রকাশকে শুদ্ধ ও অবিচ্ছুরিত (অস্পন্দিত) কুণ্ডলিনীরই প্রকাশ বা বিচ্ছুরণ বলা হয়েছে। বর্ণমালাসন্ধানে বলা হয়েছে: "ইচ্ছা সা পরৈব জ্ঞানশক্ত্যোন্মুখে পশ্যন্তী, ক্রিয়াশক্ত্যোন্মুখে মধ্যমা, স্থিতৌ বৈখরী"। মোটকথা ইচ্ছা-জ্ঞান ক্রিয়াময়ী কুণ্ডলিনী বা পরাশক্তি (শিব শক্তির সম্মিলিত রূপ) থেকেই পরাদি পাদ স্বর ও শব্দের সৃষ্টি হয়। এই পরা, পশ্যান্তি, মধ্যমা ও বৈখরী চারটি নাদের বিকাশ বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় রুদ্রাপ্পা তাঁর *Kāshmir Saivism* (Mysore, 1916) গ্রন্থে বলেছেন:

"The self-luminous Paramasiva, who potentially possesses the universe, is *Parā*,—the pure consciousness, whose thought and speech coeliac and are not yet distinguished speech, originated from *Parā*. The next stage is *paśyanti*. It is here that the faintest rise of diversity in the manifestation of speech visualises and division begins indeterminately (*ākoota*). The rise of distinction is regulated by the desire which is its cause. The next *madhyamā* stage is clear conciousness of distinction between idea and words, the division of the Experiencer and the Experienced is determined though non-distinct or explicit. Still there is no differences of substratum. *Vaikhari* is that form of speech we use in our daily

৫। 'এক পরমশিব' বলতে অবিচ্ছুরিত ও স্বরূপে কুণ্ডলিনীশক্তি। অবিচ্ছুরিত কুণ্ডলিনীশক্তি শিব বা পরমশিব, বিচ্ছুরিত হলেই পরা বা পরাশক্তি।

transactions. In it, the idea and the articulate symbols, which represent it, have separate substratum. Here we find differentiated particulars, the stage of empirical thought and speech".

॥ শক্তি ও শক্তিসাধনা ॥

তন্ত্রমতে সাধনার নাম শক্তিসাধনা। এই শক্তি বিচিত্ররূপধারিণী: কখনও কালী,—দক্ষিণা ও বামা কখনও দশমহাবিদ্যা, কখনও ললিতা কামেশ্বরী, ত্রিপুরসুন্দরী,আবার কখনও বিদ্যা —সকল অবিদ্যার প্রকাশকর্শক্তি, আবার অবিদ্যা-নিবারিকী৬ শক্তি। সাধারণভাবে এ'রূপেই কল্পিত—মূলাধারকমলে নিদ্রিতা কারণরূপিনী কুলকুণ্ডলিনী, আবার সমরসস্বরূপ সহস্রারকমলে পরমশিব বা শিব-ভট্টারক। 'কুল অর্থে কালী—মহামায়া। আপন আবরণশক্তিদ্বারা বিশ্বচরাচরের সকল-পদার্থকে আবৃত ক'রে রেখেছেন প্রকাশরূপ পঞ্চজ্ঞানস্বরূপ শিবকে অড়াল ক'রে। এই আড়াল করা' আবৃত-রূপের নাম নিদ্রা। সে'জন্য আধারশক্তি নিদ্রিতা, কেননা তিনি প্রদীপ্তা নন সাধকের ইচ্ছার অভিঘাত না পেয়ে, মুক্তির আকুলভাবের অভাবে। শক্তির জাগরণেই হয় শক্তির উদ্বোধন। এই উদ্বোধন হয় প্রথমে আধারপদ্ম-মূলাধারে, তারপর সাধকচিত্তের কল্পনায় শক্তির ক্রমপ্রকাশ হয় স্বাধিষ্ঠানে, মণিপুরে অনাহতে বিশুদ্ধে ও আজ্ঞায়। আজ্ঞাচক্র দ্বিদলবিশিষ্ট পদ্ম—দুটি শাখাপ্রসারী শ্বেত-হংস। শ্বেত-হংস বিশুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশক। আজ্ঞাই বেদান্তে বর্ণিত আনন্দময়কোষ। এই চক্রেই গুরু ও ইষ্টের শুভ্রাসন, প্রতিষ্ঠিত। এখানে গুরু ও ইষ্ট এক ও অভেদ। এরপর ললনা, নিরালম্বপুরী-ক্ষেত্র বা চক্র। সকলের শেষসীমায় ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদলপদ্মবিশিষ্ট সহস্রার। সহাস্রার কোটিসূর্যালোকের মতো প্রখর প্রকাশশীল আবার কোটিচন্দ্রালোকের মতো সুশীতল।

শক্তি বা মহাশক্তি সগুণা আবার নির্গুণা। সগুণা—সত্ত্বঃ-রজঃ-তমঃ তিনগুণে প্রকাশে ('ক্ষোভ') ক্রিয়াশীলা—কালী। কালীর পদতলে দু'টি শিব—মহাকাল ও সদাশিব। মহাকাল সগুণ, সগুণা-কালীর প্রতিষ্ঠা এবং গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা-

---

৬। সাধক কমলাকান্ত অন্যভাবে শক্তির বিচিত্র বিকাশের কথা বলেছেন—

"কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি,
কখনও শূন্যরূপা রে।
মায়ের এ'ভাব ভাবিয়ে কমলাকান্ত
সহজে পাগল হলো রে।"

সহজে পাগল হয় জীবন্মুক্ত-পুরুষ।

স্বরূপিণী শক্তির পরমোত্তীর্ণ নিগু'ণ-শিব। মোটকথা কালী সগুণা। তিনি মহাকাল-শিবকে নিয়েই সগুণা, আবার নিগু'ণা।

॥ নাদানুসন্ধান ও চক্রসাধনা ॥

তন্ত্রে. এবং গোরক্ষনাথসম্প্রদায় ও অন্যান্য সাধনায় নাদানুসন্ধানের পরিচয় পাওয়া যায়। সে'জন্য মূলাধারাদি সকল চক্রসাধনা তন্ত্রে ও যোগদর্শনে অপরিহার্য। কিন্তু এই সাধনার ক্রম কি ধরনের সেই সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন সাধনতত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য।

চক্রসাধনার ক্রম বর্ণনা করতে গিয়ে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বলেছেন : "আজ্ঞাচক্রের উপরে যে জায়গা,—যেইখান হইতে সব-কিছু দেখা যায়…। সেইখানে প্রথম জ্যোতিঃ, তারপর মণ্ডলাকার, তারপর বিন্দু, তারপর জ্যোতি মিলাইয়া গিয়া একটি মূর্তি দেখা যাইবে। সেই মূর্তিকে আমরা 'গুরু' বলিতে পারি, মা বলিতে পারি।" গুরু শক্তিস্বরূপ, আবার শিবস্বরূপ। পুনরায় কবিরাজ মহাশয় বলেছেন : "জ্যোতির মধ্যে মণ্ডল ফুটে ওঠে, মণ্ডলের মধ্যে বিন্দু। এই বিন্দুই হচ্ছেন জ্যোতির্ময় পরমেশ্বর"। সুতরাং দেখা যায়, বিন্দুই মহামায়া, মহাপ্রকৃতি, পরমেশ্বরী কামকলা-কুণ্ডলিনী, আবার পরমেশ্বর। এই পরমেশ্বর সৃষ্টিময়ী অব্যাকৃতি, অব্যক্ত ও মহাপ্রকৃতির সঙ্গে থাকেন।

"বিন্দু অব্যক্ত অবস্থায় অস্পন্দ বা স্পন্দহীন, অর্থাৎ কম্পনহীন। বিন্দুর এই অব্যক্ত-অবস্থাকে আমরা পরাবাক্ বলি"। পরাবাকের পরের স্তর পশ্যন্তী। পশ্যন্তীর পর মধ্যমা। মধ্যমার পর বৈখরী। বৈখরীতে (এই আহত-নাদে) উপস্থিত হ'লে সৃষ্টি 'ইদং'-ভাবকে গ্রহণ করে, অর্থাৎ 'অহং' এবং 'ইদং' পরস্পরে পৃথক হয়।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয় পুনরায় এই সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেছেন : "চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়ার মিলিত বশীভূত রূপ হইতেছে বিন্দু। অনন্ত সৃষ্টির উপাদান ইহাতে (এই বিন্দুতে) নিহিত। অগ্নি ভোক্তা, সোম বা চন্দ্র ভোগ্য এবং এই দু'য়ের (অগ্নি ও সোমের) সম্মিলিত রূপে সাম্য হয় (সমতা বা **balance** আসে)। এই সাম্যের (সমতার) ফলে আবার বিন্দুর দিকে **return motion** হওয়া সম্ভব হয়। অখণ্ড প্রকাশে শিব ও শক্তির পার্থক্য কিছু থাকে না, শুধু থাকে প্রকাশ (প্রকাশ বলতে শিব বা ব্রহ্মকে বুঝায়)। পরের স্তরে শিব ও শক্তির যুগল-রূপ পাই।"

বিন্দুর স্বরূপ-সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে মমঃ কবিরাজ মহাশয় বলেছেন : তিনি

বলেছেন: "বিন্দু কালাতীত না হইলেও ত্রিকাল ইহাতে নিবদ্ধ (অর্থাৎ ত্রিকাল বীজাকারে বা অব্যক্ত-আকারে এই বিন্দুতে নিহিত)। বিন্দুকে তাই কালাতীত, আবার কালশায়ী বলা যায়। বিন্দু বিক্ষুব্ধ (স্পন্দিত) হয় সৃষ্টির urge-কে (ইচ্ছাকে) লইয়া। এই urge-কে অভিঘাত বলা যায়।"

"বিন্দুর[৭] তিন রূপ,—ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার অধিপতি অগ্নি সোম ও সূর্য। "অগ্নির স্পর্শে সোম (চন্দ্র) আসিলে সোম হইতে ক্ষরণ হয়। সেই ক্ষরণ হইতে অনন্ত প্রকারের সৃষ্টি হয়। তাহাকে আমরা 'তত্ত্ব' বলিতে পারি। তত্ত্বের অসংখ্য বিভাগ হইতে পারে,—২৪ হইতে ৩৬। তবে অদ্যাবধি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সমস্ত তত্ত্বগুলিকে classify (বিভাগ) করে। প্রথম কলার......সমষ্টি প্রকাশিত হয় 'অং' দ্বারা; 'ক' হইতে 'হ' ব্যঞ্জনবর্ণ। তত্ত্বের সমষ্টি প্রকাশিত হয় 'হং' দ্বারা। অং+হং-এর মিলন হয় 'অহং'। এর পরে আসে 'ইদং'।" 'অহং'-ই শিব বা অদ্বয়ব্রহ্ম এবং 'ইদং' শক্তি বা বিশ্বচরাচর।

বর্ণ বা মাতৃকাগুলি আসলে তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুভূতির বিষয়। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বলেছেন,—সৎ-চিৎ-ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া পাঁচটির কথা, কিন্তু এই পাঁচটি হইতে ২৪-তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। "তত্ত্ব হইতেছে ব্যঞ্জনবর্ণ। তত্ত্ব হইতে ভুবনের সৃষ্টি হয়। পরমা-কুণ্ডলিনী হইতেছে পরাশক্তি বা পরাসংবিৎ। এই শক্তিই একপ্রান্তে শক্তি-কুণ্ডলিনী-রূপে এবং অপর প্রান্তে প্রাণ-কুণ্ডলিনী-রূপে প্রকাশিত হয়।"

আসলে নাদ বা শব্দ প্রণবের ধ্বনি,—যা পরব্রহ্ম থেকে আসে। যোগীরা ঐ নাদ বা শব্দ শুনতে পান। বিষয়াসক্ত জীব শুনতে পায় না। যোগী জানতে পারেন যে, সেই ধ্বনি (অনাহত-নাদ) একদিকে নাভি থেকে ওঠে ও অপরদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে ওঠে।

পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা এ'তিনটি একই অবিচ্ছুরিত অখণ্ড-কুণ্ডলিনী-বিন্দুর[৮] ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। পূর্বেই বলেছি যে, কুণ্ডলিনী জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াময়ী। ঐ তিনটি ক্রিয়াশক্তিকে আমরা মহাশক্তিরূপিণী কালীতে আরোপ করি। লীলাতত্ত্বই কালী। লীলাময়ী কালী ক্রিয়াচঞ্চলা হলে ঐ তিনটি শক্তির বা গুণের বিকাশ (ক্ষোভ) হয়। পরমশুদ্ধা বিন্দুরূপা কুণ্ডলিনী-শক্তির প্রথম বিচ্ছুরণ বা প্রকাশ 'পরা'। 'পরা' বলতে শব্দের প্রথম ও পরম-প্রকাশ। এই 'পরা'-প্রকাশে সকল শক্তি ও

৭। বিন্দুর অর্থ এখানে মহামায়া, প্রকৃতি বা কুণ্ডলিনীশক্তি,—যাঁর জাগরণে চক্রে চক্রে উত্তরণ হয়ে নূতন নূতন সৃষ্টি হয় ও অনুভূতিতে তা বোঝা যায়। এটিও তন্ত্রদৃষ্টি।

৮। কুণ্ডলিনী তন্ত্রে বিমর্শ, আবার বিন্দু বা ব্রহ্ম বিচারদৃষ্টিতে।

গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে। এই শক্তিগুলি আরও সচঞ্চল হয় প্রকাশময়ী পশ্যন্তী-অবস্থায় (স্তরে)। পশ্যন্তীতে শব্দ অর্থ ও জ্ঞান অবিনাভাবে বা অভেদভাবে থাকে। অবিনা বা এককভাবে থাকলেও পরা অর্থ ও জ্ঞানের সত্তা পশ্যন্তীতে বোঝা যায়, এজন্য এই অবস্থাকে পশ্যন্তী বলে। পশ্যন্তীর অপর নাম তাই প্রকাশ। পশ্যন্তীর পর মধ্যমা। মধ্যমায় শব্দ ও অর্থের প্রকাশ অতিসূক্ষ্মাকারে হয়। মধ্যমাকে বলে সংযোগকারী 'সেতু',—পশ্যন্তী ও বৈখরীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে ব'লে। 'তান্ত্রিক বাঙ্ময়-শক্তিদৃষ্টি'-গ্রন্থে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় 'মধ্যমা'-নাদের পরিচয় প্রসঙ্গেবলেছেন : "মধ্যমা-ভূমি মন্ত্রময়ী কহী জাতী হৈ, ক্যাঁকো মন্ত্ররূপ মে হী মধ্যমাবাক্ অপনে কো প্রকট করতী হৈ। মন কা শোধন আউর উস্‌সে বিজ্ঞান কে দ্বার কো খোলনে কী সামর্থ্য কী প্রাপ্তি ক্রমশঃ ইসী স্থানমে হোতা হৈ। মনুষ্যকণ্ঠ সে বৈখরী-বাক্ উত্থিত হোতী হৈ উস্‌কে মূল মে মানসিক চিন্তন (চেতন ঔর অবচেতন দোনো ক্ষেত্রো মে) ঔর মনোগত ভাব জুটা রহতা হৈ......মধ্যমা-ক্ষেত্র-মে নাদময় চিদ্‌রশ্মিয়াঁ নিত্য বিরাজমান রহতী হৈ। যে-সব রশ্মিয়াঁ বৈখরী-ভূমি-মে দৃষ্টিগোচর নহী হোতী ।...মধ্যমা-শব্দ-কা অর্থ হৈ—জো-দো প্রান্তোঁ কে ছোড়োঁ-কেমধ্যবর্তী হৈ, বহ হৈ মধ্যমা। উস্‌কে এক ছোর পর দিব্য পশ্যন্তী-বাক্ হৈ, ঔর দূস্‌রে ছোর পর পাশব-বৈখরী-বাক্ হৈ,- দোনোঁ-কে মধ্যমা সংযোজক সেতু-স্বরূপ মধ্যমা-বাক্ ক্রিয়াশীল হৈ।'(—পৃঃ ২৮২-২৮৩)।

স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-মহাকারণ প্রভৃতি চারটি শব্দস্তরের সম্মিলিত রূপ অনাহত-নাদ। অনাহত-নাদ কুণ্ডলিনীশক্তির প্রথম প্রকাশ পরানাদ বা পরাশব্দের ফলশ্রুতি। এটিকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে গেলে নাদানুসন্ধান কি তা বোঝা দরকার।

॥ নাদানুসন্ধান ॥

তন্ত্রমতে শক্তিসাধনার মূলসূত্র নাদানুসন্ধান। যোগেও তাই। নাদানুসন্ধান বলতে ওঙ্কার বা ইষ্টনামরূপ সিদ্ধশব্দের ধ্যানসহ ক্রমিক উচ্চারণ। কিন্তু নাদ বা কারণ-শব্দের সৃষ্টি ও বিকাশ কিভাবে হয় সেই সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞান থাকা উচিত। বিন্দুর অপর নাম কামকলা। আবার বলে ব্রহ্ম। কামকলা বা কুণ্ডলিনী তখন অব্যক্ত ও সুপ্ত হলেও ব্রহ্মস্বরূপিণী। তন্ত্রে ব্রহ্ম ও বিন্দু একই জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া-রূপিণী কামকলা বা কুণ্ডলিনীশক্তি। বিক্ষুব্ধ বা স্পন্দিত হ'লে হয় নাদ বা কারণশব্দের (প্রণবের) সৃষ্টি ও বিকাশ। কিন্তু বিন্দুতে বিক্ষোভ বা স্পন্দন কিভাবে হয় ? পূর্ণ-পরমেশ্বরের স্বতন্ত্রশক্তির সাহায্যেই বিন্দু (কুণ্ডলিনী) বিক্ষুব্ধ বা স্পন্দিত হয়। "এই

বিস্ফূর্তি বা স্পন্দনকে গুরুকৃপা বা পরমেশ্বরের অনুগ্রহও বলা চলে”,—বলেছেন মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়।

॥ কুণ্ডলিনী ও চিদাকাশ ॥

বিন্দুরূপা মহাশক্তি-কুণ্ডলিনীকে চিদাকাশও বলে। মূলাধারশায়ী কুণ্ডলিনী যখন ইচ্ছার অভিঘাতে (urge-এ) ঊর্ধমুখী হ'য়ে জাগ্রত হয় ও স্বাধিষ্ঠানাদি চক্রগুলিকে ভেদ ক'রে সহস্রারচক্রে পূর্ণ-জ্ঞানস্বরূপ 'অকুল'-শিবের সঙ্গে সমরসে মিলিত হয় তখন কুণ্ডলিনীশক্তি অব্যক্ত' নাম নিয়ে বিশ্বোত্তীর্ণ অবস্থায় সহস্রারে অবস্থান করে। ক্রমে ঐ শক্তির উদ্বোধন হয় ও অকুল-পরমশিবে লয়প্রাপ্ত হয়। শক্তির জাগরণে ও উত্থানে চক্রগুলি ঊর্ধমুখে প্রস্ফুটিত হয়। এর নাম উন্মীলন। একটি চক্র থেকে শক্তি চক্রান্তরে গেলেই সেই চক্রের নিমীলন হয়, অর্থাৎ সেই চক্রের পাপ্‌ড়িগুলি অধোমুখী হয়। এ'ভাবে চক্র থেকে চক্রান্তরে কুণ্ডলিনীশক্তির ঊর্ধগতি হয়ে পরি শেষে সহস্রারচক্রে (কুণ্ডলিনী শিবরূপে) প্রতিষ্ঠিত হন। এই প্রতিষ্ঠার নাম প্রকাশ। 'কুল'-বিমর্শশক্তি তখন প্রকাশরূপী 'অকুল'-শিবের সঙ্গে একীভূত ও সমরস হয়। এই অবস্থাকেই লয়-অবস্থা বা একীভাব বলে। শক্তির এই লয়াবস্থা কিন্তু শূন্যতা নয়, যখন পূর্ণ-অকুলগর্ভে শক্তি প্রবেশ করে, তখন একীভূত অদ্বয়রূপ হয়। এটিই শাক্তদর্শনের অদ্বৈততত্ত্ব।[১] মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, লম্বিকাগ্র ও আজ্ঞা প্রভৃতি চক্র তখন অজ্ঞানভূমিতে পরিণত হয়,— অথাৎ সহস্রারের তুলনায় ঐ সকল চক্র অজ্ঞানরাজ্যের অন্তর্গত। আজ্ঞাচক্র ভেদ ক'রে ঊর্দ্ধগামী হয় শক্তি। আজ্ঞাচক্রের পর বিন্দুস্থানই যোগী ও জ্ঞানী-সাধকের 'তৃতীয়-চক্ষু (Third Eye) বা 'জ্ঞানচক্ষু',—যে তৃতীয় নয়ন বা জ্ঞানচক্ষু আমরা লক্ষ্য করি দেব বা দেবীদের (কপালের) মধ্যে। বিন্দুর পর অর্ধচন্দ্র। তারপর রোধিনী'-অবস্থায় সাধক (জীবাত্মা) উপনীত হন। এই রোধিনী-অবস্থা ভেদ ক'রে সাধক ক্রমশঃ 'নাদ'-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হন। 'নাদ' চিৎ বা চৈতন্যেরই অভিব্যঞ্জক। এই অবস্থায় চিৎশক্তির প্রকাশ অধিকতর স্পষ্ট হয়। এরপর 'নাদ'-এর স্থান বা প্রতিষ্ঠা—ব্রহ্মরন্ধ্র। ব্রহ্মরন্ধ্রেই 'নাদ'-এর স্থিতি ও চিরবিরাম ঘটে। এখানেই ঠিকঠিকভাবে চিৎশক্তির আবির্ভাব বা প্রকাশ হয়। চিৎ-শক্তিতেই বিশ্বচরাচর বিধৃত। একমতে নাদের সৃষ্টি হয় বিন্দু বা অবিচ্ছুরিত মহা-

১। এর নাম শাক্ত্যাদ্বৈত বা শক্তাবশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ, তাছাড়া আছে বিশিষ্টাদ্বৈত, শিবাদ্বৈত, রসাদ্বৈত, শব্দাদ্বৈত প্রভৃতি বাদ। তন্ত্রে ও বেদান্তে নাদ, বিন্দু প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে।

শক্তি কুণ্ডলিনী থেকে। নাদের অব্যক্ত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রথম প্রকাশ পরা বা পরানাদ। এখানে অনাহত-নাদের স্পন্দন অবিরতই চল্‌তে থাকে! যোগী অর্থে সংযতচিত্ত যোগসাধক ইচ্ছা করলে ঐ অনাহত-নাদ শুনতে পান। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সে কথারই উল্লেখ করেছেন।

নাদানুসন্ধানরূপ কারণশব্দ বা নাদের অনুসন্ধানকর্ম তন্ত্র, যোগ, বেদান্ত ও ভক্তি সকল সাধনাতে দেখা যায়। তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্র এরা নাদতত্ত্বের সন্ধান দেয়। বেদান্তের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। প্রথমে 'তত্ত্বমসি'-বাক্য শ্রবণ ও বিচার, তারপর মনন-রূপ বিচারের স্থির-নিশ্চয়তার পরিপক্কতা লাভ করে সাধক। পরিশেষে নিদিধ্যাসনে ব্রহ্মতত্ত্বনির্ধারণ ও উপলব্ধি হয়। যোগসাধনার ধারণা, ধ্যান ও সমাধির পরিপূরক হিসাবে শ্রবণাদি-সাধনকে সার্থক করে বেদান্তসাধনা। আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর অভিমতে নিষ্কামকর্মের সাধনায় চিত্তশুদ্ধির পর ব্রহ্মজ্ঞানের (তত্ত্বজ্ঞানের) উপলব্ধি হয়। সে'জন্য শ্রীভগবানের নাম জপ-করারূপ নিষ্কাম-কর্মসাধনার অঙ্গরূপে বীজমন্ত্রের জপ ও তার সঙ্গে স্তুতিগানের এবং স্তোত্রপাঠের উপযোগিতা থাকে।

শক্তিসাধনায় ও মন্ত্রসিদ্ধিসাধনায় মূলসূত্র নাদানুসন্ধান বা নাদের বা কারণ-শব্দের ক্রমিক-উচ্চারণকর্ম (জপ)। এই তত্ত্ব সহজে বোঝা কঠিন। পরমশ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বলেছেন: "শক্তিসাধনকো নাদানুসন্ধান অথবা শব্দকা ক্রমিক উচ্চারণ হৈ। বিন্দু ও কুণ্ডলিনী বিক্ষুব্ধ হোকর নাদকা বিকাশ করতী হৈ। পূর্ণ-পরমেশ্বরকী স্বাতন্ত্র্য শক্তিসে বিন্দুকা বিক্ষোভ কার্য সম্পন্ন হোতা হৈ। ইস্‌কা দূসরা নাম গুরুকৃপা বা পরমেশ্বরকা অনুগ্রহ হৈ। ইস্ চিদাকাশস্বরূপক বিন্দুকো দুস্‌রী কোই নিম্নভূমিস্থ শক্তি বিক্ষুব্ধ নহী কর সকতী। কুণ্ডলিনী জব মূলাধারকো ছোড়কে ঊর্ধ্বমুখ সহস্রার অথবা অকূল কমলমে বিরাজমান রহতী হৈ তব্ বহ অব্যক্ত নামসে বিশ্বোত্তীর্ণ অবস্থাকে অন্তর্গত রহতী হৈ।...ব্রহ্মরন্ধ্রকে জিস্ স্থানমে নাদকা লয় হোতা হৈ, বহ-বহী স্থান হৈ। ইস্‌কে বাদ সাক্ষাৎ চিৎশক্তিকা আবির্ভাব হোতা হৈ। ইসী শক্তিসে সমস্ত ভূবন বিধৃত হো রহে-হৈ।......"।

॥ অনাহত-নাদ ও মহাপ্রকৃতি ॥

অনাহত-নাদকে সাধারণভাবে বলে প্রণব বা ওঙ্কার। ওঙ্কারের পাঁচটি অংশ,— অ+উ+ম+কলা (সোমকলা)+বিন্দু। অ, উ, ম—এ'তিনটি সর্বাত্মক অক্ষর

—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রকাশক। এ'গুলির কারণ (বীজ) কলা, প্রকৃতি বা মহাপ্রকৃতি। কলাকে অংশ বলে,—সূক্ষ্ম বা কারণ-অংশ। প্রতিপদের চন্দ্রকে কলা বা চন্দ্রকলা বলে। প্রতিপদ থেকে চন্দ্র কলায়-কলায় অংশে-অংশে বাড়তে বাড়তে পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্ররূপে প্রকাশ পায়। প্রকৃতিকে তাই চন্দ্রকলা. অমাকলা বা অব্যক্তকলা বলে, কেননা অব্যক্ত-বীজরূপিণী প্রকৃতি থেকেই বিশ্বপ্রপঞ্চ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। প্রকৃতিতে সকল যুগশায়ী জড় ও চেতন বস্তুর কর্মফলরূপ বীজ সূক্ষ্মাকারে নিহিত (বীজাকার সুপ্ত) থাকে। তাই কলা, চন্দ্রকলা, শশীকলা, সোমকলা-রূপিণী মহাপ্রকৃতি (অব্যাকৃতি) থেকে বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি বা উদ্‌ভব হয়, আবার ঐ কলাতেই পরে সকল-কিছু মিশে যায়, লয় পায়। কলা, চন্দ্রকলা বা অমাকলা-রূপ মহাপ্রকৃতিকে এ'জন্য 'উদ্ভব-লয়-স্থানম্' বলে। ওঙ্কার বা প্রণবের অ, উ, ম ও কলা (ওঁ) মায়িক সৃষ্টির স্তর, আর কলার উপর বিন্দু মায়াতীত অর্থে সৃষ্টির অতীত, সুতরাং বিশ্বাতীত। একে স্তর, ভূমি বা অবস্থা বলে। আবার এ'কথাও বলা সঙ্গত নয়, কেননা যা বাক্যমনের অতীত অনির্বচনীয়, তাকে নির্বচন (প্রকাশ) করা নিরর্থক। ওঙ্কারের বিন্দুই দেশ-কাল-কারণাতীত-নির্গুণ-নির্বিশেষ-ব্রহ্ম। এই বিন্দুতেই সকল-কিছুর বিরাম বা সমাপ্তি,—'সর্বোপরমত্বাৎ তুরীয়ঃ'। বেদান্তে ও উপনিষদে ওঙ্কারের বিন্দুসত্তাই দেশ-কালাতীত ব্রহ্মসত্তা। আবার তন্ত্রে বিন্দু মহামায়া বা অবিচ্ছুরিত (অস্পন্দিত) কুণ্ডলিনীশক্তি। এই অশব্দ অথচ সকল শব্দের ও নাদের প্রভাবস্থান ও প্রলয়স্থান মহাপ্রকৃতি কুণ্ডলিনীশক্তি থেকেই অনাহত তথা পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা-বাক্ বা নাদের সৃষ্টি হয়। তারপর আহত-নাদ বৈখরীর বিকাশ। তন্ত্রে এবং উপনিষদেও পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমাকে গুহাহিত অমৃতপদ বলা হয়েছে,—'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' বা 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং বচ্চেণ্যং। ত্রিপাদস্য অমৃতং দিবি'। 'দিবি' অর্থে গুহাতে বা অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশে। বৈখরী-নাদ বাহ্যজগতে স্থূলশব্দের ও অর্থের বিকাশকে নিয়ে সার্থক।

'বিহার-রাষ্ট্রভাষা-পরিষদ' থেকে প্রকাশিত 'ভারতীয় সংস্কৃতি ঔর সাধনা' (১ম ও ২য় ভাগ) ও 'তান্ত্রিক-বাঙ্‌ময় মে শক্তিদৃষ্টি'-গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় অধ্যাত্মসাধনার বিচিত্র বিষয় নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন।[১০] আচার্য কবিরাজ মহাশয় বলেছেন যে, আগমশাস্ত্রে (তন্ত্র ও

১০। অধুনা 'হিমাদ্রী'-মাসিক পত্রিকায় শ্রীজগদীশ্বর পাল, এম. এ. এবং শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মমঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মিমাংসিত বহু সাধনতত্ত্বের রহস্য প্রকাশ করেছেন।

বেদাদি শাস্ত্রে) শব্দব্রহ্ম সাধারণত 'পরাবাক্' নামে প্রসিদ্ধ। পরাবাক্ এক হলেও বিচিত্র রূপে ও নামে প্রকাশিত হয়।

'চিদ্‌রূপা' (চৈতন্যস্বরূপা) শক্তি-ব্যতীত পরমাত্মার আর-একটি অচিদ্‌রূপা শক্তি আছে,—যার নাম 'বিন্দু'। বিন্দুর অপর নাম মহামায়া।[১১] এই মহামায়ার নাম চিদাকাশ বা কুণ্ডলিনীও।[১২] চিদ্‌রূপা-শক্তি সক্রিয় (ক্রিয়াচঞ্চল) অবস্থায় ক্রিয়ার প্রভাবে বিন্দুরূপা 'পরিগ্রহ'-শক্তিতে,—(পরিগ্রহশক্তি বলতে বিন্দু, মহামায়া, চিদাকাশ বা কুণ্ডলিনীশক্তি) ক্ষোভ (স্পন্দন) হয়। যেমন বায়ুর আঘাতে সমুদ্রে তরঙ্গ ওঠে, তেমনি চিদাকাশে (কুণ্ডলিনীতে) লহরী বা তরঙ্গ ওঠে; এই লহরীই বাইরে নাদ ও জ্যোতিঃরূপে প্রকাশ পায়। নাদ প্রকাশিত হয় 'বাক্'-রূপে এবং জ্যোতির প্রকাশ হয় 'অর্থ'-রূপে। এই বাক্ ও অর্থ পরস্পর-সংশ্লিষ্ট. —'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ...'। এর মধ্যে বাগাদি প্রতিটির তিনটি ক'রে অবস্থা,—পরম্ (কারণ), সূক্ষ্ম ও স্থূল। ক্রমেই এটি অবরোহ হয়ে থাকে। অবরোহ-সৃষ্টিতে বিন্দু থেকে বাক্-এর আবির্ভাবক্রম হ'ল পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। বাক্‌শাস্ত্রে (শব্দশাস্ত্রে) এই পরাদি চার স্তরের উল্লেখ আছে।

উপনিষদে নাদ বা প্রণবের পাঁচটি অংশের উল্লেখ আছে,—অ. উ, ম, কলা ও বিন্দু। তন্ত্রশাস্ত্রে ওঙ্কারের অংশ এগারোটি,—অকার. উকার, মকার, অর্ধচন্দ্র, বিন্দু, নিরোধিকা, নাদ, নাদান্তশক্তি, ব্যাপিনী. সমনা ও উন্মনা। জপের সাহায্যে ভাবনা কিংবা অন্য-কোন যৌগিকপ্রক্রিয়ার সাহায্যে সাধক অকার থেকে উন্মনা-পদ বা পাদ-পর্যন্ত আরোহণ করতে (উঠ্‌তে) পারেন। এই আরোহণ করার নাম ঊর্ধ্বগতির সাধনা। এই ঊর্ধ্বগতির সাধনা করেন সাধক শ্রীগুরুর বা ইষ্টদেবতার মূর্তির স্মরণ বা চিন্তার সময়ে, কেননা দেবতার চরণ থেকেই মনকে ক্রমে বক্ষ ও মস্তকের দিকে নিয়ে যেতে হয়। প্রথমে চরণ ও পরে ঊর্ধ্বে মস্তক থেকে দেবত্বশক্তির প্রকাশ হয়।[১৩]

১১। এখানে বিন্দু অর্থে ঠিক নামরূপহীন ব্রহ্ম নয়।

১২। বেদান্তে প্রণবের পাঁচটি পদ বা পাদের ব্যাখ্যায় বিন্দুকে সর্বাতীত ('সর্বোপরমত্বাৎ') ব্রহ্ম বলা হয়েছে। আবার বিন্দু যে মহামায়া বা কুণ্ডলিনী—এই ব্যাখ্যাও করা হয়েছে তান্ত্রিকদৃষ্টিতে।

১৩। (ক) মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এইসম্বন্ধে বলেছেন: "গুরুর চরণের সাহায্যে শক্তির সঞ্চার হয়। ইহা (এই শক্তি) উপর হইতে আসে, এ'জন্য মস্তকের উপরদেখিতে হয়। দেবতার মূর্তিও উহা হইতেই আসে। তাই গুরু বা ইষ্টের ধ্যান অনুলোমে (অনুলোমক্রমে) করিতে হয়: প্রথমে চরণ, তারপর বক্ষ (দেহ), উপরের দিকে মস্তক"।

॥ তন্ত্রে সাধনাঙ্গরূপ চক্রসাধনা ॥

'তন্ত্রে সাধনাঙ্গ'-আলোচনার সময়ে শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর 'আর্যপ্রভা'-গ্রন্থে (১১৩৮) 'কুণ্ডলিনী'-সাধনায় মুক্তির কথা বলেছেন। আসলে কুণ্ডলিনীশক্তির আরোহণ ও অবরোহণ-প্রণালী নিয়েই সাধনশাস্ত্রের বিচার। পর পর শক্তির অবতরণ বলতে অখণ্ড ও অবিচ্ছুরিত কুণ্ডলিনী বা মহামায়ারূপিণী শক্তি শুদ্ধরূপ থেকে ক্রমে কুণ্ডলিনীশক্তির প্রথম প্রকাশ পরায়, পরে পশ্যন্তীতে, তারপর মধ্যমায় ও পরিশেষে বৈখরীতে অবতরণ করে।[১৪]

পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা-নাদশক্তি অনাহত এবং বৈখরী-নাদশক্তি আহত। শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেছেন : "তন্ত্র বলে যে, কুণ্ডলিনী জাগরিতা হ'লে মনের বৃত্তিগুলি, সেই সেই স্থানের অক্ষরগুলি, দেবতা ও দেবশক্তিসকল রমণ (মিলন) করতে করতে কুণ্ডলিনীর ঘাড়ে এসে পড়ে এবং কুণ্ডলিনী তাদের সমস্ত গ্রাস করতে করতে এক-একটি চক্র ভেদ ক'রে উঠ্‌তে থাকে। এ' যেন বোড়া-সাপের আকর্ষণের মতো পোকা-মাকড়, বড় জীব সমস্তই বোড়ার ঘাড়ে পড়া। ঐ প্রজ্ঞারূপিণী শ্রদ্ধাই একমাত্র সমস্ত বৃত্তিকে গ্রাস করতে সমর্থ, অতএব শ্রদ্ধাই কুণ্ডলিনীশক্তি। সমস্ত শরীর ও পঞ্চভূত তখনই পরিশুদ্ধ হয় এবং মনের মোড় (গতি) ফিরে যায়;—অর্থাৎ মন ব্রহ্মমুখী হয়—যখন শ্রদ্ধা (কুণ্ডলিনী) জাগে, তখন শ্রদ্ধা সকলকে আত্মগত ও আপন ক'রে নেয়। তন্ত্রের সাধক (শুধু তন্ত্রের কেন, সকল মতের ও সকল পথের সাধক) শ্রদ্ধার (কুণ্ডলিনীর) জাগরণ ও তার নানা প্রকাশ উপলব্ধি করেন, * *। সমস্ত অক্ষরগুলি পরা-রূপে সহস্রারে মস্তিষ্ককেন্দ্রে বা চিত্তকেন্দ্রে বর্তমান।"

(খ) কাশ্মিরীয় তন্ত্র 'শিবদৃষ্টি', 'স্পন্দকারিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে স্পন্দতত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 'স্পন্দ' আসলে 'স্পন্দন' 'কম্পন'; বিচ্ছুরণ, বা ক্ষোভ। সাংখ্যকার কপিল বলেছেন : 'গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি'। সাম্যাবস্থা বলতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সম-অবস্থা (balance)। এই সাম্যাবস্থার ক্ষোভ (গুণক্ষোভ বা বৈষম্য) হলেই সৃষ্টি হয় বলতে প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর-মিলনে সৃষ্টি হয়। ক্ষোভের নাম তাই চঞ্চল অবস্থা।

১৪। অবতরণ ও উত্থান হয় যোগ ও তন্ত্র-সাধনার ক্ষেত্রে। বেদান্তের সাধনা পৃথক। যোগ থেকে শক্তির অবতরণ বলতে কুণ্ডলিনী (যিনি বিন্দু-রূপেও পরিচিত) পর পর নিয়ে পরমকারণ থেকে কারণে, কারণ থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে; অথবা অবিচ্ছুরিত বিত্তশক্তি থেকে পরায়, পরা থেকে পশ্যন্তীতে, পশ্যন্তী থেকে মধ্যমায় ও মধ্যমা থেকে বৈখরীতে অবতরণ করে। বৈখরী থেকে ঊর্ধ্বতন-ক্রমবিকাশ স্বীকার করলে পর পর ঊর্ধ্বে উত্তরণ বা ঊর্ধ্বপাত হ'তে পারে।

নাদসাধনায় জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তি যখন মূলাধারচক্র ভেদ ক'রে স্বাধিষ্ঠানচক্রে ও পরে অন্যান্য চক্রে উপনীত হয়, তখন সকল চক্রের (বা পদ্মের) পাপড়িগুলি ঊর্ধ্বমুখে প্রস্ফুটিত ও প্রদীপ্ত হয় এবং কুণ্ডলিনী সেই সেই চক্র ভেদ ক'রে সহস্রারচক্রে উত্থিত ও প্রতিষ্ঠিত হ'লে সেই সেই চক্রগুলি একটির-পর-অপরটি পুনরায় অধোমুখী হয়। মনে রাখা উচিত যে, মূলাধারই মহাশক্তি কুণ্ডলিনীর স্থান। এ'জন্য মূলাধারে শক্তিকে আধারশক্তি বলে। আধারচক্রই কালীর ও কুলকুণ্ডলিনীর স্থান।

॥ 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি'-তন্ত্রগ্রন্থে চক্রবর্ণনা ॥

পরমহংস পূর্ণানন্দ-রচিত শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতন্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষট্‌চক্রনিরূপণ দেওয়া আছে। শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে ষট্‌চক্রের রচনা অতিসুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। এই শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি'-তন্ত্রগ্রন্থ দক্ষিণীপদ্ধতির অন্তর্গত শ্রীবিদ্যাসাধনার অপূর্ব গ্রন্থ। শ্রদ্ধেয় কালীচরণসিদ্ধান্ত শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির প্রথম অধ্যায়ের (প্রকাশের) টীকায় উল্লেখ করেছেন: "অথ তন্ত্রভবান্ পূর্ণানন্দ পরমহংস, শ্রীবিদ্যোপাসনারহস্যপ্রতিপাদকং শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিমিব সাধকানাং···মঙ্গলমাচরতি"। ষষ্ঠ প্রকাশে (অধ্যায়ে) ৫৬টি শ্লোকে অতিসুন্দরভাবে ষট্‌চক্রসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন পরমশ্রদ্ধাস্পদ পরমহংস পূর্ণানন্দ। ষট্‌চক্রবর্ণনার অর্থ তন্ত্রে ও তন্ত্রসাধনায় যোগের অনুষ্ঠানে ('যোগবিচরণম্') মোক্ষদ্বাররূপ কুণ্ডলিনীসাধনায় শিবশক্তি-সামরস্যসাধন ও কৈবল্যলাভ-সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন সাধক পূর্ণানন্দ। শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির ষষ্ঠ প্রকাশে পূর্ণানন্দ পরমহংস লিখেছেন—

> 'অথ তন্ত্রানুসারেণ ষট্‌চক্রাদিক্রমোদ্‌গতঃ।
> উচ্যতে পরমানন্দনির্বাহ প্রথমাঙ্কুরঃ॥'

এ'ভাবে ষষ্ঠপ্রকাশের ১-৫৬-টি শ্লোকে সাধক-গ্রন্থকার ষট্‌চক্রনিরূপণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন শিবশক্তিসামরস্যরূপে কৈবল্য বা মুক্তি লাভের জন্য। "মেরোর্বাহ্যপ্রদেশে শশিমিহিরশিবে সব্যদক্ষে নিষণ্ণে মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয়গুণময়ী" প্রভৃতি বর্ণনায় ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না তিনটি নাড়ীর বর্ণনা করেছেন পূর্ণানন্দ পরমহংস। প্রতিটি চক্রে ডাকিনি প্রভৃতি শক্তিসহচরী যোগিনীদের সন্নিবেশের সঙ্গে সঙ্গে পরমা কলাতিকুশলা-সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরা-নিত্যানন্দপরম্পরা-চপলা-কুণ্ডলিনীশক্তির অধিষ্ঠান, ঊর্ধ্বায়ন, নিমীলন প্রভৃতি গতির পরিচয় দিয়েছেন অপরূপভাবে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, আজ্ঞা প্রভৃতি চক্রেরও বিশদ-পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির ১৭শ প্রকাশে শ্রীচক্র ও ১৯শ প্রকাশে দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর স্তোত্রে

এবং দেবী শ্রীবিদ্যার মহিমা বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, সমগ্র গ্রন্থই ষোড়শী বা মহা-ত্রিপুসুরন্দরীর সাধনা ও মহিমা-বর্ণনায় মুখরিত।[১৫]

বামকেশ্বরতন্ত্রের অন্তর্গত 'নিত্যাষোড়শিকার্ণব' (শ্রীবিদ্যাসাধনার তন্ত্র)-গ্রন্থে এবং 'সৌন্দর্যলহরী'-র ৩২ শ্লোকে ষট্চক্রাদির অন্তর্গত চক্রগুলি-সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, কৌলিক-সাধনায় ষট্চক্রভেদ একটি যোগ বা যোগের সাধনা। ষট্চক্র যথা মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। দক্ষিণী-তান্ত্রিক-সাধনার শ্রীচক্রের সঙ্গে এই ষট্চক্রের নিবিড় সম্বন্ধ আছে এবং ঐ সম্বন্ধ এভাবে নির্ণীত: শ্রীচক্রের ত্রিকোণ মূলাধার, অষ্টকোণ স্বাধিষ্ঠান, অন্তর্দশার চক্র মণিপুর, বহির্দশার চক্র অনাহত, চতুর্দশার চক্র বিশুদ্ধ। শিবচক্রচতুষ্টয় আজ্ঞাচক্র। সৌন্দর্যলহরীর টীকায় শ্রদ্ধেয় লক্ষ্মীধর এ'গুলির ব্যাখ্যা ও বর্ণনা অতিসুন্দরভাবে দিয়েছেন।

॥ নিত্যাষোড়শিকার্ণবতন্ত্র ॥

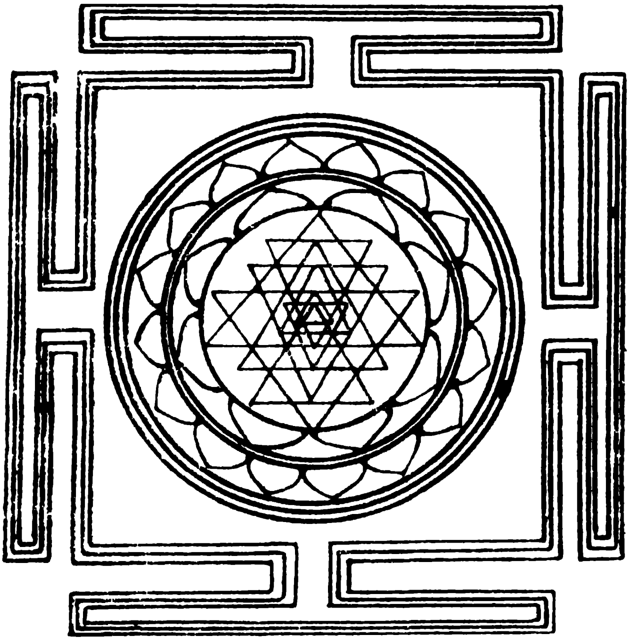
এ'প্রসঙ্গে 'নিত্যাষোড়শিকার্নব'-তন্ত্র শ্রীবিদ্যা বা মহাত্রিপুরসুন্দরীর সাধনার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় তন্ত্র,—যদিও ভাস্কর-রায়-প্রণীত ভাষ্যগুলির কথা স্বতন্ত্র। 'নিত্যাষোড়শিকার্ণব'-তন্ত্রের পাঁচটি মাত্র পটল বা অধ্যায়। প্রথম পটলের বিষয়বস্তু শ্রীবিদ্যা বা মহাত্রিপুরসুন্দরীর পূজা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, শ্রীবিদ্যার এই পূজা বাহ্যপূজা। এই পটলে বা অধ্যায়ে শ্রীবিদ্যা বা মহাত্রিপুরসুন্দরীর ধ্যানের সঙ্গে কামকলা-কুণ্ডলিনীর ধ্যানও দেওয়া আছে। পঞ্চম পটলে বলা হয়েছে: 'সর্বমেতৎ…ত্রিপুরাজ্ঞানযুক্তম্' এবং সেই জ্ঞানই মোক্ষ। এই বাহ্যপূজায় ভোগ ও অন্তঃপূজায় মোক্ষ অর্থে একই সঙ্গে ভোগ ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা লাভ হয় কামতত্ত্ববিধিজ্ঞানে ও মোক্ষতত্ত্বজ্ঞানে। অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত হয় সম্বিদরূপ প্রকাশের দ্বারা। ঐ সম্বিৎ বা জ্ঞানই ত্রিপুরসুন্দরী দেবী। 'দ্যোতমানত্বাদ্ দেবী' সুতরাং দেবী ত্রিপুরসুন্দরী প্রকাশস্বরূপ পরমদ্যুতি—এই ব্যাখ্যাই করেছেন ভাস্কর রায়।

॥ শ্রীকুলে শ্রীবিদ্যাসাধনায় চক্র (শ্রীচক্র) ও তত্ত্বানুসন্ধান ॥

শক্তিসাধনা প্রভৃতি তন্ত্রানুষ্ঠানে ও বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় মন্ত্র-ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের ব্যবহার আছে। যন্ত্রের অর্থ গৃহ বা যন্ত্র। নিয়মনার্থক 'যং'-ধাতু থেকে 'যন্ত্র' শব্দের সৃষ্টি বা উৎপত্তি। গৃহে সকল বস্তুর নিয়ন্ত্রন সম্ভব ব'লে যন্ত্রের প্রকৃত অর্থ

১৫। এই সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

গৃহ। যন্ত্রের অন্য অর্থ সচঞ্চল সর্বশরীরনিয়ন্তা প্রাণবায়ু, কেননা 'যং' বায়ুবীজ, সুতরাং প্রাণবায়ুই 'যং'-বীজের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। যন্ত্র আসলে বিশ্বের অব্যক্ত ও ব্যক্ত, কারণ ও কার্য, নিশ্চল ও সচল শক্তির দ্যোতক ও নিয়ামক। অথবা যন্ত্রকে প্রাণশক্তির আকার এবং আধারও বলা যায়। সুতরাং স্থূল ও ব্যক্ত আকার, রূপ



॥ শ্রীচক্র ॥

বা আধারই যন্ত্র। যন্ত্রসাধনায় মূলশক্তি কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয়। পূজায় যাগযজ্ঞে ও বিভিন্ন বৈদিক ও তান্ত্রিক-মাঙ্গলিক-অনুষ্ঠানে স্থূল যন্ত্র মন্ত্র অরূপ প্রাণশক্তিতে স্পন্দন সৃষ্টি করে ও স্থূলশরীর-রূপ আকারে মনঃসংযম করলে সূক্ষ্ম বা কারণশরীররূপ প্রাণশক্তিতে সাধক প্রতিষ্ঠিত হন। এই প্রাণই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। 'কুল' অর্থে শক্তি, সুতরাং সুপ্তা কারণরূপিনী কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণের সহায়ক যন্ত্র ও মন্ত্র উভয়েই। সুতরাং যন্ত্র শুধুই রেখা, বৃত্ত, অথবা ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ প্রভৃতির বন্ধনী বা আকার নয়, যন্ত্র মন্ত্রময়, শক্তিময় ও প্রাণময়। দেবতার পূজায় যন্ত্রকে তাই দেবতার প্রতিনিধি বা প্রতিচ্ছবি ব'লে কল্পনা করা হয়। তারিজন্য দেবতার স্থূল-বিগ্রহের পরিবর্তে কেবলই যন্ত্রে পূজা করার বিধি আছে। যন্ত্র তাই প্রতীকের (symbol) কাজ করে, সেজন্য প্রতিটি দেবতার যন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পিত।

যন্ত্রকে চক্ররূপে কল্পনা করা হয়। শ্রীযন্ত্রে ন'টি চক্র কল্পনা করা হয়েছে এবং প্রতিটি চক্রের রূপ, বর্ণ, দেবতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন। শ্রীযন্ত্র পরে উল্লিখিত হয়েছে। শ্রীযন্ত্রে ন'টি চক্রের নাম—

	নবচক্রনাম		চক্রে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
১।	সর্বানন্দময়	...	মহাত্রিপুরসুন্দরী,
২।	সর্বসিদ্ধিপ্রদ	...	ত্রিপুরাম্বা,
৩।	সর্বরোগহর	...	ত্রিপুরসিদ্ধা,
৪।	সর্বরক্ষাকর	...	ত্রিপুরমালিনী,
৫।	সর্বার্থসাধক	..	ত্রিপুরাশ্রী,
৬।	সর্বসৌভাগ্যদায়ক	...	ত্রিপুরবাসিনী,
৭।	সর্বসংক্ষোভণকারক	...	ত্রিপুরসুন্দরী,
৮।	সর্বাশাপরিপূরক	..	ত্রিপুরেশ্রী,
৯।	ত্রৈলোক্যমোহন		ত্রিপুরা।

নবচক্রের নবদেবতা প্রকটা, গুপ্তা, গুপ্ততরা, পরা, সম্প্রদায়া, কুলকৌলা, নিগর্ভা, অতিরহস্যা, পরাপররহস্যা, পরাপরাতিরহস্য প্রভৃতি নামেও পরিচিত। আসলে যন্ত্র, চক্র বা যন্ত্রাধিষ্ঠিত দেবতারা ভাবময় ও চিতিশক্তিসম্পন্না। যন্ত্রের পূজায়, আরাধনায় ও ধ্যানে দেবতাশক্তি জাগ্রত হয়, কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয় এবং মন্ত্রেররূপ ও মন্ত্রার্থ প্রদীপ্ত ও প্রত্যক্ষভূত হয়।

মন্ত্রের অর্থ ও সার্থকতার আলোচনা পূর্বে করেছি। বেদে, উপনিষদে ও বৈদিক সাহিত্যে বষট্, ওঁ, ফট্, নমঃ, প্রভৃতি মন্ত্রের প্রয়োগ আছে। বৈদিক যাগযজ্ঞে দেবতাদের আহ্বানের জন্য বৈদিক মন্ত্রের প্রচলন ছিল। পূর্বমীমাংসার যুগে যাগযজ্ঞে দেবতারা মন্ত্রময় বা মন্ত্ররূপী ছিলেন। রুদ্রমন্ত্র, ব্রহ্মমন্ত্র, মুক্তিমন্ত্র, মন্ত্ররাজমন্ত্র, পীঠমন্ত্র, আরাধনামন্ত্র, গায়ত্রীমন্ত্র, আদ্যামন্ত্র আর্ঘমন্ত্র, মুদ্রাশোধনমন্ত্র, প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্র, আত্মসমর্পণমন্ত্র প্রভৃতি ছাড়া দুর্গামন্ত্র, সরস্বতীমন্ত্র, দক্ষিণাকালিকামন্ত্র, তারামন্ত্র, ষোড়শীমন্ত্র, ভুবনেশ্বরীমন্ত্র, ছিন্নমস্তামন্ত্র, বগলামুখীমন্ত্র, ধুমাবতীমন্ত্র, কমলামন্ত্র, প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার মন্ত্র এবং সেই সকল ব্যতীত আরো বহু দেবতার মন্ত্রের প্রচলন আছে। মন্ত্রই দেবতা এবং দেবতাই মন্ত্র এই অভিন্ন প্রতিপাদক তত্ত্বই মন্ত্র, তন্ত্র এবং বিচিত্র অধ্যাত্মসাধনাকে যুগে যুগে প্রদীপ্ত ও প্রাণবান করেছে। মন্ত্রাধিষ্ঠিত ও মন্ত্রময় দেবতারা বিভিন্ন নামে ও তন্ত্রে পরিচিত।

॥ শিবশক্তিতত্ত্ব ॥

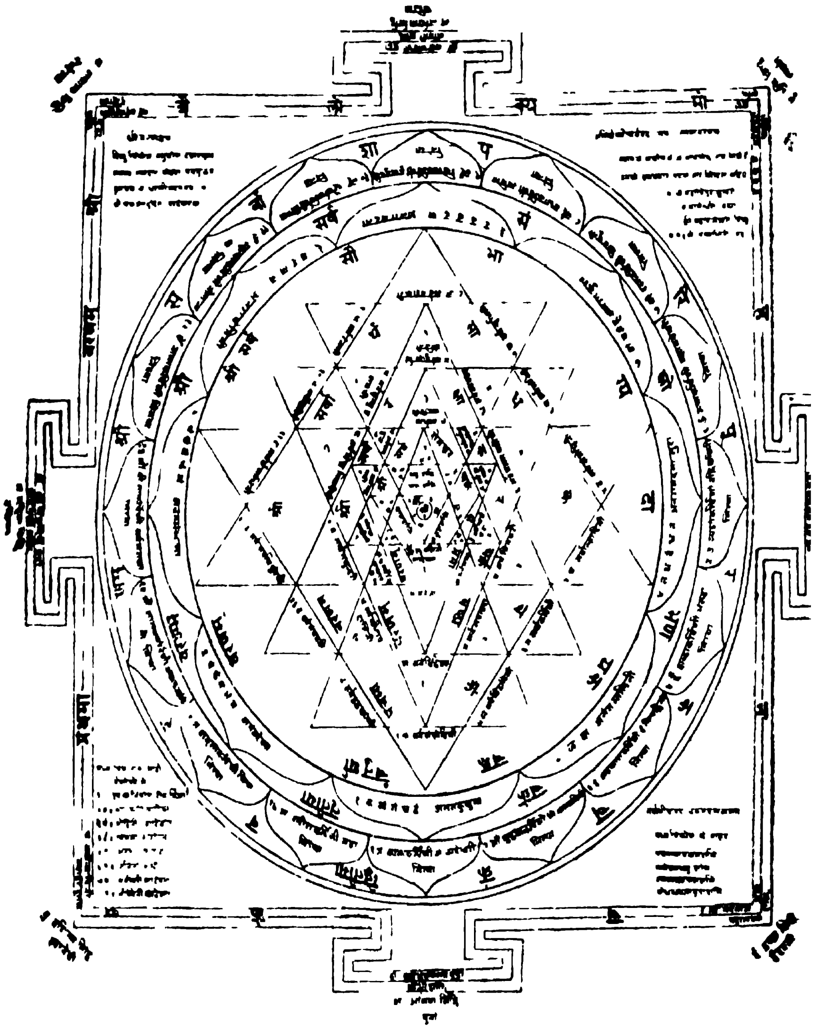
তন্ত্রসাধনায় বা শক্তিসাধনায় শিবশক্তিতত্ত্বই প্রধান ও আরাধ্য। তা' ছাড়া শান্তিকলারূপে সদাশিবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব প্রভৃতির সাধনার, চিন্তার ও ধ্যানের প্রচলন আছে। তন্ত্রে শুদ্ধ, শুদ্ধাশুদ্ধ ও অশুদ্ধ এই তিন ভাগে সকল তত্ত্ব বিভক্ত এবং তত্ত্বাশ্রিত দেবতা, মায়াদি বিদ্যাকলা, প্রকৃতি, বুদ্ধি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাকলা ও পৃথ্বী প্রভৃতি নিবৃত্তিকলার কল্পনা ও ভাবনা আছে।

যন্ত্র ও মন্ত্র-সম্পর্কে দশমহাবিদ্যাশক্তির (একমাত্র কালী বা মহাকালীরই) রূপান্তর ও নামান্তর এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের রাত্রি, বিদ্যা ও শিব প্রভৃতির উল্লেখ আছে শাক্তিমন্ত্র-সাধনায় দেবতা ও তত্ত্বের যথার্থ ধারণার জন্য। যেমন—

	শক্তি		রাত্রি		বিদ্যা		শিব
১।	মহাকালী	···	মহারাত্রি	···	মহাবিদ্যা	···	মহাকাল,
২।	তারা	···	ক্রোধরাত্রি	···	শ্রীবিদ্যা		অক্ষোভ,
৩।	ষোড়শী	···	দিব্যরাত্রি	···	সিদ্ধবিদ্যা	···	পঞ্চবক্ত্র,
৪।	ভুবনেশ্বরী	···	সিদ্ধরাত্রি	···	ঐ		ত্র্যম্বক,
৫।	ছিন্নমস্তা	···	বীররাত্রি	···	বিদ্যা	···	কবন্ধ,
৬।	ভৈরবী		কালরাত্রি	···	সিদ্ধবিদ্যা	···	কালভৈরব,
৭।	ধূমাবতী		দারুণরাত্রি	···	বিদ্যা	···	×
৮।	বগলামুখী	···	বীররাত্রি	···	সিদ্ধবিদ্যা	···	মহারুদ্র,
৯।	মাতঙ্গী	···	মোহরাত্রি	..	বিদ্যা	···	মতঙ্গ,
১০।	কমলা	···	মহারাত্রি		ঐ		সদাশিব

'রাত্রি' অর্থে শক্তি। শিব পুরুষ ও শক্তির প্রকৃত স্বরূপ। শক্তিমন্ত্রে যাঁরা অভিষিক্ত বা দীক্ষিত, তাঁদের এই বিদ্যার বা শক্তির কল্পনা সাধনার সহায়ক। তাছাড়া যন্ত্র-নির্দিষ্ট যেকোন দেবতাই শক্তিরূপে কল্পিত। যন্ত্রসাধনায় ও মন্ত্রসাধনায় এই তত্ত্বরহস্য সকল সাধকের পক্ষে স্মরণযোগ্য। যন্ত্রের (শ্রীযন্ত্রের) কতকগুলি চিত্র দেওয়া হলো যন্ত্ররূপ ও যন্ত্রপ্রকৃতি-সম্বন্ধে ধারণার জন্য। পূর্বেই বলেছি যে, বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন যন্ত্র ও মন্ত্র আছে। যন্ত্রের আকার বা গঠন-প্রণালীতে এবং যন্ত্রে মন্ত্র-সন্নিবেশেও বিভিন্ন পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যই ভিন্ন ভিন্ন দেবতার দ্যোতক বা প্রকাশক। এই সঙ্গে নবচক্রের একটি চিত্রও সন্নিবেশিত হলো শ্রীবিদ্যা-সাধনায় তত্ত্বকল্পনা ও চক্রসাধনার সুবিধার জন্য।

॥ শ্রীযন্ত্রম্ ॥



শ্রীযন্ত্রের চতুষ্কোণ গৃহের চারটি দ্বার। তার মধ্যে পদ্মের ষোড়শ দল, তার মধ্যে অষ্টদল এবং তার মধ্যে নবচক্রের সমাবেশ।

॥ নবচক্রের নাম ও অর্থ ॥

১। বিন্দু বা মহাবিন্দু—মূলকারণ, মহাত্রিপুরসুন্দরী, কামেশ্বর-কামেশ্বরী-সামরস্য, বিশ্বযোনি ও শিবভাব।

২। ত্রিকোণ—আদ্যা-বিমর্শশক্তি যা জীবে অবস্থিত, শব্দ ও অর্থরূপ সৃষ্টির কারণ পরাশক্তি, অহংভাব ও জীবভাব।

৩। অষ্টার পূর্যষ্টক—কারণ শরীর যা লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীরের কারণ ও কেন্দ্র।

৪। অন্তর্দশার—ইন্দ্রিয়-বাসনা (অন্তর্দ্বার) বা লিঙ্গশরীর।

৫। বহির্দশার—তন্মাত্রা বা পঞ্চভূত (বহির্দ্বার) (ইন্দ্রিয়-বিষয়)।

৬। চতুর্দশার—জাগ্রত স্থূলশরীর (চতুর্দ্বার)

৭। অষ্টদল (পদ্ম)—অষ্টারবাসনা।

৮। ষোড়শদল (পদ্ম)—দশারদ্বয়বাসনা।

৯। ভূপুর—বিন্দু, ত্রিকোণ, অষ্টদল, ষোড়শদল প্রভৃতির সমষ্টি রূপ, প্রমাতৃপুর ও প্রমাণপুরস্থ পশুপ্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, অহংকার, ও শুদ্ধবিদ্যাদি চারটি তত্ত্বের সামরস্য।

॥ শ্রীযন্ত্রে নবচক্রের পদ্মদলসংখ্যা ও শ্রীচক্রনাম ॥

১। ভ্রূমধ্য—আজ্ঞাচক্র - দ্বিদল—বিন্দু,

২। লম্বিকা—ইন্দ্রযোনি—অষ্টদল—ত্রিকোণ,

৩। কণ্ঠ বিশুদ্ধচক্র—ষোড়শদল—অষ্টকোণ,

৪। হৃদয়—অনাহত—দ্বাদশদল অন্তর্দ্বার,

৫। নাভি—মণিপুর—দশদল—বহির্দ্বার,

৬। বস্তি—স্বাধিষ্ঠান—ষট্দল—চতুর্দ্বার,

৭। মূলাধার—মূলাধার—চতুর্দল—অষ্টদল,

৮। তার আধাদেশ কুল—ষট্দল—ষোড়শদল,

৯। তার আধাদেশ—অকুল—সহস্রদল—ভূপুর।

কামবিলাস, স্বচ্ছন্দসংগ্রহ তন্ত্ররাজ, যোগিণীহৃদয়, সুভগোদয় প্রভৃতি তন্ত্রে শ্রীচক্র ও তার সাধনরহস্যের পরিচয় দেওয়া আছে। 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি'ও এ'বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ।

॥ শ্রীকুলে দেবী ষোড়শী বা শ্রীবিদ্যা ॥

"নবচক্রময়ং চক্রং বালাদেব্যা বিরাজিতম্। ৫২
প্রথমা ত্রিপুরাদেবী দ্বিতীয়া ত্রিপুরেশ্বরী।
তৃতীয়া সুন্দরীনাম্নী চতুর্থা ত্রিপুরবাসিনী ॥ ৫৩

পঞ্চমী ত্রিপুরাশ্রীশ্চ ষষ্ঠে ত্রিপুরমালিনী।
সপ্তমে ত্রিপুরা সিদ্ধা অষ্টমে ত্রিপুরাম্বিকা ॥ ৫৪
নবমে শ্রীমহাদেবী মহাত্রিপুরভৈরবী।
সমস্তাঃ প্রকটা গুপ্তাস্তথা গুপ্ততরাশ্রয়া ॥ ৫৫
সম্প্রদায়াঃ কুলাঃ কৌলা নিগমাশ্চ রহস্যগাঃ।
পরাপররহস্যাহ্ পরমাতিরহস্যগাঃ ॥ ৫৬
রাজরাজেশ্বরী পূর্ণা মহাত্রিপুরসুন্দরী।
এতচ্চক্রাস্থিতাঃ সর্বাঃ স্থানং জ্ঞাত্বা সমর্চয়েৎ ॥ ৫৭
নবধা চক্রসঙ্কেতং যো জানাতি স সাধকঃ।
নবধা যো ন জানাতি কথং দেবী প্রপূজয়েৎ ॥ ৫৮

॥ দেবী ত্রিপুরা বা ত্রিপুরসুন্দরী ॥

ত্রিপুরসুন্দরী-শ্রীবিদ্যা-সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ 'ত্রিপুরারহস্যম্' জ্ঞানগ্রন্থের Prefectory Note-এ উল্লেখ করেছেন : "The Supreme Goddess is variously named as Tripurā, Sundari,[১৬] Lalitā, Soḍaśi, Śri-Vidyā, Kāmeśwari etc. She is called Tripurā, in as much as Her Body consists of three Saktis viz. Brāhmi, Vaiṣṇavi and Rudri[১৭] (See পুরশ্চারণার্ণব, সুন্দরীস্তব পৃঃ ২০): The Tripurārahasya speaks of her in the following terms—

"ত্রিপুরানন্তশক্ত্যৈক্যরূপিণী সর্বসাক্ষিণী।
সা চিতিঃ সর্বতঃ পূর্ণা পরিচ্ছেদবিবর্জনাৎ ॥"

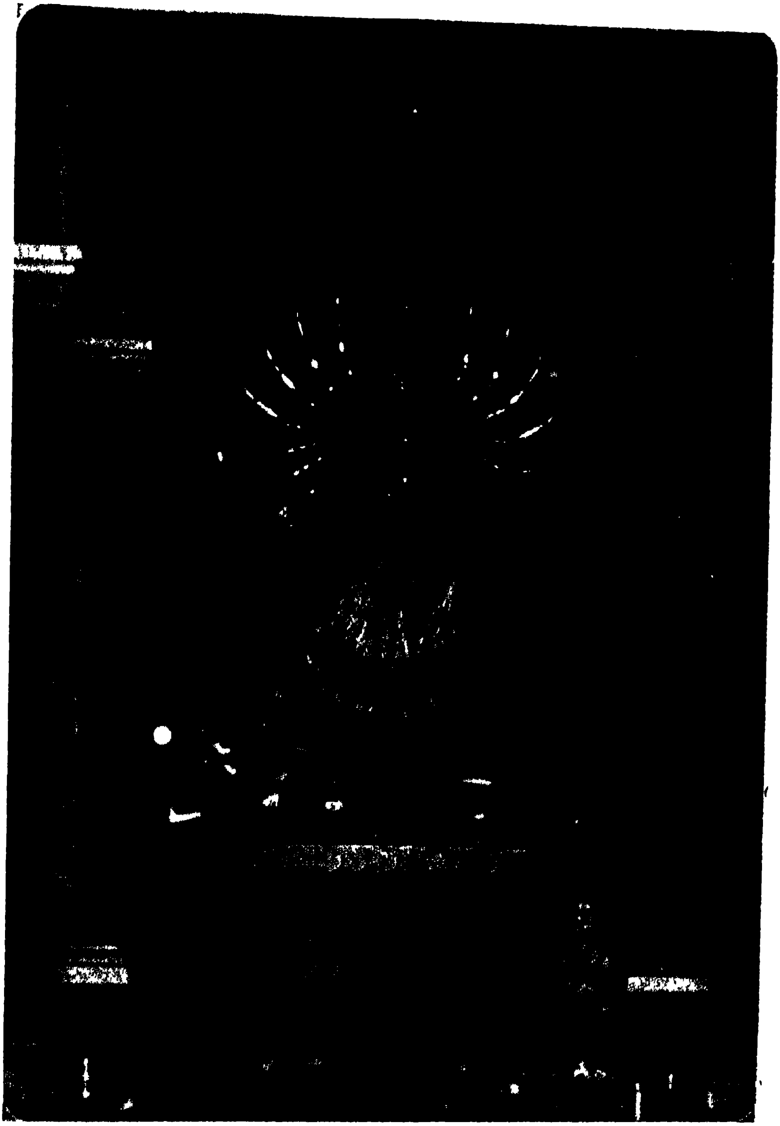
১৬। ত্রিপুরা বা ত্রিপুরসুন্দরীর ব্যাখ্যা দু'রকম—

(ক) ত্রিপুরা=ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা রুদ্রের (তিনের) মিলিত রূপ।

অথবা—

(খ) ত্রিপুর=মহাশক্তি কুণ্ডলিনীর তিন বিকাশ (রূপ)—পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা এবং বহির্বিকাশ বৈখরী যখন ব্যবহৃত হয় তখন দেবীর নাম ত্রিপুরসুন্দরী—ত্রিপুরাসুন্দরী নয়, অন্যথায়দেবীত্রিপুরা এবং দেবী ত্রিপুরসুন্দরী এক ও অভিন্না মহাবিদ্যা।

১৭। দেবী ত্রিপুরা 'সুন্দরী' নামেও পরিচিতা। যখন ত্রিপুরা ও সুন্দরী এক বা যুক্তভাবে তখন তিনি ত্রিপুরসুন্দরী।



দেবী ষোড়শী বা ত্রিপুরসুন্দরী (শ্রীবিদ্যাসাধনার)।

[মজঃফরপুর, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]



ফলহারিণী-কালীপূজার মহারাত্রে শ্রীসারদাদেবীকে ষোড়শী বা
ত্রিপুরসুন্দরীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা।

...The Śaktisaṅgama-Tantra observes that it is the Lalitā which assumed the form of Kṛṣṇa as Puruṣa,—'কদাচিদাদ্যা ললিতা পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা'।

Sundari (সুন্দরী) is one of the ten Mahāvidyās (vide Muṇḍa-mālā-Tantra, Patal I). It is said (Ibid) that the ten Vidyās combined form a Mahāvidyā, but ষোড়শী is a Mahāvidyā by Herself. The Toḍala-Tantra (patala I) calls Mahā-Tripura-Sundri by the name of Pañchami with Śiva (five-faced) as Her Bhairava. The শক্তিসঙ্গমতন্ত্র however (vide পুরশ্চারণার্ণব, pp. 13-14) makes ললিতেশ্বর at Bhairava. This is different from Tripura-Bhairava (বা Vikarāla ; the Companion of Chhinnamastā) and Ghora-Bhairava (i.e. Kāla-Bhairava, the companion of ধূমাবতী)।"

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, দেবী ত্রিপুরসুন্দরী, ষোড়শী, শ্রীবিদ্যা, ললিতা, কামেশ্বরী প্রভৃতি নামে পরিচিতা ও পূজিতা। দেবী ত্রিপুরসুন্দরী স্বয়ং 'মহাবিদ্যা' নামে পরিচিতা,—যেমন দেবী কালিকা নিজে মহাবিদ্যা। কুলকুণ্ডলিনী—কুল = কালী এবং মূলাধারে শায়িতা কুণ্ডলিনী মহাশক্তি। আসলে 'কুণ্ডলিনী' থেকেই মহাশক্তি কালী, মহাকালী, শ্রীবিদ্যা প্রভৃতির সৃষ্টি বা উদ্ভব।

॥ কালীকুলে শক্তিসাধনায় চক্র ও তত্ত্বানুসন্ধান ॥

তন্ত্রে চক্রসাধনায় মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ (ভারতী), ললনা (কালচক্র), আজ্ঞা, মন, সোম ও নিরালম্বপুরী প্রভৃতি চক্রের প্রতিটি পাপড়িতে (অংশে বা কলায়), বিদ্যুৎপ্রভাযুক্ত বর্ণ, অক্ষর বা মাতৃকা ও দেবতাদের অধিষ্ঠান আছে। বিভিন্ন তন্ত্রে আছে : "অথ ষট্‌চক্রেষু পদ্মানাং দলাবচ্ছেদে দক্ষিণাবর্তেন বর্ণযোগ-শিক্তনীয়ম্' ।সুতরাং প্রতিটি চক্রে বর্ণসমূহ অধিষ্ঠিত(যেমন পূজাকালে হস্তে,পদে ও সর্বদেহে অং, আং, ইং প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ ক'রে সমগ্র দেহকে বর্ণময় বা মাতৃকাময় ও দেবতাময় চিন্তাকরা হয়, তেম্নি দেহের সর্বত্র দেবতা অধিষ্ঠিত,—'মন্ত্রাণি দেবতা প্রোক্তা দেবতা মন্ত্ররূপিণী')। তাছাড়া প্রতিটি চক্রে চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও শক্তি থাকেন। চক্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও শক্তিসমূহ সকল সাধনায় ঠিক এক রকম নয়, চিন্তা ও ভাবরূপে পৃথক পৃথক স্থানে তাঁদের আবির্ভাব ও স্থিতি থাকে। প্রতিটি চক্র বা পদ্মকে ভেদ

ক'রে জাগ্রতা কুণ্ডলিনীশক্তি যখন মস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারচক্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সাধকের শরীর ও মন মন্ত্রময় (মন্ত্রদীপ্ত) ও দেবতাময় হয়। প্রতিটি চক্রে যে মন্ত্রাক্ষর, বৃত্তি (মনোবৃত্তি), দেবতা প্রভৃতির অধিষ্ঠান আছে, সাধক সেইগুলিকে চিন্তা করতে করতে বিভিন্ন অনুভূতির বা জ্ঞানের স্তরকে (levels of concsiousness) অতিক্রম করেন ও পরিশেষে পরমজ্ঞানরূপ শিব-'বিজ্ঞানে' (চৈতন্যে) প্রতিষ্ঠিত হন। চক্র সাধারণত সহস্রারকে নিয়ে সাতটি। তবে মনশ্চক্র, সোমচক্র ও নিরালম্বপুরীচক্রকে (যেগুলি আজ্ঞাচক্র ও সহস্রারচক্রের মধ্যবর্তী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চক্র বলে সে'গুলিকে) অন্তর্ভুক্ত করলে হয় দশটি চক্র। অনেকের মতে, চক্র ন'টি। চক্রগুলির বিবরণ 'ষট্চক্র-নিরূপণ'-গ্রন্থ-অনুযায়ী গ্রহণ ক'রে দেওয়া হ'ল সাধকের চিন্তা বা ধ্যানের সুবিধার জন্য। মূলাধারাদি ষট্‌চক্র ঃ—

(১) মূলাধার—মূলাধারচক্র চতুর্দল। এর চারটি রক্তবর্ণ পত্র। পত্রমধ্যে ব, শ, ষ, স চারটি বর্ণ দক্ষিণাবর্তক্রমে সাজানো। ঐ বর্ণগুলি সুষুম্নার সঙ্গে সংলগ্ন 'অথাধারপদ্মং সুষুম্নালগ্নম্'। বর্ণগুলি স্ববর্ণ - 'রং'-বীজযুক্ত। পদ্মের কর্ণিকাতে চতুষ্কোণ-পৃথ্বীমণ্ডল। এই মণ্ডল আটটি শূলাকার চিহ্নের দ্বারা আবৃত ও পীতবর্ণ। ধরামণ্ডলের মধ্যে পৃথ্বীবীজ—লং। এই বীজ চতুর্ভুজ, ঐরাবতাস্থিত, পীতবর্ণ ও বজ্রহস্ত। ধরা (পৃথ্বী)-বীজের বিন্দুমধ্যে শিশুরূপী রক্তবর্ণ, চতুর্মুখ ও চতুর্ভুজ ব্রহ্মা বিরাজিত। তাঁর চারহাতে দণ্ড কমণ্ডলু-জপমালা-অভয়। পদ্মের কর্ণিকায় রক্তপদ্মোপরি রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা চক্রাধিষ্ঠাত্রী ডাকিনীশক্তি। শক্তির চারটি হাতে শূল-খট্টাঙ্গ-চক্র-চষক (সুরাপাত্র) ধৃত। কর্ণিকামধ্যে বিদ্যুতাকার ত্রিকোণ। ত্রিকোণের মধ্যে কন্দর্পবায়ু (কামবায়ু) ও রক্তবর্ণ কামবীজ—ক্লীং। তার উপরে শ্যামবর্ণ পশ্চিমাভিমুখ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ শিব। তার উপর সার্ধ-ত্রিবলয়াকৃতি দক্ষিণাবর্তে সুপ্ত-বীজরূপী কুণ্ডলিনীশক্তি। মূলাধার অধোমুখ, কিন্তু ধ্যানের সময়ে উর্ধমুখ চিন্তা করতে হয়। কোন কোন তন্ত্রমতে গৃহবাসী গৃহীদের (গৃহস্থদের) পক্ষে মূলাধারের পদ্মগুলি অধোমুখ এবং যোগী ও যতিদের পক্ষে পদ্মদলগুলি উর্ধমুখ।

২) স্বাধিষ্ঠান—সিন্দূরবর্ণ (রক্তবর্ণ) ষড়দলযুক্ত (৬টি দল)। পদ্মের দলমধ্যে ব ভ ম য র ল এই ছ'টি বর্ণ অবস্থিত। এদের বর্ণ বিদ্যুতের মতো। স্বাধিষ্ঠানপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে অর্ধচন্দ্রযুক্ত অষ্টদলপদ্মাকার শ্বেতবর্ণ অম্বোজমণ্ডল। এই অম্বোজ বা পদ্মমধ্যে বরুণবীজ—বং। বরুণবীজ-বং মকরাস্থিত ও পাশহস্ত তার ক্রোড়ে গরুড়ের উপর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ পীতাম্বর ও বনমালা-শোভিত শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত কৌস্তুভধারী সুবেশিত দেবতা শ্রীবিষ্ণু। পদ্মের কর্ণিকায়



মনুষ্যদেহে ষট্‌চক্রের সংস্থান।

রক্তপদ্মোপরি আসীনা শ্যামবর্ণা শূল-পদ্ম-ডমরু-টঙ্ককধারিণী চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা বক্রদন্তা ভয়ঙ্করী ও চক্রাধিষ্ঠাত্রী রাকিণীশক্তি বিরাজমানা।

(৩) মণিপুর—নাভিমূলের সমদেশে মেঘের ন্যায় কৃষ্ণনীলাভ বর্ণ। এর মধ্যে ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ—দশটি বর্ণ অবস্থিত। কর্ণিকা ত্রিকোণাকার, কিন্তু ত্রিকোণের বাইরে তিনটি স্বস্তিকচিহ্নযুক্ত রক্তবর্ণ বহ্নিমণ্ডল। তার মধ্যে রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ 'রং' অবস্থিত। এই বীজ মেষস্থিত, চতুর্ভুজ এবং বজ্রশক্তি ও বরাভয়ধারী ; এঁর ক্রোড়দেশে রক্তবর্ণ দ্বিভুজ বরাভয়ধারী বৃষভবাদল ভস্মলিপ্তগাত্র ও বিচিত্র আভরণযুক্ত ত্রিনেত্র বৃদ্ধরূপী রুদ্রমূর্তি আসীন। পদ্মের কর্ণিকায় রক্তোপদ্মোপরি নীলবর্ণা ত্রিবদনা ত্রিনেত্রা বজ্রশক্তি ও বরাভয়ধারিণী চতুর্ভুজা ভীষণদর্শনা চক্রাধিষ্ঠাত্রী রাকিনীদেবী অবস্থিতা।

(৪) অনাহত—হৃদয়স্থানে (বক্ষস্থলে) বন্ধুকপুষ্পের মতো রক্তবর্ণ দ্বাদশদল যুক্ত অনাহতপদ্ম (চক্র)। পদ্মের দলমধ্যে সিন্দুরবর্ণ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ—এই বারোটি বর্ণ বিন্দুযুক্ত কর্ণিকায় ষট্‌কোণ ধূম্রবর্ণ বায়ুমণ্ডল, তার মধ্যে কোটিবিদ্যুৎসমান-কান্তিবিশিষ্ট ত্রিকোণ। ত্রিকোণের ঊর্ধ্বে ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ। এই বীজ কৃষ্ণসারস্থিত, চতুর্ভুজ ও অঙ্কুশহস্ত। এঁর ক্রোড়দেশে হংসের মতো শুভ্রবর্ণ দ্বিভুজ বরাভয়হস্ত, ত্রিনেত্র 'ঈশ' নামক দেবতা। অনাহতপদ্মের কর্ণিকায় রক্তপদ্ম-পরিস্থিতা পীতবর্ণা চতুর্ভুজা পাশ-কপাল- (সুরাপাত্র)-বরাভয়হস্তা সর্বভূষণমণ্ডিতা পীতবস্ত্রা নরকঙ্কালমালাশোভিতা চক্রাধিষ্ঠাত্রী কাকিনীশক্তি আসীনা।[১৮] ঈশদেবতার নিম্নে ত্রিকোণে সুবর্ণবর্ণ বাণলিঙ্গ-শিব। এই বাণলিঙ্গ-শিব কামভাবদীপ্ত ও উল্লাসযুক্ত। এঁর মস্তকে সূক্ষ্মছিদ্র শোভিত। এঁর অধোদেশে নিশ্চল দীপ-কালিকাকার হংসরূপী জীবাত্মা। হৃদয়পদ্মকর্ণিকার অধোদেশে ঊর্ধ্বমুখ রক্তবর্ণ অষ্টদলযুত পদ্ম। এটি কল্পবৃক্ষ, রত্নবেদিকা, তন্দ্রাতপ, পতাকা প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত।এ'স্থানে ইষ্টদেবতার মানসপূজা করা হয়।

(৫) বিশুদ্ধ—কণ্ঠমূলে ধূম্রবর্ণ বিশুদ্ধচক্র। চক্রের কেশরগুলি ঈষৎরক্তবর্ণ। পদ্মের (চক্রের) দলমধ্যে বিন্দুযুক্ত রক্তবর্ণ অকারাদি ষোলটি স্বর আছে। পদ্মের কর্ণিকায় বৃত্তাকার শুক্লবর্ণ নভোমণ্ডল অবস্থিত। মণ্ডলমধ্যে ত্রিকোণ, ত্রিকোণ-মধ্যে চন্দ্রমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডলের উপরে নভোবীজ (আকাশ-বীজ) হং। এই 'হং'-

---

১৮। ঠিক এ'ধরনের সুরাপাত্রহস্তা (খর্পরহস্তা) অষ্টভুজযুক্তা তান্ত্রিকী দুর্গাদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। তাছাড়া দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা, ষড়ভুজা, দশভুজা, সহস্রভুজা দুর্গাদেবীর মূর্তি আছে। তাতোয়ে দুর্গা চতুর্ভুজা।

বীজ শুক্লবর্ণ, শুক্লবস্ত্রপরিহিত, শুক্লহস্তিতে আসীন চতুর্ভুজ। চারটি হাতে পাশ-অঙ্কুশ-বর অভয়-চিহ্ন। নভোবীজের (আকাশ বীজ) ক্রোড়দেশে বৃষভোপরি মহাসিংহাসনে আসীন অর্ধনারীশ্বর-সদাশিবমূর্তি। এর বামার্ধ স্বর্ণবর্ণ ও দক্ষিণার্ধ শুক্লবর্ণ। এঁর পঞ্চমুখ এবং প্রতিমুখে তিন চক্ষু। এঁর দশহস্ত। দশহস্তে শূল-টঙ্ক-খড়্গ-বজ্র-অগ্নি-নাগেন্দ্র (সর্পরাজ)-ঘণ্টা-অঙ্কুশ-পাশ-অভয়-মুদ্রা। এঁর পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম ও সর্বাঙ্গে ভস্মলিপ্ত। ইনি সর্পমালার দ্বারা শোভিত। মস্তকে অমৃতবর্ষী অধোমুখ অর্ধচন্দ্র। পদ্মের কর্ণিকামধ্যে চন্দ্রমণ্ডল ও তার মধ্যে অস্থির বা চঞ্চল ও উপরোস্থিত শুক্লবর্ণ শাকিনীশক্তি। এই শক্তির চারটি হস্তে পাশ-অঙ্কুশ-ধনু ও বাণ শোভিত। পরিধানে পীতবস্ত্র, এবং পঞ্চমুখ ও তিনটি নাম।

(৬) আজ্ঞা[১১]—ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে এই আজ্ঞাচক্র দুটি পক্ষযুক্ত হংসবৎ। চক্র শুক্লবর্ণ। এর দুটি দল ও দলমধ্যে মিশ্র বা বিচিত্র বর্ণ। পদ্মের কর্ণিকাতে চক্রাধিষ্ঠাত্রী হাকিনীশক্তি আসীনা। ইনি শুক্লবর্ণা ষড়বদনা ও ত্রিনেত্রা। নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ। চারহস্তের দ্বারা জ্ঞানমুদ্রা বা পুস্তকমুদ্রা, মনুষ্যের ললাটাস্থি, ডমরু ও জপমালা শোভিত। সাধক কালীচরণের মতে, দেবী ষড়ভুজা ও দু'টি হস্তে বর-অভয়-জপমালা-কপাল-ডমরু-পুস্তক। তার ঊর্ধ্বে ত্রিকোণ। ত্রিকোণমধ্যে বিদ্যুতাকার শুক্লবর্ণ 'ইতর-শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের উপরে ত্রিকোণ। তাতে প্রদীপসদৃশ জ্যোতিস্মান প্রণবাকৃতি 'অন্তরাত্মা' বিরাজিত। তাঁর চারিদিকে শূন্যস্থানে জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ ও অন্তরাত্মার স্বকীয় তেজের দ্বারা মূলাধারপদ্ম থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র-পর্যন্ত সমগ্র স্থান উদ্ভাসিত। তার ঊর্ধ্বে সূক্ষ্মরূপা মন। মনের ঊর্ধ্বে চন্দ্রমণ্ডল। মণ্ডলের মধ্যে শ্বেতবর্ণ হংস। হংসের ক্রোড়ে শক্তির সঙ্গে থাকেন পরমশিব। অনেকে দ্বিদল-আজ্ঞাচক্রের কিছু ঊর্ধ্বে নিরালম্বপুরীচক্রে (সূক্ষ্মচক্র) দ্বাদশদল বা ষোড়শদল শ্বেতপদ্মের পীঠাসনে বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান শ্রীগুরু ও ইষ্টদেবতার ধ্যান করেন সাধক।

(৭) সহস্রার—(জ্যোতির্ময় সহস্রদলপদ্ম)—বর্ণিত ঐ সকল পদ্মের উপরিদেশে শঙ্খিনীনাড়ীর শেষসীমায় শূন্যস্থানে ব্রহ্মরন্ধ্রের ঊর্ধ্বভাগে স্থিত বিসর্গের মধ্যদেশে প্রকাশমান নির্মল সহস্রদলপদ্ম অবস্থিত। এই পদ্ম পূর্ণচন্দ্রের মতো অতিশয় শুভ্রবর্ণ। পদ্ম অধোমুখ ও মনোরম। এর কেশরগুলি নবোদিত সূর্যের কিরণতুল্য

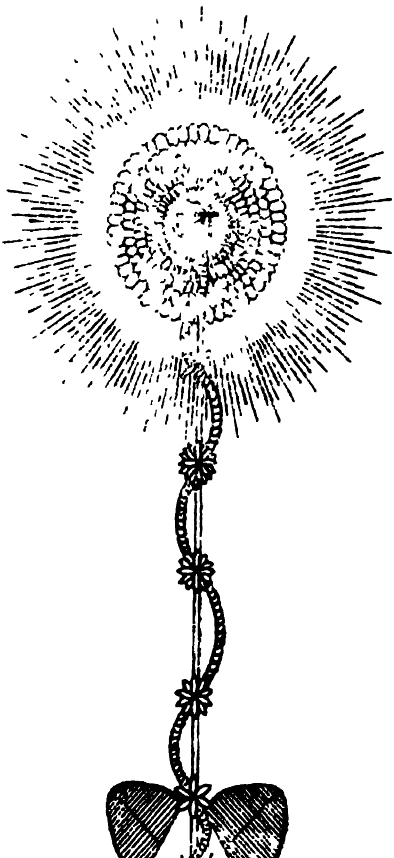
১১। আজ্ঞাচক্রকে হংস বা জ্ঞানচক্র ও গুরুর স্থান বলে। আজ্ঞা থেকে সহস্রারে পরমশিবকে অবলোকন করা যায়, কিন্তু মিলনের জন্য আরও ললনাদি চক্র অতিক্রম করতে হয়।

সমুজ্জ্বল। এই শরীর অ-কারাদি পঞ্চাশটি বর্ণের দ্বারা শোভিত। পঞ্চাশটি বর্ণ যথাক্রমে কুড়িবার (বিংশ) আবর্তনের দ্বারা,—অর্থাৎ বিংশতি-পংক্তিরূপে দলমধ্যে অবস্থিত। পঞ্চাশৎ সংখ্যাকে কুড়িবার গুণ করলে হয় এক সহস্র। এ'স্থলে অ-কার থেকে ক্ষ-কার-পর্যন্ত বর্ণমালা,—যে বর্ণমালা বা মাতৃকামালা দেবী বামা ও দক্ষিণা উভয় কালিকার গলায় দোদুল্যমান থাকে। কালীর মুণ্ডমালাও তাই.—মাতৃকা বা বর্ণমালা। পদ্মরূপ বর্ণগুলি শ্বেতবর্ণ। এই পদ্মের কর্ণিকায় নির্মল পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান। চন্দ্রকিরণে বর্ণগুলি সর্বদা সমুজ্জ্বল। ঐ পূর্ণচন্দ্রের মধ্যে বিদ্যুতের মতো সমুজ্জ্বল ত্রিকোণ (▽) সর্বদা স্ফুরিত। ত্রিকোণ মধ্যে একটি শূন্যস্থান,—যেখানে পরমবিন্দুস্বরূপ শিব বা ব্রহ্ম সমুজ্জ্বল। এই উজ্জ্বলতা বিশ্বচৈতন্যের। এই চৈতন্যের প্রকাশ এখানে স্বতঃস্ফূর্ত ও চিরসমুজ্জ্বল। সহস্রদলের কর্ণিকায় ঊর্ধ্বক্রমে অন্তরাত্মা অবস্থিত। প্রথমে হংস-রূপ অন্তরাত্মা, তার উপরে পরমশিবরূপ শ্রীগুরু বা ইষ্ট, তার ঊর্ধ্বে মহাশঙ্খিনীশক্তি। ইনি মহামায়া মহাশক্তি। পরমশিব এই পদ্মের কর্ণিকায় চির-অবস্থিত। ইনি আকাশ বা ব্যোমস্বরূপ,—অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। এই পদ্মে 'অমা'-(অমাকলা) কলানাড়ী প্রকৃতপক্ষে যোড়শকলা। এই কলা রক্তবর্ণা, মৃণালসূত্রের শতভাগের এক ভাগের মতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। এই কলা-শরীর কোটি বিদ্যুতের মতো সমুজ্জ্বল। সে'জন্য ইনি প্রকাশমানা ও অধোমুখী। অমাকলার ক্রোড়ে নির্বাণকলা। এই কলা সহস্রভাগে বিভক্ত কেশাগ্রের একভাগ-পরিমিত অতিসূক্ষ্ম। এটিও রক্তবর্ণা অধোমুখী। এ'র নীচে অব্যক্ত-নাদাত্মক 'নিরোধিকা'-বহ্নিকলা'। নির্বাণশক্তির মধ্যে শূন্যস্থানে 'শিব'-স্থান,—চির-আনন্দভূমি।

॥ যোগদর্শন ও বেদান্তদর্শনের মূলাধারচক্র ও অন্নময়াদিকোষের তুলনা ॥

যোগশাস্ত্রের ও তন্ত্রশাস্ত্রের ষট্‌চক্র মূলাধারাদি এবং বেদান্তদর্শনে পঞ্চকোষবিবেক ও পঞ্চকোষসাধনা। যোগশাস্ত্রের মূলাধারাদি পদ্ম বা চক্র এবং বেদান্তে অন্নময়াদিকোষ প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতার বা অনানুভূতির ক্ষেত্র বা স্তরমাত্র.—the levels of consciousness. অন্নময়কোষ material,—অন্নাদির দ্বারা পুষ্ট ও বর্ধিত এবং মূলাধারাদি-চক্র জীবন্তর, সুতরাং material. কিন্তু অন্নময়কোষ ও মূলাধারচক্র উভয়ই শক্তিকেন্দ্র,—যে শক্তিকেন্দ্র মানুষের শুধু নয়, সকল প্রাণবান প্রাণীর মধ্যে শক্তি ও অমিত বীর্যের সঞ্চার ক'রে সমগ্র প্রাণীদেহকে সচল ও সবল রাখে। সুতরাং পাতঞ্জলদর্শনের পরবর্তী শিবসংহিতা, ষট্‌চক্রনিরূপণ, যোগতারাবলী প্রভৃতি যোগশাস্ত্র

ও শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত চক্রাদি এবং বেদান্তের পঞ্চকোষ এই দুটির মধ্যে একটি সামঞ্জস্যের ভাব চিন্তা করা যায়। সেই সামঞ্জস্য বা সমতা হোল এরূপ (ষট্‌চক্রের চিত্রানুসারে)—



অগ্নি ও ঐরাবত মহাশক্তি মহাপ্রকৃতির পরিচায়ক।

(ব্যষ্টিতে বা ভাণ্ডে কুণ্ডলিনীশক্তি এবং সমষ্টিতে বা ব্রহ্মাণ্ডে মহাপ্রকৃতিশক্তি)

যোগশাস্ত্রের চক্র			বেদান্তের অন্নময়াদি-কোষ
(১)	মূলাধারচক্র	...	অন্নময়কোষ = পৃথ্বীতত্ত্ব
(২)	স্বাধিষ্ঠানচক্র	...	প্রাণময়কোষ = পৃথ্বীতত্ত্ব
(৩)	মণিপুরচক্র	...	মনোময়কোষ = অগ্নিতত্ত্ব
(৪)	অনাহতচক্র	...	মনোময়কোষ = অগ্নি বা তেজতত্ত্ব
(৫)	বিশুদ্ধচক্র	...	বিজ্ঞানময়কোষ = বায়ুতত্ত্ব
(৬)	আজ্ঞাচক্র		আনন্দময়কোষ = আকাশতত্ত্ব
(৭)	সহস্রারচক্র	...	সত্ত্বময়কোষ = মহাপ্রকৃতিতত্ত্ব।

পৃথিবী বা পার্থিবতত্ত্ব থেকে ধীরে ধীরে মন ঊর্ধে উত্থিত হ য়ে মহাপ্রকৃতিতত্ত্বে অধ্যাত্মজাগরণ ও জ্ঞানরূপ পরমশিবে অথবা ব্রহ্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে মনের সঞ্চার বা গতির অর্থ শক্তির উত্থান। পরিশেষে তার চরমবিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়। সুতরাং যোগদর্শনের ষট্চক্রনিরূপণ ও বেদান্তদর্শনের পঞ্চকোষবিবেকের মধ্যে একটি সমতা, সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য আছে। যোগে মূলাধার বা পৃথ্বিতত্ত্ব থেকে মনকে ধীরে ধীরে উত্থিত ক'রে অগ্নি, বায়ু, আকাশাদি-তত্ত্বে ও পরিশেষে শিব বা পরমশিবক্ষেত্রে বা ব্রহ্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করলে সমাধিতে যথার্থভাবে শিবজ্ঞানে বা ব্রহ্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হন সাধক। মনঃশক্তির মূলাধার বা অন্নময়কোষ থেকে উত্থানের নাম জাগরণ এবং জাগরণের পর পুনরায় ধীরে ধীরে ব্যুত্থান বা নেমে আসা সম্ভব হয় যোগী ও জ্ঞানী উভয়েরই পক্ষে। পরিশেষে চরম-উত্থানেই মনঃশক্তির চরম-অভিব্যক্তি হয় জ্ঞানে বা ব্রহ্মানুভূতিতে। যোগের আজ্ঞাচক্র বেদান্তের আনন্দময়-কোষের স্থান ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থানে। আজ্ঞাচক্রে ও আনন্দময়কোষে চরম-অনুভূতি হয় না, চরম-শিবজ্ঞানানুভূতি বা ব্রহ্মানুভূতি হয় যোগোক্ত সহস্রারচক্রে ও বেদান্তের মহাপ্রকৃতিতত্ত্ব ব্রহ্মনির্বাণ ক্ষেত্রে। যোগদর্শনে ও বেদান্তদর্শনে ঐ একই কথা বলা হয়েছে। বেদান্তদর্শনের 'আনন্দময়-অভ্যাসাৎ'-সূত্রে আচার্য শঙ্কর ঐ একই কথা বলেছেন যে, আনন্দময়কোষে ব্রহ্মসত্তার পূর্ণজ্ঞান হয় না, হয় আনন্দময় কোষের পারে ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মক্ষেত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন, আজ্ঞাচক্র যেন একটি কাঁচের দেওয়াল, - যেখান থেকে ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মজ্যোতির আভাস পাওয়া যায়। তাই আজ্ঞাচক্রভেদ করে সহস্রারে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে শিবশক্তিসামরস্যানুভূতির জন্য।

॥ অনাহত-নাদতত্ত্ব ॥

অনাহতনাদতত্ত্বের আলোচনায় তন্ত্রশাস্ত্রে ও যোগদর্শনে নাদ, বিন্দু ও কলা— এই তিনটিতত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে কিছু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। ভাষ্যকার পতঞ্জলি

পাণিনির 'মহাভাষ্যে' ও আচার্য ভর্তৃহরি 'বাক্যপদীয়'-গ্রন্থে 'নাদ'-সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন,—যদিও আচার্য ভর্তৃহরি নাদকে (নাদব্রহ্মকে) সর্বাতীত অদ্বৈততত্ত্বের আসনেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শারদাতিলক, তত্ত্বচিন্তামণি, প্রপঞ্চ ও সারতন্ত্র, প্রয়োগক্রমদীপিকা, স্বচ্ছন্দতন্ত্র, মহানির্বাণতন্ত্র, স্বতন্ত্রতন্ত্র, সিদ্ধান্তদীপিকা, রত্নত্রয় প্রভৃতি আগম ও নিগমশাস্ত্র-ছাড়া বিভিন্ন উপনিষদে ও পুরাণে নাদ, বিন্দু ও কলা এই তত্ত্ব-তিনটির বিশেষ আলোচনা পাওয়া যায়। শারদাতিলকতন্ত্রে আছে—

'সচ্চিদানন্দবিভাগাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্ বিন্দু সমুদ্ভবঃ ॥
পরশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাঽসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ ॥'

এই শ্লোক থেকে আমরা কয়েকটি তত্ত্ববিকাশের উল্লেখ পাই—

(১) পরমেশ্বর,—যিনি 'সকল' অথচ 'সচ্চিদানন্দ-বিভব',
(২) শক্তি,
(৩) নাদ বা পরনাদ (বা পরানাদ),
(৪) বিন্দু বা পরাবিন্দু এবং এ'থেকে—
(৫) বিন্দু ও বীজ (অপর),
(৬) নাদ বা অপর-নাদ ॥

'পরমেশ্বর' দিব্য ও অনন্ত 'শক্তি' বা 'কলা'-সম্পন্ন। শক্তি ও কলা অবিনাভাব-সম্বন্ধে আবদ্ধ,—মিথুনাকারা। অনন্ত 'সৎ' ও 'সত্তা'-রূপে পরমেশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান ও আনন্দের পরিপূর্ণ রূপ। আবার তিনি শক্তিযুক্ত,—যে' শক্তিকে ঐশী বা ঈশ্বরের ইচ্ছা বা অপার্থিব সৃষ্টির (সিসৃক্ষা) শক্তি বলতে পারি। শৈবপুরাণ, বায়বীয়পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে শক্তিকে সৃষ্টির ইচ্ছারূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই সৃষ্টির ইচ্ছাকে তন্ত্রশাস্ত্র বলে 'শিবেচ্ছা',—(শিবেচ্ছয়া) ও 'পরাশক্তি'। পরাশক্তি পরমেশ্বর-শিবের সঙ্গে মিথুনীকৃতা হয়ে আছে,—('শিবতত্ত্বৈকতাগতা') এবং নিজেকে প্রকাশ করেন তিনি,—('পরিস্ফুরতি')—

'শিবেচ্ছয়া পরাশক্তিঃ শিবতত্ত্বৈকতাং গতা।
ততঃ পরিস্ফুরত্যাদৌ সর্গে তৈলং তিলাদিব ॥'

শক্তি ও কলা পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত। কলাই আবার শক্তি। কলা নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শান্ত্যতীত—এই পাঁচভাগে বিভক্ত ও প্রকাশিত। কলাগুলি বিন্দুর শক্তিরূপে বিচ্ছুরিত (বিকৃত) ও প্রকাশিত হ'য়ে চিজ্জড়গ্রন্থিরূপে প্রকাশ পায় এবং তা থেকে বিভিন্ন তত্ত্ব ও লোকাদি বা ভুবনাদির সৃষ্টি হয়।

তন্ত্রে শক্তি মহারাত্রিরূপেও কল্পিত। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহারাত্রিরূপিণী দেবী

শ্রীশ্রীচণ্ডীকার বর্ণনা আছে। মহারাত্রিকে 'শূন্য'-রূপেও কল্পনা করা হয়েছে। মহারাত্রিরূপিণী 'শূন্য' এবং 'মায়া' রূপে পরিচিত। এই মায়া বা মহামায়া থেকেই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি ও বিকাশ। শূন্যের কল্পনাই পরানাদে বিকাশ লাভ করে। নাদ আলোক বা জ্যোতিঃস্বরূপ। অথবা বলা যায় নাদ ও জ্যোতিঃ বা তেজঃ মিথুনাকারে প্রকাশ পায়। তন্ত্রমতে পরমেশ্বরের দিব্য-ইচ্ছা 'শূন্য'-রূপে মায়া থেকে সৃষ্টি হয়. অথবা বলা যায়, শব্দ ও জ্যোতি শূন্যকে পরিপূর্ণ করে এবং তখনই দিব্যইচ্ছার স্ফুরণ হয়। তারপর বিন্দু। বিন্দুর এই রূপ বা অবস্থাকে ক্রিয়াশক্তি বলে। পুনরায় পরাবিন্দু থেকে তত্ত্বের (ত্রিতত্ত্বের) বিকাশ হয়,—অর্থাৎ পরাবিন্দু থেকে বিন্দু, বীজ ও নাদ-রূপ ত্রিতত্ত্বের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে বিন্দুতে শিবতত্ত্ব, বীজে শক্তিতত্ত্ব ও নাদে শিবশক্তিতত্ত্ব বিকাশ লাভ করে। তন্ত্রে নাদই শিব ও শক্তির মিলিত রূপ ও তত্ত্ব।

শারদাতিলকতন্ত্রের মতে, বিন্দুর মধ্যে যে সমতা বা সাম্য থাকে, তার বিভাগ হয় কিভাবে? প্রপঞ্চসারতন্ত্রে ১।৪২-৪২) আচার্য শঙ্কর বলেছেন—

'কালেন ভিদ্যমানস্তু স বিন্দুর্ভবতি ত্রিধা।
স্থূল-সূক্ষ্ম-পরত্বেন তস্য ত্রৈবিধ্যমিষ্যতে ॥
স বিন্দু-নাদ-বীজভেদেন চ নিগদ্যতে ॥'

শঙ্করাচার্য-রচিত প্রপঞ্চসারতন্ত্রের মতে কালই বিন্দুর সমতা বা একতাকে বিভক্ত করে। এই কালই মহাকাল,—অনাদিসিদ্ধ অনন্তপুরুষ। এই অনন্তপুরুষ ঐ কালের সাহায্যে পরাপ্রকৃতি হন বলতে পরাপ্রকৃতি জ্ঞানের সঙ্গে মিলিত বা যুক্ত হন। প্রকৃতি নিজের সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন ও স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপা। 'প্রয়োগক্রমদীপিকা'-মতে, বিন্দু যখনই বিভক্ত হয়, তখনই তাকে 'শব্দব্রহ্ম' বলে। এ সম্বন্ধে শারদাতিলক ও প্রপঞ্চসার উভয় তন্ত্রের অভিমত যে—

'ভিদ্যমানাৎ পরাদ্ বিন্দোরব্যক্তাত্মা রবোঽভবৎ।
শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্বাগমবিশারদাঃ ॥
বিন্দোস্তস্মাদ্ ভিদ্যমানাদ্ রবোঽব্যক্তাত্মকো ভবেৎ।
স রবঃ শ্রুতিসম্পন্নৈঃ শব্দব্রহ্মেতি কথ্যতে ॥'

পূর্বে 'শূন্য'[২০] বা মহাশূন্যের কথা উল্লেখ করেছি। প্রকৃতপক্ষে শূন্যের অপর নাম ব্রহ্মরন্ধ্ররূপ সহস্রারচক্র—যেখানে শিব ও শক্তির পরমমিলন ('সামরস্য')-সম্পন্ন

২০। এই শূন্য কিন্তু বৌদ্ধ-নৈরাত্ম্যদেবী নন। সাধক কমলাকান্তও বলেছেন :
'কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি, কখনও শূন্যরূপা রে।
মায়ের এ'ভাব ভাবিয়ে কমলাকান্ত সহজে পাগল হলো রে ॥'
এই শূন্য নিরালম্বচৈতন্য।

হয়। সাধকের মন যখন সকল চক্র ভেদ ক'রে সহস্রাররূপ শূন্যে বা পরমশূন্যতত্ত্বে উপনীত হয়, তখনই আসে উন্মনী বা নির্বীজসমাধি। বীজ=অজ্ঞান। এই নির্বীজসমাধিতেই গুণাতীত পরমচৈতন্য-পরমশিবের উপলব্ধি হয়। পূর্ণানন্দনাথের 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি'-গ্রন্থে সহস্রারপদ্মরূপী শূন্য বা মহাশূন্যকে 'ব্যাপিনী' বলা হয়েছে। এই তত্ত্বের সঙ্গে ষোড়শকলারূপ অমাকলা ষোড়শী ও সপ্তদশকলারূপ সমনার সম্পর্ক আছে সাধকদের ধ্যান-ধারনায় চিন্তা করার জন্য।[২১]

॥ পরানাদ বা মহানাদ ॥

পরানাদ বা মহানাদকে তন্ত্রে মহাকারণরূপ ও পরমবিজ্ঞানরূপ ব্রহ্ম বলা হয়েছে। এই ব্রহ্মই কারণরূপিণী অমাকলার কারণ। তিনিই তন্ত্রে বিন্দু। বেদান্তমতেও তাই। বিন্দুর অপর নাম 'মহাকারণ-ব্রহ্ম'। 'বিন্দু'-রূপ মহাকারণ-ব্রহ্মকে 'বিসর্গমণ্ডল' বলে। অমাকলারূপিণী শক্তির (অব্যাকৃতির) নাম 'কুল', আর বিসর্গ বিন্দু (.) 'অকুল'। 'কুল' অর্থে শক্তি, কালী বা মহাকালী, আর 'অকুল" অর্থে শিব বা সদাশিব। তবে কোন কোন তন্ত্রে বিসর্গ বা বিসর্গমণ্ডলের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে কুল বা কালী ও অকুল বা শিবের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে বা স্থানে। সাধারণত এই বিসর্গের (বিসর্গ-মণ্ডলের) স্থান ব্রহ্মরন্ধ্রে.—যার নীচে সূর্য, চন্দ্র ও মহাবায়ুর স্থান। মোটকথা, তন্ত্রে সকলকিছুরই স্থিতি ও প্রকাশ সহস্রারচক্রে।

তন্ত্রমতে এর সিদ্ধান্ত এই যে, মহাকারণরূপ বিন্দু বা ব্রহ্মই শব্দব্রহ্ম,—যিনি পুনরায় অবিচ্ছুরিত কামকলা এবং যার রূপ বিন্দু, বীজ ও নাদকে নিয়ে ত্রিকোণাকার (△ বা ▽)। এই কুলকুণ্ডলিনী-মহাশক্তিই পুনরায় পরনাদ ও পরবিন্দু। 'পর' অর্থে শ্রেষ্ঠ বা অতীত—(transcendental)-রূপে প্রকাশিত। অপরদিকে বলা যায়, শিবই[২২] বিন্দু ও শক্তি বীজ এবং নাদ এই দুটির সমন্বিত বা সম্মিলিতরূপ। তন্ত্রে বিন্দু, বীজ ও নাদকে অ-ক-থ-চক্র বা ত্রিকোণ-রূপে চিন্তা করা হয়েছে সেকথা পূর্বে বলেছি। এই চক্রের বা ত্রিকোণের প্রতিটি দিকে ১৬টি ক'রে মোট ১৬ × ৩ = ৪৮টি অক্ষরের সমাবেশ শক্তিসাধক চিন্তা করেন। সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন : কালী পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী···', অর্থাৎ পঞ্চাশটি বর্ণ = অ··· + ক··· ম = শক্তি বা কালী। ত্রিকোণই মহাশক্তিস্বরূপিণী কামকলার কুল বা কালীর সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং কামকলার বা কুণ্ডলিনীর বিন্দুগুলি পরস্পরে দু'টি কারণ ও একটি

২১। এখানে লক্ষ্মীধরমিশ্রের টীকাও দ্রষ্টব্য।

২২। কুণ্ডলিনী যখন জাগ্রতা নন, তখন নাদ এবং যখন জাগ্রতা ও প্রবোধা, তখন মহাকুণ্ডলিনী,—পরমশিবেরই অভিন্ন রূপ শক্তি।

কার্য সৃষ্টি করে, অর্থাৎ যুগ্মকারণ থেকে একটি কার্যের প্রকাশ হয়। অথবা বলা যায়, শিবশক্তির মিলনমাধুর্যে বৈচিত্র্যের বিকাশ হয়।

নাদের (অনাহত+আহত=নাদদুটির) সৃষ্টি হয় বিন্দু ও বীজ এবং শিব ও শক্তির আন্তরমিলনে ও স্পন্দনে কিন্তু বেদান্তমতে, এই নাদকে ঠিক শব্দব্রহ্ম বলা সঙ্গত হবে না, কেননা শব্দব্রহ্মের স্বতই সৃষ্টি ও বিকাশ হয় যখন পরবিন্দু বিভক্ত হয়। পর বা পরা-বিন্দুকে সে'জন্য 'মহানাদ' বলে। নাদের মধ্যে অক্ষর-মালার অন্তর্নিবেশ থাকে। অক্ষরমালার আর-এক নাম মুণ্ডমালা,—যা নাদ বা কুণ্ডলিনী-রূপিণী কালী বা মহাকালীর গলায় থাকে। সাধক কমলাকান্ত বলেছেন—

'ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি।'[২৩]

জ্যোতির্ময় শব্দরূপ মন্ত্রমালা, মুণ্ডমালা তথা অক্ষরমালা থেকে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে,—বলেছেন পাণিনি ও নন্দীকেশ্বর,—'নৃত্যাবসানে নটরাজরাজ',—নটরাজের নৃত্যের প্রতিটি ছন্দে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের (অক্ষরমালার) সৃষ্টি হয় এবং সেই শব্দ ও বর্ণ থেকে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি হয়,—বলেন শব্দব্রহ্মবাদীরা। শব্দব্রহ্ম যখন কামকলা বা কুণ্ডলিনীরূপে (বা মহামায়ারূপে) আত্মপ্রকাশ করে, তখন তা মানুষের শরীরেই অন্তর্নিবিষ্ট থাকে এবং তা থেকেই বর্ণমালা বা অক্ষরমালার বিচ্ছুরণে (প্রকাশে) শব্দ সৃষ্টি হয়। সাধক মন্ত্রোচ্চারণ অভ্যাস করলে সেই মন্ত্র সুষুম্নার মধ্যে শব্দঝঙ্কার সৃষ্টি করে। ঐ শব্দকে সাধারণভাবে 'নাদ' বলে—যে নাদ মহানাদের অপরিচ্ছেদ্য অংশ বা অঙ্গবিশেষ। ক্রমে ঐ সাধারণ নাদ মহানাদে রূপান্তরিত হয়। যোগশাস্ত্র বলে যে, ঐ মহানাদ ব্রহ্মরন্ধ্রে পরনাদের বা পরানাদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ভ্রূমধ্য দিয়ে আজ্ঞাচক্র ভেদ করে ও ক্রমে ব্রহ্মরন্ধ্রে জাগ্রত-মহাকুণ্ডলিনী[২৪] পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হয়। তখনই সাধক উপলব্ধি করেন 'সমরস' বা 'সামরস্য' অর্থে শিব ও শক্তির একরসে (চৈতন্যরসে) মিলন। এই একত্র-মিলনের নাম অবিনাভাব সম্পৃক্তি বা সমরস।

॥ বর্ণবীজ ও বীজমন্ত্র ॥

বীজমন্ত্রকে বর্ণবীজও বলে। বর্ণবীজ সাধকের ইষ্টচিন্তা বা সিদ্ধিচিন্তা-রূপ প্রদীপনে (exertion) মূলাধার থেকে আজ্ঞা—এই ছ'টি চক্র ভেদ ক'রে হয়

২৩। 'ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন' অর্থে বিশ্বসৃষ্টি যখন হয়নি,—তখন। তখন সৃষ্টির পূর্বে সকল-কিছু বীজাকারে লীন বা অব্যক্ত ছিল। 'মুণ্ড'-অর্থে বর্ণ প্রভৃতিরও তখন সৃষ্টি হয় নি। সুতরাং দেবী কালীর গলায় মুণ্ডমালার বা মন্ত্রমালার (মাতৃকার) কোন অর্থ নাই তখন।

২৪। পরা সূক্ষ্মা বলতে সূক্ষ্মতমা, পশ্যন্তী—সূক্ষ্মতরা, মধ্যমা—সূক্ষ্মা এবং বৈখরী স্থূল। পরা প্রথম-বিচ্ছুরণ—পরমকারণস্বরূপা। এর নাম প্রথম স্পন্দন বা আদি-স্পন্দন।

শক্তিময় মন্ত্র, বর্ণ নাদ বা শব্দ। এই বর্ণ বা নাদই আসলে মহানাদ বা শব্দব্রহ্ম— যার সৃষ্টি হয় নাদ ও বীজের সম্মিলনে।

আচার্য লক্ষ্মণদেশিক ও আচার্য শঙ্কর নাদকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন : পরনাদ বা পরানাদ, মহানাদ ও বিন্দু-বীজের সহমিলনে সৃষ্ট নাদ। সে'রকম দু'টি বিন্দুরও এখানে কল্পনা করা হয়,—পরবিন্দু ও অপরবিন্দু। পরবিন্দু শব্দব্রহ্মের কারণ বা উৎসস্বরূপ ও অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, আর অপরবিন্দু শিবপ্রকৃতিসম্পন্ন পরবিন্দুর ফলস্বরূপ অ-ক-থ (△)। অ-ক-থ ত্রিকোণ-'কলা' নামেও পরিচিত। এই কলাই আবার কুণ্ডলিনী নামে অভিহিতা।

॥ মহামায়া ও মহাশক্তি কুণ্ডলিনী ॥

শৈবাগমে কুণ্ডলিনীশক্তি 'মহামায়া' নামেও পরিচিতা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ইনিই যোগমায়া। তবে কাশ্মীর শৈবাগমের মতে, মায়া ও প্রকৃতি এক ও অভিন্ন নয়। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে (৪।১০) আছে : 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনং তু মহেশ্বরম্'। উপনিষদে মায়া ও প্রকৃতির মধ্যে কোন ভেদ নাই, কিন্তু শৈবাগম এ'কথা স্বীকার করে না। শৈবাগমের মতে, মায়া বা মহামায়া অনন্ত, কিন্তু প্রকৃতি সান্ত, কেননা প্রকৃতির সৃষ্টি ও বিকাশ হয় কলা থেকে, আর কলার সৃষ্টি হয় মায়া থেকে। শৈবাগমে আছে : "মায়া তচ্ছক্তির্তদ্গতপ্রাণিকর্মবিষয়ভেদেনেতি। প্রকৃতিতত্ত্বস্যৈবান্তর্গতো বিকল্পোঽহমমুক্তঃ। তত্রাচিৎশক্তি-মাত্রং তাবৎ প্রকৃতিঃ। তস্যাঃ স্বান্তর্গতস্বেশিতৃকালপ্রযোজ্যস্বকল্পিতত্তদীয়াত্রিমূর্তিহিরণ্যগর্ভাদ্যাখিলচেতনাং সোঢ়ৃং নানাত্মাদিপ্রত্যয়করমবান্তরশক্তিমাত্রং মায়া * * * মায়ায়া অপ্যন্তর্গতং তেষাং পরিচ্ছিন্নস্বরূপত্বাদিপ্রত্যয়করমাবিধালক্ষণমবান্ত।শক্তিমাত্রমিহ শক্তিঃ। * * তস্যাঃ শক্তেরপ্যন্তর্গতং যৎ তদ্গতপ্রাণিনাং প্রাক্তনভবোপার্জিতং কর্মজাতং তদিহ কর্ম। ন চ কেবলস্য কর্মণোঽবস্থানির্মিত ভৎসমবায়ো সলিলোঽচিদংশোঽভ্যুপেয়তে যৎ শৈবপ্রক্রিয়ায়াং প্রকৃতিতত্ত্বং ব্যপদিশ্যতে।"

পৌষ্করাগমতন্ত্র মহামায়া থেকে শব্দসৃষ্টির ক্রম নির্দেশ ক'রে বলে—

মহামায়া + নাদ + বিন্দু + সদাখ্য + ঈশ + বিদ্যা

এই ক্রমিক ধারা-অনুসারে মায়া বা মহামায়া অবিচ্ছুরিত স্পন্দনরহিত 'পর বা পরা-বিন্দু' এবং নাদ চিৎশক্তিপ্রদীপ্ত 'বিন্দু'। মায়া বা মহামায়া যখন স্বরূপে থাকেন, তখন মহাশক্তি কুণ্ডলিনী। এই কুণ্ডলিনীশক্তি সর্বদা জাগ্রত ও সক্রিয়া, কিন্তু কুণ্ডলিনী পুণরায় অব্যক্তা। মায়া বা মহামায়ার সঙ্গে।কোন পুরুষরূপ মানুষের সম্পর্ক নাই,

কিন্তু কুণ্ডলিনীর সম্পর্ক প্রতিটি পুরুষের বা মানুষের সঙ্গে জড়িত।[২৫] মহামায়ার অভিব্যক্তি হয় চারটি স্তরে (বাক্‌স্তরে বা শব্দস্তরে),—পরা বা সূক্ষ্মতমা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। প্রতিটি পুরুষ বা মানুষ 'মল'-রূপ অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন বা আবৃত, পরাবাক্ থেকে উত্তীর্ণ বা অতীত হ'লে তবেই মহামায়ার দর্শন লাভ করে সাধক ও তার আবরণ মুক্ত হয়।

শক্তিসিদ্ধান্তীদের মধ্যে যাঁরা 'নাদতত্ত্ব' স্বীকার করেন, তাঁরা আবার স্ফোটতত্ত্ব অস্বীকার করেন, কেননা সাধারণ-নাদ স্ফোট বা অসাধারণ-শব্দব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। আগমশাস্ত্রী শ্রদ্ধেয় রামকণ্ঠ 'রত্নত্রয়'-গ্রন্থের দ্বাবিংশ কারিকায় (কারিকা ২২) শব্দ ও অর্থের বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে, সাধারণ সূক্ষ্মনাদের প্রথম প্রকাশ বা অভিব্যক্তি বিন্দু। এই বিন্দুর বিকাশকে বলে 'পরনাদ' বা পরানাদ। আসলে নাদ বা পরনাদ বা পরানাদই সমস্ত শব্দ ও অর্থের প্রকাশক।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ এ'সম্বন্ধে বলেন : "Nāda is multiple, being unique in each individual, and is a product. Every animal soul (পশু-আত্মা বা জীব), having a nature of its own, experiences its own Nāda which arises from Anāhata-Bindu".

প্রকৃতপক্ষে আহত-নাদ অনাহত-বিন্দু বা অনাহত শব্দেরই অভিব্যক্তি ও প্রকাশ। অনাহত-নাদ অবিচ্ছুরিতা ও স্পন্দনহীনা স্বরূপভূতা কুলকুণ্ডলিনী বা কামকলা। এই স্বরূপভূতা কুণ্ডলিনী পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা-স্তরতিনটিকে অতিক্রম ক'রে বাহ্য-স্থূলাকারে চতুর্থ-বৈখরীনাদে রূপায়িতা হন। সুতরাং রূপায়িত বৈখরীনাদই আহতনাদ। নাদ ও নাদব্রহ্মতত্ত্বের সমীক্ষা Journal of the Gāngnāth Jhā Research Institute, Vol. III, February 1946 দ্রষ্টব্য।

॥ 'আনন্দলহরী'-টীকাকার লক্ষ্মীধরের মতে শ্রীবিদ্যার পূজায় চক্রসাধনা ॥

শ্রীবিদ্যা বা মহাত্রিপুরসুন্দরীর পূজায় ও উপাসনায় দেবীকে দ্বিদলবিশিষ্ট আজ্ঞাচক্রে ধ্যান করার নির্দেশ আছে। শ্রীবিদ্যা ও শ্রীকালিকা অভিন্না দেবী আম্নায়ভেদে রূপ, ধ্যান ও উপাসনার পদ্ধতি কেবল পৃথক। তাছাড়া কালীকুল ও শ্রীকুলের মধ্যে দেবীসাধনার কোন পার্থক্য নাই, ভেদ কেবল দেবীর রূপভাবনায়।

২৫। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষট্‌চক্র-সাধনার সময়ে ঠিক এই রকম অনুভূতি হয়েছিল। তিনিও অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন (শ্রীশ্রীকথামৃত দ্রষ্টব্য)।

সময়াচারী শক্তিসাধক লক্ষ্মীধর সৌন্দর্যলহরীর ১০০ সংখ্যক টীকামুখে বলেছেন ঃ "নাদেন বিন্দোরৈক্যং, বিন্দুনা কলায়াঃ ঐক্যং। কলায়াশ্চ নাদেনৈক্যং, এবং ত্রিতয়ম্ কলায়া নাদস্যৈবং শ্রীবিদ্যয়া পঞ্চকস্যৈক্যমিতি……। সময়িনশ্চ স্বাধিষ্ঠানং ভিত্ত্বঃ মনিপুরং প্রবিষ্টায়াঃ দেব্যা উপাসনং কুর্বন্তীতি সময়মততত্ত্বম্"।

টীকাকার শ্রীমল্লক্ষ্মীধরের বক্তব্য যে, মূলাধার প্রভৃতি ষট্‌চক্রকে শ্রীবিদ্যার 'শ্রীযন্ত্র'-রূপে পূজা ও ধ্যান করতে হয়। এই দেবী শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরসুন্দরী বা ষোড়শীর সঙ্গে শ্রীযন্ত্রের তাদাত্ম্য-ঐক্যের ধ্যানই নাদ ও বিন্দুর ঐক্য। নাদ, শ্রীচক্র ও বিন্দু তথা ষট্‌চক্র। শ্রীচক্র ও মূলাধারাদি ষট্‌চক্রকে অভিন্নভাবে গ্রহণ ক'রে ধ্যান করার উদ্দেশ্য নাদ ও বিন্দু,—শক্তি ও শিব - জীব ও ব্রহ্মকে এক ও অভিন্ন মনে করা। শ্রীচক্রে ত্রিকোণ, অষ্টকোণ, দশ কোণদ্বয়, চতুর্দশকোণ, শিবচক্রচতুষ্টয়, বৃত্তত্রয়। বৃত্তের বহির্দেশে চতুর্দ্বারযুক্ত ভূপুরযন্ত্রত্রয়, চতুর্দ্বারে শোভিত বৈন্দবস্থান—এইরূপে শ্রীচক্র রচনা ক'রে ধ্যান করার নিয়ম। সাধনসিদ্ধ আচার্যের কাছে থেকে সাধক শ্রীচক্রের এ'ভাবে উপাসনা করেন। আজ্ঞাচক্র দ্বিদলপদ্ম,—একদিকে অষ্টকোণ ও অপর দিকে ষোড়শ কোণ—এই দ্বিবিধ কর্ণিকা। এর অর্থ আজ্ঞাচক্র শিবচক্রচতুষ্টয়াত্মক। তাছাড়া রুদ্রগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও ব্রহ্মগ্রন্থি এই ত্রিবৃত্তের স্থিতি। ঐ ত্রিবৃত্তের উপর সহস্রদলকমল। ঐস্থানে শ্রীচক্র ও ষট্‌চক্রের ঐক্যরূপে ধ্যান এবং ঐ ধ্যান নাদ ও বিন্দুর,—শক্তি ও শিবের—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সাধন (শ্রীযন্ত্র দ্রষ্টব্য)।

॥ এক ॥

॥ শ্রীযন্ত্রে মাতৃকাবর্ণ ॥

এই পঞ্চাশ অক্ষর মাতৃকাবর্ণ। ক-চ-ট-ত-প-য়াদি বর্ণ, বর্ণের দেবতা ও মূর্তিবিস্তারেরও বিধান আছে। যেমন—

বর্গ	দেবতা
অবর্গ	বাসিনী
কবর্গ	কামেশ্বরী
চবর্গ	মোদিনী
টবর্গ	বিমলা
তবর্গ	অরুণা
পবর্গ	জয়িনী
যবর্গ	সর্বেশ্বরী
শবর্গ	কৌলিনী।

তাছাড়া অন্য দেবীরা আছেন—ব্রহ্মাণী,মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী. চামুণ্ডা, মহালক্ষ্মী=আটজন। এ'রা দেবী ও মহাশক্তি, সুতরাং এ'দের বর্ণ ও মাধুর্য আছে ভিন্ন ভিন্নভাবে। কি কৌলমার্গ. সময়মার্গ ও অন্যান্য মার্গ, সকল মার্গের সাধনায়ই মাতৃকাতে ধ্যানের কথা আছে। এই মাতৃকার ধ্যান ষট্‌চক্র ও শিব শক্তিসাধনার সঙ্গে সঙ্গে শিব ও শক্তি, প্রকাশ ও বিমর্শের ঐক্যসাধনের উপদেশ-- কি ষট্‌চক্র সাধনায় কি শ্রীযন্ত্র সাধনায়।[২৩]

॥ শ্রীকুলে শ্রীচক্রসাধনা (নবচক্র) ॥

সৌন্দর্যলহরী বা আনন্দলহরীর ১৭ সংখ্যক স্তোত্র —'সবিত্রীভির্বাচ্যাং শশি মণিশিলাভঙ্গ-রুচিভি.. মধুরৈঃ'।

টীকাকার লক্ষ্মীধর আগমরহস্যের পরিচয় দিতে গিয়ে মাতৃকাচক্রের উল্লেখ করেছেন পঞ্চাশৎ-বর্ণাত্মিকা। সেখানে বশিনীশক্তি স্বরাত্মিকা,—' স্বরাত্মিকাঃ শক্তয়ঃ স্ফটিকাভাঃ "। এই সম্পর্কে ত্রিকোণ—মূলাধার, অষ্টকোণ—স্বাধিষ্ঠান, দশার— মণিপুর, দ্বিতীয় দশার—অনাহত, চতুর্দশার—বিশুদ্ধ, শিবচক্র চতুষ্টয়—আজ্ঞা ও চতুরস্র-বিন্দুস্থান সহস্রদল-পদ্মস্বরূপ। এ'কথা পূর্বেও বলেছি। শ্রীচক্রসাধনা শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনার জন্য। মূলাধারাদি ছ'টি চক্রের সঙ্গে একীভূত বা অভিন্ন হয়ে সোমখণ্ড, সুধাখণ্ড ও অগ্নিখণ্ডে বিভক্ত। এই সোম. সূর্য ও অগ্নি—এই খণ্ডতিনটির সমষ্টি বা সমবেত-রূপ পঞ্চাশৎ কলা বা বর্ণ অ, ক, চ, ট, ত, প, য এবং শ—৮টি বর্গে বিভক্ত সেকথাও পূর্বে বলেছি। পঞ্চাশটি কলা বা বর্ণ 'মাতৃকা'। এই ৮টি বর্গের দেবী যথাক্রমে বশিনী, কামেশ্বরী প্রভৃতি। শ্রীচক্রের সঙ্গে ১২টি যোগিনীর সমাবেশ আছে। যোগিনীদের নাম বিদ্যা, রেচিকা, মোচিকা, অমৃতা, দীপিকা, জ্ঞান, আপ্যায়নী, ব্যাপিনী, মেধা, ব্যোমরূপা, সিদ্ধি ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দ্বাদশ যোগিনী। দেবীপূজায় যোগিনী, ডাকিনী ও মাতৃকাদের সম্পর্ক নিবিড়। দেবী শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরসুন্দরী অষ্টবর্গাত্মিকা পঞ্চাশৎ-কলাযুক্ত বা বর্ণাত্মিকা।

টীকাকার অচ্যুতানন্দ একটু ভিন্নভাবে শ্রীবিদ্যার রূপ কল্পনা করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, শ্রীবিদ্যার পঞ্চম-যাগের সময়ে স্বীয় প্রাণময় আত্মাকে শিব থেকে অভিন্ন ভেবে মূলাধারচক্র থেকে পরমশিব (বা মূলাধার থেকে সহস্রারচক্র) পর্যন্ত কুণ্ডলিনীশক্তিকে সর্বশক্তিস্বরূপ ভাবনা করতে হয়, সে'জন্য কুণ্ডলিনীর গাত্রে

২৩। এ'সম্বন্ধে বামকেশ্বরতন্ত্র, নিত্যাষোড়শীকার্ণব, 'সৌন্দর্যলহরী'-র শ্রীমল্লক্ষ্মীধরের টীকা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব, অথবা সূর্য-অগ্নি-চন্দ্র এই তিনটি বিন্দু চিন্তা করতে হয়। এরপর চিদ্‌কলার ধ্যান। এরপর রজোগুণসূচক ব্রহ্মরূপ ঊর্ধ্ববিন্দুকে দেবীর (ত্রিপুর-সুন্দরীর) মুখরূপে, সত্ত্বগুণসূচক হরি ও হর-রূপ দু'টি বিন্দুকে দেবীর দু'টি স্তনরূপে ও অধঃস্থিত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবরূপ হকারার্দ্ধ-সূক্ষ্মা-চিৎকলাকে ত্রিকোণাকৃতি অঙ্গরূপে চিন্তা করতে হয়। এই সম্বন্ধে শ্রীক্রমে কথিত আছে—

'বিন্দুত্রয়স্য দেবেশি, প্রথমে দেবিবক্ত্রকম্
বিন্দুদ্বয়ং স্তনদ্বয়ং হৃদি স্থানে নিয়োজয়েৎ।
হকারোর্দ্ধং কলাং সূক্ষ্মাং যোনিমধ্যে বিচিন্তয়েৎ ॥'

শ্রীক্রমের মতো 'ভাবচূড়ামণি'-গ্রন্থেও এ কথার সমর্থন আছে।

॥ দুই ॥

॥ শ্রীচক্রসাধনক্রমের ধারা ॥

তারপর বলা হয়েছে, যিনি সহস্রদলপদ্মে কামকলার (কুণ্ডলিনীদেবীর) ধ্যান করেন শ্রীচক্রের অন্তর্গত ত্রিকোণে তিনি ধ্যান করেন কামকলা বা ত্রিপুরসুন্দরীরই। কামকলা বা ত্রিপুরসুন্দরীই শ্রীচক্রের ত্রিকোণ এবং ত্রিকোণই দেবীর সূক্ষ্মমূর্তি।…এ' ভাবে দেবীর পূর্ণাঙ্গরূপের প্রকাশ হয়। এই পূর্ণাঙ্গরূপ থেকেই কালী, তারা, দুর্গা, গৌরী, অম্বিকা, কৌষিকী প্রভৃতি দেবীর বিকাশ হয়। এই অবস্থায় সাধক দেবীর স্তব করেন,—সৌন্দর্যলহরীর ২২ সংখ্যক স্তোত্র—'ভবানি ত্বং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সকরুণা'। দেবীর করুণার প্রার্থী তখনই হন সাধক। কায়িক, বাচিক ও মানসিক উপাসনাই তখন সাধকের অবলম্বন। 'শিবো ভূত্বা শিবং যজেৎ'। দেবীর সঙ্গে অভেদ-ভাবনা তখনই হয় সার্থক। সাধক দেবীর সঙ্গে একাত্মভাব প্রাপ্ত হন। এই একাত্ম-ভাবকেই সাজুয্যমুক্তি বলা হয়েছে। অবশ্য সৌন্দর্যলহরীর ২৩ সংখ্যক শ্লোকে দেবীর (শ্রীবিদ্যার) সঙ্গে সাধকের ঐক্যের বা একাত্মবোধের ভাব প্রকাশ করেছেন—'ত্বয়া হৃত্বা বামং বপুরপরিতৃপ্তেন মনসা'-প্রভৃতি। এখানে অদ্বৈতবেদান্তের মতো 'একোঽহম্'-এর ন্যায় 'ত্বমহং',—'তুমি ও আমি এক ও অভিন্ন'-ভাবের প্রকাশ পায়।

॥ শ্রীবিদ্যাউপাসনা—কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ ॥

'ষট্‌চক্রনিরূপণ' ও সৌন্দর্যলহরীস্তোত্রে কুণ্ডলিনীজাগরণের সার্থক-বর্ণনা পাওয়া যায়। বিশেষ ক'রে আচার্য শঙ্কর-রচিত 'সৌন্দর্যলহরী'-স্তোত্রের উপর শ্রীমৎ লক্ষ্মীধরের টীকা অপূর্বভাবে মহাশক্তি কুল-কুণ্ডলিনীর জাগরণের কথা বর্ণনা

করেছে। পরমহংস পূর্ণানন্দ তাঁর 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি'-তন্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষট্‌-চক্রের বর্ণনায় ৫২ শ্লোকে 'কুণ্ডলিনীযোগপ্রকারঃ'-বক্তব্যে আধারশক্তি-কুণ্ডলিনীর সত্তা ও রূপ-সম্বন্ধে বলেছেন—

'ভিত্ত্বা লিঙ্গত্রয়ং তৎ পরমরসশিবে
সূক্ষ্মধাম্নি প্রদীপ্তে,
সা দেবী শুদ্ধসত্ত্বা তড়িদিব বিলসৎ—
তন্তুরূপা সুসূক্ষ্মা।
ব্রহ্মাখ্যায়াঃ শিরায়াঃ সকলসরসিজং
প্রাপ্য দেদীপ্যতে তন্—
মোক্ষাখ্যানন্দরূপং ঘটয়তি সহসা
সূক্ষ্মতালক্ষণেন ॥
নীত্বা তাং কুলকুণ্ডলীং লয়বশাদ্
জীবেন সার্দ্ধং সুধী—
মোক্ষে ধামনি শুদ্ধপদ্মসদনে
শৈবেপরে স্বামিনি ॥'[২১] —প্রভৃতি।

'শাক্ত্যানন্দতরঙ্গিণী'-তন্ত্রগ্রন্থেও অপরূপভাবে কুণ্ডলিনীশক্তিকে চক্রে চক্রে উন্নীত ক'রে আত্মারূপ জ্ঞানচক্রে এবং পরে দ্বাদশদলগুরুপদ্মে তারপর সহস্রারপদ্মে বা চক্রে পরমবিন্দুরূপ পরমশিবের সঙ্গে কুণ্ডলিনীকে মিলিত করতে হয়,—'সকলসুখসন্তান-লহরী পরীবাহোহংসঃ পরম ইতি নাম্না পরিচিতঃ এই পরমশিবের সঙ্গে সমচৈতন্যরসে

২১। 'শারদাতিলক'-তন্ত্রের ২৫।৩২—৩৬ শ্লোকে আছে—

'পিণ্ডং ভবেৎ কুণ্ডলিনী শিবাত্মা
পদং তু হংসঃ সকলান্তরাত্মা।
রূপং ভবেদ্‌বিন্দুরনন্ত (মন্দ)-কান্তি-
রতীতরূপং শিবসামরস্যম্‌।'

অকার+উকার+মকারযুক্ত প্রণবই পিণ্ড সেকথা পূর্বে বলেছি। 'কুণ্ডলিনীশক্তিঃ তদ্রূপা শৈব শিবাত্মাসকলান্তরাত্মা হংসঃ।...পরমার্থতস্তু শিবয়োঃ সামরস্যমতীতরূপমেব'। টীকাকার রাঘবভট্ট বলেছেন: "অনেন সাযুজ্যমুক্তির্ভবতীত্যাহ পিণ্ডাদীতি"। "সারূপ্যমুক্তিমাহ শিব ইতি"। অর্থাৎ টীকাকার রাঘবভট্টের মতে, পিণ্ড, প্রণব বা কুণ্ডলিনীশক্তির সামরস্যে সাযুজ্যমুক্তি এবং হংস-শিবের সামরস্যে সারূপ্যমুক্তি হয়। শিব ও শক্তি অভেদ ও এক এই সিদ্ধান্তই আগমশাস্ত্রের অভিমত। কুণ্ডলিনী জীব, এবং তার জাগরণের অর্থই হোল তার যে স্বরূপসত্তা-শিব সেই বিষয়ে সচেতন হওয়া। এই সচেতনতার নাম 'সোহহং হংসঃ'—জীবই স্বরূপে শিব।

একীভূত হওয়ার জন্য। প্রপঞ্চসারতন্ত্রে এই 'হংসঃ'-রূপ পরমশিব-সম্বন্ধে বলা হয়েছে : "হংকারো বিন্দুরিত্যুক্তে বিসর্গঃ স ইতি স্মৃতঃ"। আধারশক্তি কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণে শক্তির গতি উর্ধ্বগামী হয় তার স্বরূপ পরমবিন্দু বা হংস পরমশিবের সঙ্গে সমচৈতন্যরসে একীভূত হওয়ার জন্য।

॥ তিন ॥

॥ তন্ত্রে ও যোগে কুণ্ডলিনীযোগসাধনা ॥

তন্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে কুণ্ডলিনীশক্তিকে 'হুং'-বীজে জাগ্রত (প্রদীপ্ত) করতে হয়। তখনই মূলাধারচক্র ত্যাগ ক'রে এবং শক্তি অন্যান্য চক্র ভেদ ক'রে সহস্রারে পরমশিব-স্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যে একীভূত হয়। তখন জীব (সাধক) শিব বা ব্রহ্মরূপে আপনাকে উপলব্ধি করেন। মায়ার শৃঙ্খল তখনই সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন (দূরীভূত) হয়,—'ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিঃ...'। শৃঙ্খল ছিন্ন হওয়া রূপক-কথা, আসলে মিথ্যাজ্ঞান দূর হ'য়ে সত্যজ্ঞানরূপ ব্রহ্মকে জীব উপলব্ধি করে। অদ্বৈতবেদান্তসাধনার ক্রম বা ধারাবাহিক পদ্ধতি এ'থেকে কিছুটা পৃথক হলেও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পর সাধক যে 'তত্ত্বমসি',—তৎ + ত্বম্ + অসি,—অর্থাৎ ত্বম্ বা পাশবদ্ধ জীবই পাশমুক্ত তৎ বা ব্রহ্ম—এইতত্ত্বের তখন উপলব্ধি হয়। তন্ত্রে ও যোগে কুণ্ডলিনীশক্তি জীবপর্যায়ভুক্ত। বেদান্তের মতে, মিথ্যাজ্ঞানাশ্রয়ী জীব আপন ব্রহ্মস্বরূপে তখন প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে মহিমান হন এবং শক্তির ও জীবত্বের রূপান্তর হয়। সুতরাং বিভিন্ন সাধনার ক্ষেত্রে সাধনার নাম ও সাধনক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হলেও লক্ষ্য বা আদর্শ অভিন্ন ও এক,—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

যোগসাধনায় ও তন্ত্রসাধনায় কুণ্ডলিনীশক্তি প্রবুদ্ধ হ'য়ে যখন মূলাধারচক্র থেকে আজ্ঞা প্রভৃতি ছ'টি চক্র পর পর ভেদ করে, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র তিনটি গ্রন্থিও (ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি) ভেদ করে সেই মহাশক্তি কুণ্ডলিনী। ব্রহ্মগ্রন্থির স্থান মনিপুরচক্র, বিষ্ণুগ্রন্থির স্থান অনাহতচক্র ও রুদ্রগ্রন্থির স্থান আজ্ঞাচক্র। বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুষুম্না তিনটি নাড়ী। ইড়াকে যমুনা, পিঙ্গলাকে সরস্বতী ও সুষুম্নাকে গঙ্গানদী বলেও সাধকেরা চিন্তা করেন।[২৮] সোম, সূর্য ও অগ্নি তিনটি নাড়ীর প্রতীক। তখন নাদতত্ত্বের সাধকগণ মূলাধারচক্রে তথা যুক্তত্রিবেণীতে ও আজ্ঞাচক্রে তথা মুক্তত্রিবেণীতে অভিষিক্ত হন (স্নান করেন)। যুক্তত্রিবেণীর স্নানে মুক্তি লাভ হয় না, কিন্তু মুক্তত্রিবেণী মোক্ষদায়িনী ও অজ্ঞাননাশিনী।

২৮। ছিন্নমস্তা দেবী মহাবিদ্যা গঙ্গানদী অর্থাৎ সুষুম্না। এই সুষুম্নারূপ গঙ্গানদীর অমৃত-ধারা দেবী ছিন্নমস্তা পান করেন, এজন্য তিনি মুক্তিময়ী বা মুক্তিস্বরূপিনী।

॥ অনাহত-নাদ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস ॥

অনাহত-নাদের প্রসঙ্গ ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব সবিকল্প ও নির্বিকল্প-সমাধিরও আলোচনা করেছেন বহুবার বহু প্রসঙ্গে। শ্রদ্ধেয় শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় 'সমাধিতত্ত্ব—সবিকল্প ও নির্বিকল্প' (শ্রীশ্রীকথামৃত, প্রথম ভাগ, ৫ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ) প্রসঙ্গে ভক্ত অমৃত ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথন নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি হোল—

"অমৃত। মহাশয়, আপনার এই সমাধি অবস্থায় কি বোধ হয় ?

"শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। কামিনী-কাঞ্চনে মন থাক্‌লে যোগ হয় না (হয় ভোগ)। সাধারণ জীবের মন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভিতে থাকে। সাধ্য-সাধনার পর কুল-কুণ্ডলিনী জাগ্রত হন। ইড়া, পিঙ্গলা, আর সুষুম্না-নাড়ী। সুষুম্নার মধ্যে ছ'টি পদ্ম আছে। সর্বনীম্নে মূলাধার। তারপর স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। এইগুলিকে ষট্‌চক্র বলে।

"কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হ লে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর—এই সব পদ্ম ক্রমে পার হ'য়ে হৃদয়মধ্যে অনাহতপদ্ম—সেইখানে এসে (শক্তি) অবস্থান করে। তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি থেকে মন সরে গিয়ে চৈতন্যরূপ হয়, আর জ্যোতিঃ দর্শন। সাধক অবাক্ হয়ে জ্যোতিঃ দ্যাখে, আর বলে—একি, একি !"

॥ ষট্‌চক্রভেদসম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস ॥

"ষট্‌চক্র ভেদ হ'লে কুণ্ডলিনী সহস্রারপদ্মে গিয়ে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হয়। কুণ্ডলিনী সহস্রারে গেলে সমাধি অর্থে শিবশক্তিসামরস্য হয়। বেদান্তমতে ব্রহ্মোপ-লব্ধি হয়। ভিন্ন ভিন্ন চক্রকে 'ভূমি' বলে। সহস্রার সপ্তভূমি। হৃদয়—চতুর্থ ভূমি, অনাহতপদ্ম দ্বাদশদল। বিশুদ্ধচক্র পঞ্চম ভূমি। বিশুদ্ধচক্রে মন উঠ্‌লে কেবল ঈশ্বরীয় কথা বল্‌তে আর শুন্‌তে প্রাণ ব্যাকুল হয়। ঐ চক্রের স্থান কণ্ঠ। বিশুদ্ধ ষোড়শদলপদ্ম। যার এই চক্রে মন এসেছে, তার সাম্‌নে বিষয়ের কথা —কামিনী-কাঞ্চনের কথা হ'লে ভারি কষ্ট হয়। ঐরূপ কথা শুন্‌লে সে' সেখান থেকে উঠে যায়। তারপর ষষ্ঠ ভূমি,—আজ্ঞাচক্র,—দ্বিদল-পদ্ম। এখানে কুলকুণ্ডলিনী (কুল = মহাশক্তি কালী ও কুণ্ডলিনী = মহাপ্রকৃতির অবিচ্ছুরিত অবিকৃত-পরমকারণ —নাদ, সুতরাং নাদই মহাশক্তি কালী, সে কথা শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বেই উল্লেখ করেছেন) এলে ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। কিন্তু একটু আড়াল থাকে,—যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো, মনে হয় আলো ছুঁলাম, কিন্তু কাঁচ (glass) ব্যবধান (তফাৎ) আছে ব'লে

ছোঁওয়া যায় না। তারপর সপ্তম ভূমি,—সহস্রারপদ্ম। সেখানে কুণ্ডলিনী উপস্থিত হ'লে সমাধি হয়। সহস্রারে সচ্চিদানন্দ-শিব আছেন। তিনি শক্তির (মূলাধারস্থ প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনী যখন জাগ্রতা হ'য়ে চক্রের পর চক্র ভেদ ক'রে সহস্রার-চক্রে চৈতন্যময়ী শক্তিরূপে উপনীত হন, তখন তার) সহিত মিলিত হন। এর নাম শিব-শক্তির মিলন"। 'হেসৌ সেহৌ'- এই শিব-শক্তির মিলনের নাম তন্ত্রে মুক্তি। এই মুক্তির নাম সমরসে অর্ধনারীশ্বররূপে নিত্যে নিত্যে—চৈতন্যে চৈতন্যে মিলন। তন্ত্রে 'হেসৌ সেহৌ' এবং বেদান্তে 'হংসঃ সোঽহম্' এককথা।

॥ চার ॥

॥ তন্ত্রদৃষ্টিতে বা তন্ত্রসাধনায় চরমতত্ত্ব ॥

তন্ত্রশাস্ত্রে বা আগমশাস্ত্রে শিবব্রহ্মস্বরূপ চরমতত্ত্বের তথা মুক্তির স্বরূপ কি সেইসম্বন্ধে 'শারদাতিলক' প্রথম ও পঞ্চবিংশ এই দুটি অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণনা করেছে। টীকায় পণ্ডিত রাঘবভট্ট বিস্তৃতভাবে তাদের বিশ্লেষণ করেছেন।[২১] আগমশাস্ত্রে পরমশিব ও বিমর্শশক্তি এই দুটি চরমতত্ত্ব। এ'দুটি তত্ত্বের মিলনে সৃষ্টির সার্থকতা সম্পন্ন হয়। পরমশিব ও শক্তি (বিমর্শ) দুটিই নিত্য ও সত্য তত্ত্ব এবং এ'দুটির মিলনে সৃষ্ট বিশ্বসংসারও সুতরাং নিত্য ও সত্য। বিশ্বসারতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার

২১। এ'সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় আর্থার এ্যাভালেনের 'প্রপঞ্চসারতন্ত্রগ্রন্থ' দ্রষ্টব্য। কলিকাতা আগমানুসন্ধানসমিতি' থেকে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই সংস্কৃত গ্রন্থের Introduction-এ আর্থার এ্যাভালন লিখেছেন : "The author of the *Prapanchasāra-vivaraṇa* states that Shiva is the author of this work through his incarnation (Avatāra) the philosopher Shankara...". 'প্রপঞ্চসারবিবরণ' আচার্য পদ্মপাদ-কৃত ভাষ্য। প্রপঞ্চসারতন্ত্রের আচার্য পদ্মপাদেরই স্বীকৃতি যে, 'প্রপঞ্চসারতন্ত্র' শিবাবতার আচার্য শঙ্করের রচিত। তাছাড়া 'প্রপঞ্চসারবিবরণ'-ব্যাখ্যার প্রয়োগক্রম-দীপিকাও আচার্য পদ্মপাদের রচিত।

আচার্য শঙ্কর-রচিত 'সৌন্দর্যলহরী' ও অপ্যয়দীক্ষিত-রচিত (অন্তগ্রন্থ) 'আনন্দলহরী,'-স্তোত্রগ্রন্থে শাক্তদর্শনের বিভিন্ন বিচার করা হয়েছে। তাছাড়া আচার্য শঙ্করের বহুবিধ স্তোত্রে বিচিত্র সম্প্রদায়ের দর্শনচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্কর-রচিত 'সৌন্দর্যলহরী' 'আনন্দ-লহরী' নামেও পরিচিত।

কথিত যে, আচার্য শঙ্করের গুরু আচার্য গোবিন্দপাদ 'শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র' রচনা করেছিলেন। গোবিন্দপাদের গুরু অজাতিবাদী আচার্য গৌড়পাদ। অজাতিবাদ নির্কর্ষ-অদ্বৈতবেদান্তের মতবাদ,—যাতে Subjective Idealism (বিজ্ঞান বা ব্রহ্মসত্তামাত্র) স্বীকৃত হয়েছে।

করা হয়েছে যে, 'অহং'—প্রকাশ ও 'ইদং'—বিমর্শ এ'দুটিই চৈতন্য বা চিৎস্বরূপ। 'অহং' বা শিব,—চিৎস্বরূপ এবং 'ইদং' বা শক্তি,—চিৎস্বরূপা ঃ "যা অনাদিরূপা চৈতন্যাং ধ্যানেন মহাপ্রলয়ে সূক্ষ্মা স্থিতা"। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে, মহাপ্রলয়ে শক্তি (মহাশক্তি) শিবে (পরমচৈতন্যে) বীজাকারে প্রসুপ্ত থাকে। এ'সম্বন্ধে শারদা-তিলকতন্ত্রে প্রথম অধ্যায়ে আছে—

'নিত্যানন্দবপু-র্নিরন্তরগলৎপঞ্চাশদ্বর্ণৈঃ ক্রমাদ্
ব্যাপ্তং যেন চরাচরাত্মকমিদং শব্দার্থরূপং জগৎ।
শব্দব্রহ্ম যদূচিরে সুকৃতিনশ্চৈতন্যমন্তর্গতং
তদ্বোঽব্যাদনিশং শশাঙ্কসদনং বাচামধীশং মহঃ ॥'

এ'শ্লোকে সৃষ্টিতত্ত্ব ও শব্দব্রহ্মতত্ত্বের মূলকথার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র 'আভাসবাদ' স্বীকার করে এবং অদ্বৈতবেদান্ত 'বিবর্তবাদ' স্বীকার করে। টীকাকার পণ্ডিত রাঘবভট্ট বিবর্তবাদ-অনুসারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন ঃ "পরব্রহ্মৈব স্বাত্মবিবর্তরূপং সকলং জগৎ সসর্জেতি শ্রুতিবাক্যপ্রতি-পাদিতোঽর্থঃ"। শক্তির আধারস্বরূপ মহাশক্তিরূপিণী কুণ্ডলিনীর শিবের সঙ্গে মিলনের সার্থকতা আগমে বা তন্ত্রশাস্ত্রে বিশদভাবে স্বীকৃত হয়েছে ঃ "যদ্ বা শাস্ত্রে শব্দসূক্তৈর্থ-সূক্তৈরাপকুণ্ডলিন্যা এবোৎপত্তেস্তস্যা এব 'কুণ্ডলী-পরদেবতা' ইতি পরদেবতাত্বোক্তেস্তদনু-স্মরণমেবোচিতমিতিমহংশব্দেন তেজোরূপাকুণ্ডলিনীতুচ্যতে।...যয়া কুণ্ডল্যা শব্দার্থ-রূপং পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমা-বৈখরীরূপত্বেন শব্দজনকত্বাৎ কার্যে কারণোপচারাৎ শব্দ-রূপং বিষয়ত্বাৎ অর্থব্যাপকভাবেন চরম্..., এবম্ভূতং গচ্ছতীতি জগদ্ বিনশ্বরং শরীরং ব্যাপ্তম্। যদ্বা যয়া শব্দার্থরূপং চরাচরাত্মকং বিশ্বং৩০ ব্যাপ্তম্"। শব্দার্থ নিয়েই বিশ্বচরাচরের সার্থকতা। এই শব্দ ও অর্থের কারণ ও আধার চৈতন্যরূপ শিব ও চৈতন্যরূপিণী শক্তি। শক্তির বাস্তব-রূপ 'কুলকুণ্ডলিনী'-শক্তি,—যে শক্তি সুষুম্নাপথে ঊর্ধ্বগা এবং অধোভাগে মূলাধারপদ্মে প্রতিষ্ঠিত। শারদাতিলকতন্ত্রের ২৫শ অধ্যায়ে শিব ও শক্তির সামরস্যরূপ যোগের (মিলনের) কথা বলা হয়েছে—

"অথ যোগং প্রবক্ষ্যামি সাঙ্গং সিদ্ধিপ্রদায়কম্।
ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ ॥

*   *   *

৩০। মহাশক্তি কালীর গলায় নরমুণ্ডমালা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মালা। সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন, 'কালীপঞ্চাশবর্ণময়ী'। শব্দাত্মক বর্ণ, সুতরাং শব্দ (কারণ) থেকে বিশ্বসৃষ্টি কার্য। বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরির অভিমতও তাই (—'বাক্যপদীয়' দ্রষ্টব্য)।

শিবশক্ত্যাত্মকং জ্ঞানং জগুরাগমবেদিনঃ ॥"

টীকায় পণ্ডিত রাঘবভট্ট এখানে শিব ও শক্তির সামরস্যরূপ (সমান-চৈতন্যরসের) ঐক্যকে অদ্বৈতবেদান্তসম্মত বলেছেন : "বেদান্তপক্ষমাশ্রিত্যাহ ঐক্যমিতি",—কেননা জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপ সংসার-আবর্তের পারে উপনীত হ'তে গেলে শিব-শক্তির ঐক্য অর্থে চৈতন্যে-চৈতন্যে সমরসরূপ বা সমরসে মিলনের প্রয়োজন : "সন্ধানং যোগমিত্যাহুঃ সংসারোচ্ছিত্তিসাধনম্'। অবশ্য ভাষ্যে রাঘবভট্ট এ'প্রসঙ্গে "তচ্চ তত্ত্বমসি'-ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধম্" বলেও প্রয়োগসারের প্রমাণ উদ্ধৃতি ক'রে বলেছেন : "নিষ্কলস্যাহপ্রমেয়স্য দেবস্য পরমাত্মনঃ"। কাশ্মীরীয়-প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের কথা উদ্ধৃত ক'রে নিষ্কল ও অপ্রমেয় পরমচৈতন্য-দেবতাকে তিনি 'শিব'-আখ্যা দিয়েছেন,—'শিবেতি'। তারপর তিনি 'পরে শৈবাঃ' ব'লে শিবসূত্রবৃত্তির প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন। তাছাড়া পরে তিনি 'উত্তরাম্নায়মতমাহ শিবেতি' ব'লে আম্নায়ের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন : "শিবশক্ত্যাত্মকং জ্ঞানং শিবশক্ত্যোরভেদজ্ঞানমিত্যর্থঃ",—শিব ও শক্তি অভেদ—এই জ্ঞানই আগমমতে মুক্তি। শারদাতিলকতন্ত্রের ২৫।৬২-৬৩ শ্লোক-দুটিতে এ'কথার সার্থকতা প্রমাণ ক'রে পুনরায় বলেছেন তন্ত্রকার—

'পিণ্ডং ভবেৎ কুণ্ডলিনী শিবাত্মা
পদং তু হংসঃ সকলান্তরাত্মা।
রূপং ভবেদ্‌বিন্দুরনন্ত (মন্দ-) কান্তি-
রতীতরূপং শিবসামরস্যম্ ॥
পিণ্ডাদিযোগং শিবসামরস্যাৎ
সবীজযোগং প্রবদন্তি সন্তঃ।
শিবে লয়ং নিত্যগুণাভিযুক্তে
নির্বীজযোগং ফলনির্ব্যপেক্ষম্ ॥'

অকার+উকার+মকারযুক্ত প্রণবই পিণ্ড। কুণ্ডলিনীশক্তি "তদরূপা শৈব শিবাত্মা-সকলান্তরাত্মা হংসঃ...পরমার্থতস্তু শিবয়োঃ সামরস্যমতীতরূপমেব"। টীকাকার পণ্ডিত রাঘবভট্ট এ'প্রসঙ্গে মন্তব্য ক'রে বলেছেন : "অনেন সাজুয্যমুক্তির্ভবতীত্যাহ পিণ্ডাদীতি। সারূপ্যমুক্তিমাহ শিব ইতি"। এ'সম্বন্ধে সংশয় ও জিজ্ঞাস্য এই যে, পিণ্ড, প্রণব বা কুণ্ডলিনীরূপিণী শক্তির সমরসে বা সামরস্যে সাজুয্যমুক্তি এবং শিবের সামরস্যে সারূপ্যমুক্তি—এই দু'রকম মুক্তি যথার্থশান্তিকামী সাধকের পক্ষে কাম্য কি-না ? তাছাড়া 'চক্রে চক্রে গলিতসুধয়া···কুণ্ডলিনী-সুধাভিঃ'—এ'ভাবে ষট্‌চক্রভেদ ক'রে সুধার বা 'অমৃতরূপ মুক্তির' আহরণ ক'রে পরিশেষে পূর্ণসুধার বা অমৃতপূর্ণ

শিবে অর্থাৎ পরমচৈতন্যে 'সমরস' বা 'সামরস্য' উপলব্ধি করার রীতি বা পদ্ধতি অদ্বৈতবেদান্ত স্বীকার করে না। অদ্বৈতবেদান্ত জীবকেই শিবরূপে গ্রহণ করে। এই দিব্যমন্ত্রে অভিষিক্ত হ'লে পরিশেষে উপলব্ধি হয় 'জীব ব্রহ্ম-ছাড়া অন্য-কিছু নয়'। এই চরম ও পরম-তত্ত্ব পরিশেষে 'বোধে বোধ'-রূপে প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি করেন সাধক। এই উপলব্ধিতে সাজুয্য, সামীপ্য, সারূপ্য প্রভৃতি মুক্তির কোন প্রশ্নই আসে না। অদ্বৈতবেদান্তের মতে 'ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ'— বলেছেন অধ্যাসভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এবং গীতার 'গূঢ়ার্থদীপিকা'-ভাষ্যে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী। সুতরাং প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষব্রহ্মানুভূতিই ব্রহ্মভাব ও ব্রহ্মস্বভাব। এই ব্রহ্মভাবে সম্পর্কের বা লক্ষণের কোন অপেক্ষা ও সার্থকতা নাই।

॥ আভাসবাদ ও বিবর্তবাদের পার্থক্য ॥

সুতরাং আভাসবাদের সমর্থক আগম বা তন্ত্রশাস্ত্রের দার্শনিকী-দৃষ্টির সঙ্গে বিবর্তবাদের-সমর্থক অদ্বৈতবেদান্তের এবং সঙ্গে সঙ্গে আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করানুসারী আচার্যদের মতের মধ্যে যে পার্থক্য —সেই সম্বন্ধে ডক্টর নন্দলাল কুণ্ডু তাঁর সুলিখিত *Non-dualism in Śaiva and Śākta Philosophy*-গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তার উল্লেখ ক'রে বলি : **"According to Śankara, what we sense with our senses, is Māyā, which is practically something, but in a real sense nothing ; which yet appears to be something, because it is associated with the Absolute, which alone is Real. Its appearance as an independent Reality is thus borrowed and in this sense an illusion. When, therefore, it is said 'all this is Brahman', what we mean is that what is beyond the empirical, is Brahman. That real, as appearance, is Māyā.**

"In Śaiva philosophy, however, denounces nothing. They say if 'to renounce, is to denounce ; it is better to ratain'. Everything is real, for everything is in Brahman, or the ultimate Real, for how can there be anything outside of Brahman: Therefore matter, life, mind are, in their essence, Śakti or powers, and Śiva and Śakti are one......All is Śakti

whether as Chitśakti or Māyāśhakti......"৩১

আভাসবাদের সঙ্গে বিবর্তবাদের পার্থক্য যথেষ্ট। আভাসবাদ স্বীকার করে সকল আগমশাস্ত্র এবং বিশেষ ক'রে কাশ্মীরীয়-অদ্বৈতাগমশাস্ত্র। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এই উভয় মতবাদের (আভাসবাদ ও বিবর্তবাদ) একটি সমীক্ষাত্মক আলোচনায় বলেছেন এ'ভাবে : **"That Samvit is free *vikalpa* and that creation is *vikalpa*, or *kalpanā* is admitted by both *Śākta*-Āgama and the Vedānta. But the question is how does creation as a *vikalpa* possible from Samvit which is pure and free from *vikalpa*? The Vedānta says it does not so emanate, but is part of a beginningless process (inspite of cyclic beginnings) within *the domain* of matter or *māyā*, and superimposed (*adhyasta*) on Samvit or Brahman, which reveals it—a process which is not in any way initiated by it".**

কিন্তু আগমশাস্ত্রের এবং বিশেষ ক'রে কাশ্মীরীয়-প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী পরস্পরের সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। আচার্য অভিনবগুপ্ত কাশ্মীরীয় "তন্ত্ররহস্য-গ্রন্থে" একথাই স্বীকার করেছেন। মমঃ গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর ***Aspect of Indian Thought*** (1916)-গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেছেন : **"But the attitude of Āgama is different. It believes in Svātantrya or power in the Samvit to generate movement, *though it is cnly ābhāsa*, and externality is only apparent......When power (*Śakti*) is supposed to be dormant, *vimarśa* is held to be dissolved in *prakāśa* (*antaralīna-vimsrśa*). *Śakti* seems to be sleeping as Kuṇḍalini, and Śiva (or *Parā-samvit*) is no longer Śiva, but a Śava (শব), the state being not one of spirit, but of lifeless matter".**

অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গী এ'থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত। অদ্বৈতবেদান্ত

৩১। (a) Vide p. 139.

(b) ডঃ সত্যদেব মিশ্র-প্রণীত 'অদ্বৈতবেদান্তে আভাসবাদ'-গ্রন্থ (কাশী) দ্রষ্টব্য। পণ্ডিত সত্যদেব শঙ্কর, সুরেশ্বর, সর্বজ্ঞাত্মমুনি, আনন্দগিরি ও বিদ্যারণ্যমুনিশ্বর প্রভৃতির ভাষ্যে আভাসবাদের প্রয়োগ প্রমাণ করেছেন।

যথার্থভাবে আভাসবাদ স্বীকার করে না, কারণ আভাসবাদে সৃষ্টিরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চিদচিদ্বিশিষ্ট প্রকাশ-বিমর্শময় এবং অনুত্তরশিব, অথবা ব্রহ্মসংবিৎ (চৈতন্য) সগুণ-ব্রহ্ম-ঈশ্বর,—যিনি প্রকাশ-বিমর্শময় জগদ্বৈচিত্র্যের কারণ এবং বৈচিত্র্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। মোটকথা, অদ্বৈতবেদান্তে বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ ঈশ্বর,—যিনি মায়োপহিত ও মায়াধীশ, এবং অনুত্তর-তত্ত্ব বা পরাসম্বিদরূপী ব্রহ্মতত্ত্ব নির্গুণ, কিংবা সর্বনিরপেক্ষ-সগুণ-নির্গুণের অতীত পরমচৈতন্য, সুতরাং প্রকাশ-বিমর্শময় জগদ্বৈচিত্র্যের সঙ্গে সর্বাতীত ব্রহ্মের কোন প্রত্যক্ষসম্পর্ক নাই। তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব সর্বাতীত বা সর্বোপরম-নিত্যচৈতন্যসত্তা। অথ ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের কোন সম্পর্ক নাই ব্যবহারিকভাবে বা ব্যবহারিকদৃষ্টিতে, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই।

॥ তন্ত্রে সামরস্যমুক্তির রূপ ॥

তন্ত্রে আভাসবাদই গৃহীত। কিন্তু শ্রদ্ধেয় ভাষ্যকার রাঘবভট্ট অনেক সময়ে বিবর্তবাদের আশ্রয় নিয়ে কোন কোন তন্ত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। পণ্ডিত ভাস্কর-রায়ও 'বরিবস্যা-রহস্য'-গ্রন্থে বিবর্তবাদের আশ্রয় নিয়ে বহু তন্ত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন দেখা যায়।

॥ দক্ষিণী-তন্ত্রাচার্য ভাস্কর-রায়ের যুক্তি ॥

এ'প্রসঙ্গে আচার্য ভাস্কর-রায়-প্রণীত 'বরিবস্যারহস্যম্'-গ্রন্থের 'প্রকাশ'-ব্যাখ্যায় ধর্মী ও ধর্ম,—শক্তিমান ও শক্তির অভিন্নতাপ্রতিপাদক বিচারশৈলীর কথা মনে পড়ে। 'কথমিব তস্মিনজ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতমুচ্যতে'—এই প্রতিজ্ঞার ভাষ্যে ভাস্কর-রায় বলেছেন: "অত একৈকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং শ্রুত্যাবুক্তং কথং সঙ্গচ্ছত ইতি সাশ্চর্যমাহ—কথমেতি। অথবা বিবর্তবাদং বেদান্তিসম্মতং পরিণামবাদী তান্ত্রিকো দূষয়তি—কথমেবেতি।...অয়েয়ং তান্ত্রিকপ্রক্রিয়া—'ইচ্ছামি', 'জানামি' ইত্যাদ্যাবুত্তম-পুরুষান্তভাসমানং স্ফুরণাত্ময়ি জ্ঞানমেব প্রকাশাভিধং ব্রহ্ম। তচ্চ সর্বজ্ঞসর্বেশ্বরত্বসর্ব-কর্তৃত্বপূর্ণত্বব্যাপকত্বাদিশক্তিসংবলিতম্। তস্য চানন্দরূপাংশ্চ এব স্ফুরণং পরাহন্তা বিমর্শং পরা ললিতা-ভট্টারিকা ত্রিপুরসুন্দরীত্যাদিপদৈর্ব্যবহ্রিয়তে।...'বাচারম্ভণং বিকারঃ' (ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৬।১।৪) ইত্যাদিশ্রুতীনাং তত্রৈব স্বারস্যাচ্চ। শক্তি-শক্তিমতোরূপাদানোপাদেয়য়োরত্যন্তমভেদং, ন পুনরোপনিষদাদিবদ্ভেদাভেদৌ। অতএব 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ উঃ ৩ ১৪ ১) ইতি সামানাধিকরণ্যমভেদে, ন

পুনর্বাধাল্লাম্। অদ্বৈতশ্রুতয়ঃ সর্বা অপ্যেতদভিপ্রায়িকা এবাবিরুদ্ধাঃ। সর্বপ্রমাণ-মূর্ধন্যাম্নাশ্রুত্যা তদনুসরিতস্ত্রৈশ্চাদ্বৈতে কথিতে তদ্বিরুদ্ধত্বেন ভাসমানঃ কার্যকারণয়োর্ভেদাংশ এব কল্পিত আস্তাং ন পুনঃ সর্বোঽপি প্রপঞ্চঃ।...ততশ্চ শ্রুতেরপি পরিণামবাদ এব সংমতঃ সিধ্যতি। ভগবতা ব্যাসেনাপি 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৩) ইত্যাস্মিন্নাধিকরণে একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাং মৃদ্ঘটনখনিকৃন্তনাদিদৃষ্টান্তম্ 'বহুস্যাং প্রজায়েয়' (তৈঃ উপঃ ২।৭) ইত্যভিধ্যোপদেশাদিকং চানুসন্ধানেন পরিণামবাদ এবাভিমতে...। ভাষ্যকারৈরপি তত্র বিবর্তবানুসারেণ ব্যাচক্ষাণৈরপি সৌন্দর্যলহর্যাম্ 'অনস্তং ব্যোম্ ত্বম্' ইতি শ্লোকে 'ত্বয়ি পরিণতায়াম্' ইতি স্বাভিমতঃ পরিণামবাদ এব স্ফুটীকৃতঃ।"[৩২]

এখানে দেখা যায়, আচার্য ভাস্কর-রায় দার্শনিক অপ্পয়দীক্ষিতের মতের অনুসারী হ'য়ে বিবর্তবাদের প্রসঙ্গে সৃষ্টিশ্রুতিকে পরিণামবাদের পক্ষে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পণ্ডিত কৃষ্ণস্বামী শাস্ত্রী 'বরিবস্যারহস্য'-গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন : "* * respectively *Dharma* and *Dharmin*. The form *Dharma* is divided itself into male and female. The female form is the consort (Devi) of the Supreme Śiva (*Dharmin*). The male form viz. Vishṇu became the meterial (Upādāna) cause of the universe ' এ'প্রসঙ্গে পণ্ডিত কৃষ্ণস্বামী শাস্ত্রী মন্তব্য ক'রে পুনরায় বলেছেন যে, ভাস্কর-রায় পরিপূর্ণভাবে অদ্বৈতমতেরই সমর্থক, কিন্তু অনেকে তাঁকে পরিণামবাদী তান্ত্রিকমতানুযায়ী ব'লে ব্যাখ্যা করেন : "Yet in the face of this direct testimony, it is strange to find that a view prevails that Bhāskararāya's attitude toward the Advaitavāda was not altogether sympathetic" এ'জন্য শাস্ত্রী মহাশয় অদ্বৈতবাদের পক্ষে তিনটি যুক্তির মধ্যে তৃতীয় যুক্তিতে বলেছেন, আচার্য শঙ্কর স্বয়ং ২।১।১৪ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে প্রথমে পরিণামবাদ ও পরে বিবর্তবাদের দিগ্‌দর্শন করেছেন। ঠিক তেমনইভাবে সংক্ষেপশারীরকার সর্বজ্ঞাত্মমুনির উদাহরণ দিয়ে তিনি পুনরায় বলেছেন : "Categorically declares that in the Vedānta system the Pariṇāma-vāda is but the necessary stepping stone, which naturally leads to the central doctrine of Advaitavāda." ডক্টর

৩২। 'বরিবস্যারহস্যম্' (আডেয়ার সংস্করণ), পৃঃ ৪-৬

যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ অনুরূপভাবেই 'সংক্ষেপশারীরক'-গ্রন্থের উল্লেখ ক'রে সর্বজ্ঞাত্মমুনির অভিমত উল্লেখ ক'রে এ'সম্বন্ধে বলেছেন : 'আরহ্য ভূমিমধরামিতরাধিরোঢুং শক্যাতি··· ',—অর্থাৎ যদিও বেদান্তে পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ এই উভয়ই গ্রহণ করা হয়, তথাপি পরিণামবাদ বিবর্তবাদেরই ভিত্তি বা পূর্বভূমিস্বরূপ স্বীকার করাও সঙ্গত হয়। সংক্ষেপশারীরকের ২।৬১ শ্লোকে তাই বলা হয়েছে—

'বিবর্তবাদস্য হি পূর্বভূমির্বেদান্তবাদে পরিণামবাদঃ।
ব্যবস্থিতেঽস্মিন্ পরিণামবাদে স্বয়ং সমায়াতি বিবর্তবাদঃ॥'[৩৩]

অবশ্য এ'সকল কথা সমন্বয়বাদীরাই বলেন ও যুক্তি প্রদর্শন করেন। এ'সম্বন্ধে যুক্তি এই যে ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ-ব্যাস নিজেই 'ভোক্ত্রাপত্তেঃ' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা পরিণামবাদে ভেদের উল্লেখ ক'রে বিবর্তবাদে তার নিষেধ করেছেন। এ'জন্য পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদের পৌর্বাপর্যও স্বীকার করেন বহু অদ্বৈতবাদী দার্শনিক। সর্বজ্ঞাত্মমুনি এ'সম্পর্কে সে'কথাই বলেছেন : "উপায়মাতিষ্ঠতি পূর্বমুচ্চৈরুপেয়মাপ্তুং জনতা যথৈব। শ্রুতিমুনীন্দ্রশ্চ বিবর্তসিদ্ধ্যৈঃ বিবর্তবাদং বদতস্তথৈব (২৩।৬)"। সুতরাং সমন্বয়বাদীদের অভিমত যে, ব্রহ্মপরিণামবাদ ব্রহ্মবিবর্তবাদের বিরোধী নয়, বরং অনুকূল। সেজন্য বলি, তন্ত্রজ্ঞাননিষ্ণাত আচার্য ভাস্কর-রায়কেও অনেকে মনে করেন দ্বৈতবাদী, কিন্তু পরিণামবাদকে গ্রহণ ক'রে তিনি পরে পরিণামবাদের সাহায্যেই অদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

॥ তন্ত্রসাধনায় সামরস্যমুক্তি ॥

তন্ত্রসাধনা অনুষ্ঠানমূলক, সুতরাং বিচিত্র কর্মানুষ্ঠান ও বিধিনিষেধ তন্ত্রসাধনার অঙ্গ। আচার্য শঙ্কর গীতায় জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় খণ্ডন করেছেন,—যেহেতু জ্ঞান তথা ব্রহ্মজ্ঞান কর্মের দ্বারা উৎপাদ্য (বস্তু) নয়, ব্রহ্মজ্ঞান বস্তুতন্ত্র, সুতরাং তা চিরদিনই আছে, কর্মানুষ্ঠানরূপ সাধনার দ্বারা অজ্ঞান-আবরণ অপসারিত হ'লে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মজ্ঞান আপনিই প্রকাশিত হয়,—যেমন মেঘ সূর্যকে আবৃত করলে মেঘের অপসারণই চিরপ্রকাশ-সূর্যকে প্রকাশ করে।

কিন্তু তন্ত্রে মুক্তির স্বরূপ ভিন্ন। সাধারণভাবে নিদ্রিত কুণ্ডলিনীশক্তি সাধনার

৩৩। ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকারও এই প্রশ্ন করেছেন বিবর্তবাদের সম্পর্কে। তিনি বলেছেন. 'Vivartavāda is, therefore, the denial of causation and the assertion of identity. It presupposes *pariṇāma* or effectual transformation.

সাহায্যে বা ইচ্ছার অভিঘাতে জাগ্রত হ'লে যোগে মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, অনাহত প্রভৃতি চক্রভেদ ক'রে আজ্ঞাচক্রে ও পরে নিরালম্ব প্রভৃতি চক্র ভেদ ক'রে সহস্রারচক্রে চিরপ্রতিষ্ঠিত পরমশিবের সঙ্গে কুণ্ডলিনীর সমরসে[৩৪] মিলন হয়। এই মিলনকে চৈতন্যরূপ রসে বা সমরসে একীভূত হওয়া বলে। এই একীভূত হওয়ার নামই সামরস্যানুভূতি। প্রকাশ ও বিমর্শের (অহং ও ইদমের) মধ্যে। তখন আর কোন গুণগত ও বস্তুগত পার্থক্য থাকে না। চিতিশক্তি ও চিদ্‌রূপ পরমচৈতন্য তখন একে অর্থাৎ একরস-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়,—যদিও এই মিলন চনকাকারে নিত্য-চৈতন্যরূপিণী-শক্তি ও নিত্যপরমচৈতন্য-শিব অভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত বা প্রকাশিত হন,—'আত্মপরমাত্মৈক্যম্'।

এই মিলন সম্বন্ধে ষড়াম্নায়তন্ত্রের ১ম পটলে আছে—

"মহাসাম্রাজ্যষড়াম্নাঃ পঞ্চাম্নানন্দতন্ত্রকঃ ॥
ঊর্ধ্বাম্না বহুবিধশ্চ কালিকানামেতি মহান্।
* * *
একমেবাদ্বিতীয়ঞ্চ একাত্মা চণকাকৃতিঃ।
পরাভক্তিজ্ঞানকাম্যা বিজ্ঞানাত্মা প্রেমাস্পদঃ ॥
* * *
অনুলোমো ভবেচ্ছিবঃ বিলোমো জীব উচ্যতে।
নির্গুণো ব্যঞ্জনং হেসোঃ সগুণঃ স্বর উচ্যতে ॥
* * *
সকারঃ সচ্চিদানন্দঃ কালিকা পরমাক্ষরী।
কুলকুণ্ডলিনী কালী তারিণী রাসভানবী ॥"

এখানে মনে রাখ্‌তে হবে, ষড়াম্নায়তন্ত্র মহাসাম্রাজ্য-অভিষিক্ত সাধকদের পক্ষে বিহিত।

কাশ্মীর-শৈবদর্শনে প্রত্যভিজ্ঞা-ছাড়া ক্রমতান্ত্রিক-পদ্ধতি-সাধনার প্রচলন আছে। প্রত্যভিজ্ঞা শিবতান্ত্রিক ও ক্রমপদ্ধতি শক্তিতান্ত্রিক-সাধনা। ডক্টর নবজীবন রস্তোগীর ভাষায় তাই বলি : "...the Kula of Pratyabhijñā and Trika of Kâshmir Śaivism are Śiva-oriented and the Krama is Śakti-oriented." তাছাড়া আছে স্পন্দসম্প্রদায়-প্রবর্তিত তান্ত্রিক-সাধনা,—যে সাধনা

৩৪। 'রস' অর্থে চৈতন্য,—'চৈতন্যমিতি রসঃ'।

শিবতান্ত্রিক ও শাক্ততান্ত্রিক সাধনাদুটির সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে। এই কাশ্মীরীয় তিনটি সাধনারই মূললক্ষ্য শিব-শক্তি-সামরস্য,—যদিও এই সামরস্যের ভাবনার ও সাধনার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। তবে কি কাশ্মীরীয়-তন্ত্রসাধনা এবং কি তামিলীয়-দক্ষিণ-ভারতীয়-শ্রীবিদ্যা-সাধনা এবং গৌড়বঙ্গীয়-তান্ত্রিক-সাধনা সকলের সামরস্যেরই ধারণা কিন্তু ভোগ ও ত্যাগ, অথবা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সকে নিয়ে। এই সামরস্যের ধারণাকে আরও সহজভাবে প্রকাশ ক'রে বলা যায় তান্ত্রিক-সাধনার চরমমুক্তি হ'ল : "Harmony of the two aspects of Reality i.e. Being (প্রকাশ) and Dynamism (বিমর্শ),—'ভোগমোক্ষসামরস্য' বা 'ভোগমোক্ষদ্বিতয়ানুভূতি সামরস্য'। তাছাড়া তন্ত্রের ষট্‌ত্রিংশৎ বা ৩৬টি তত্ত্বসহ চিতিশক্তি-মহাকালী বা শিবা এবং পরমচৈতন্য শিব অবিনাভাবসম্বন্ধে একীভূতভাবে সর্বদাই মিলিত থাকেন। সাংখ্যীয়-পরিণামবাদের বিচারে বা দৃষ্টিতে দেখা যায়, এই শিব-শক্তি-সামরস্য অনেকটা সদৃশপরিণামের অন্তর্গত স্বর্ণ ও স্বর্ণকুণ্ডলের মধ্যে প্রতীয়মান ভেদ বা পার্থক্যকে নিয়ে, কেননা নিত্য ও চৈতন্যময়-শিবসত্তার সদৃশ-পরিণাম নিত্যা-চিতিশক্তি-মহিমময়ী-কালী। চৈতন্যময় ও চৈতন্যময়ী সমসত্তাক বা সমশ্রেণীর অন্তর্গত,—যদিও একটি শব অচঞ্চল ও স্থির এবং আর-একটি চিরচঞ্চল, কারণ ও কার্যের মতো। সাংখ্যের সদৃশপরিণামের ক্ষেত্রে স্বর্ণ ও স্বর্ণকুণ্ডল নাম-রূপে পৃথক হলেও উভয়ের সত্তা ও আধার স্বর্ণ-ছাড়া অন্য-কিছু নয়। চৈতন্য শিব ও চিতিশক্তি কালী চৈতন্যাংশে অথবা চৈতন্যের আধারে এক ও অভিন্ন। কিন্তু এই এক, অভিন্ন ও অদ্বৈত ঠিক শাঙ্করবেদান্তের দৃষ্টিতে এক ও অদ্বৈত নয়, পরিণামবাদে ও আভাসবাদে পরমসত্তার মিলনে তথা সামরস্যে ভেদ কিছুটা থাকেই, সেজন্য শাক্তদর্শন এবং শৈবদর্শনের অদ্বৈতসত্তা ও শাঙ্করদর্শনের অদ্বৈতসত্তার মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট।

'নিত্যাষোড়শিকার্ণব' বামকেশ্বরতন্ত্রের অন্তর্গত একটি তন্ত্র। 'নিত্যাষোড়শিকার্ণব'-এর মতে, শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরসুন্দরী বা ললিতার সাধনায় এই শিব-শক্তির সামরস-সম্বন্ধে বিচার আছে এ'ভাবে : "শ্রীত্রিপুরসুন্দরীসাধন তৎপরাণাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব"। সেজন্য শিব-শক্তি-আগমে ব্যাখ্যাত অদ্বৈতদর্শনে 'প্রকাশ'-শব্দ শিববাচক এবং 'বিমর্শ'-শব্দ শক্তিবাচক। উভয় দর্শনের সিদ্ধান্তে কোন পার্থক্য নাই, সেজন্য শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব চরমদৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন।

তাছাড়া মহাশক্তি কালীর ক্রমরূপায়ণের ইতিহাস-সম্বন্ধে যদিও পূর্বে আলোচনা করেছি তথাপি প্রসঙ্গক্রমে বলি যে, প্রথম রূপায়ণে দুই শিব—সদাশিব ও মহাকাল

দ্বিতীয়-রূপায়ণে একটিমাত্র শিব,—মহাকাল এবং তৃতীয়-রূপায়ণে ঐ মহাকাল ও তাঁর বক্ষে দণ্ডায়মানা মহাশক্তি-কালী। প্রথম রূপায়ণে সদাশিব নির্গুণ, সুতরাং সৃষ্টির ইচ্ছাহীন-সদাশিব শব-শিব এবং সৃষ্টি-ইচ্ছার কারণীভূত মহাকাল দ্বিতীয় এবং তৃতীয়-রূপায়ণে কেবলমাত্র সৃষ্টি-ইচ্ছার কারণীভূত মহাকাল এবং নৃত্যচঞ্চলা সৃষ্টিময়ী-কালী। সে'জন্য মহাশক্তিময়ী কালীর রূপভেদে নির্গুণ ও সগুণ শব-শিবার লীলাখেলায় অদ্বৈত ও দ্বৈতের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যই লক্ষ্য করা যায়। শাক্তসাহিত্য ও শাক্তদর্শন কিন্তু পরবর্তী রূপায়ণ ও লীলাবিলাসকে গ্রহণ ক'রেই শাক্ত্যাদ্বৈতবাদ বা শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদেরই পথচারী,—যেখানে অদ্বৈতের মাধুর্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বৈতেরই বিলাস সেখানে। তবে শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বের মিলনমাধুর্যে চৈতন্যময়-সামরস্যেরই প্রকাশ, কিন্তু 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' নয়।

॥ মুক্তিপক্ষে তন্ত্রশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ॥

সুতরাং আগম বা তন্ত্রশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের কথাই পরিশেষে আলোচনা করি। আগম বা তন্ত্রশাস্ত্রের মতে, পরমশিব পরাসম্বিৎ ছাড়া অন্য-কিছু নয়। ডক্টর এন. এল. কুণ্ডু তাঁর *Non-dualism Śaiva and Śākta*-গ্রন্থে এ'সম্বন্ধে বলেছেন: "Thus Parā-samvit, according to Āgamśāstra, is not a barren abstraction but is an absolute all-comprehensive Experience in which there is Aham or Prakāśa and Idam or Vimarśa."

প্রকাশরূপ শিবের ও বিমর্শরূপ শক্তির মিলিতরূপই পরাসম্বিৎ। শারদাতিলকতন্ত্রে পণ্ডিত রাঘবভট্ট এ'কথাই স্পষ্ট ক'রে বলেছেন: "Prakāśa and Vimarśa form an indissoluble unity and in no stage of pure Absolute Chit or Consciousness." এই চিদ্রূপিণী বিমর্শশক্তি কারণাকারে প্রকাশরূপ শিবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাই সামরস্যাবস্থায় উভয়েই (চিৎপ্রকাশ ও চিতিশক্তি) একরস সম্পন্ন হন। তন্ত্রশাস্ত্রে সেজন্য 'অহম্' বা অহন্তা ও 'ইদম্' বা ইদান্তার সমবেত রূপ। পরস্পরে পৃথক নয় এবং এরই নাম সমরসে বা সামরস্যাবস্থায় শিব ও শক্তি আসীন, এক ও অদ্বিতীয়।

ডক্টর যদুনাথ সিংহ তাঁর *Cult of Śakti*-গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বলেছেন। Parama-Śiva is called Śunya, because He transcends all phenomenal appearances, and because He is unqualified and predicateless. Bindu, dynamic consciousness, was created out

of static universal consciousness, Parama-Śiva. Śiva and Śakti are not distinguished from each other in Bindu. Bindu or point is their equilibrium." সুতরাং প্রকাশরূপ শিব বিমর্শ বা শক্তি থেকে কখনও পৃথক নয়, বরং অখণ্ড পরাসম্বিদেরই দু'টি বিকাশ। কিন্তু এই বিকাশ-দুটি অখণ্ড-একেরই রূপ অবিনাভাবসম্বন্ধে,—যেমন একটি চনক বা কলাইয়ের মধ্যে দু'টি অংশ দেখি,—যে দুটি অংশ নিত্য ও সত্য চৈতন্যেরই অবিভক্ত বা অবিভাজ্য রূপ। পণ্ডিত লক্ষ্মণ-দেশিক এ'কথাই যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন তাঁর শারদাতিলকতন্ত্রে। পণ্ডিত রাঘবভট্ট তাঁর টীকায় সে'কথাই সমর্থন করেছেন।

●